চায়না টাউন

যাত্রীন্দ্রনাথ দাস

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক—মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১/১ দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-চিত্র
দীপক দত্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.

শ্রীমনোজ বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র, চরিত্রের নাম (ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি বাদে), ঘটনা প্রভৃতি নিতান্তই কাল্পনিক। কোথাও কোনো সাদৃশ্য আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত।

The characters and names (except those that are historical) as well as the events etc. in this book are entirely fictitious. Any resemblance is purely accidental and unintended.

রচনাকাল

মার্চ ১৯৫৬ থেকে নভেম্বর ১৯৫৭

এই লেখকের অন্যান্য বই

কর্ণফুলি (২য় সং)

রঙের বিবি (২য় সং)

বেগমবাহার লেন (২য় সং)

অনুরঞ্জিতা

পূর্বরাগের ইতিহাস

অন্তরতমা

বিশাখার জন্মদিন

* এক *

কনফ্যুশিয়াস একদা বলেছিলেন—Everything has its beauty, but not everyone sees it : সৌন্দর্যের প্রকাশ সব কিছুর মধ্যেই, কিন্তু তাকে দেখবার চোখ নেই অনেকেরই। সেদিন থেকে আড়াই হাজার বছর কেটে গেছে, ইতিহাসের পাতা থেকে রূপকথার পাতায় চালান হয়ে গেছে সম্রাট শি-হুয়াং-টি, স্মরণের দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে হান রাজবংশের স্বর্ণযুগ। সুই, তাং, সুং রাজাদের ঐশ্বর্য, চেঙ্গিস খানের স্বর্ণ-বাহিনীর অভিযান, কুব্‌লাই খানের শৌর্য, মিং আর মাঞ্চুদের বিলাস ব্যসন আর বিপর্যয়ের কাহিনী আজ শুধু অতীতের ইতিকথার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ। কিন্তু সেই দীর্ঘ শতাব্দীগুলোর ওপার থেকে কনফ্যুশিয়াসের কথাগুলো আজো মনের মধ্যে টুং-টাং করে ওঠে, যখনই মনে পড়ে চায়না টাউনের পুরোনো দিনগুলোর কথা।

পশ্চিমে চিৎপুর, দক্ষিণে বৌবাজার। তারই এপাশে সাবেক কালের বনেদী চায়না টাউন। বড়ো রাস্তার চলতি ট্রাম-বাস থেকে চোখে পড়ে এদিককার দু'-চারটি চীনে ডেন্টিস্টের দোকান। তাদেরই আশে-পাশে এখানে-সেখানে সরু-সরু গলি এসে পড়েছে বড়ো রাস্তার মোহানায়। তার ভেতর থেকে কখনো-সখনো বেরিয়ে আসে শার্ট-প্যান্ট-পরা চীনেম্যান, উদ্দাম সাইকেলে স্কুলড্রেস-পরা চীনে স্কুলের কিশোরী, মন্থর রিক্সায় বাদাম-নয়না গৃহিণী। এ রকম চীনে দু'-চার জন। আর যারা সব বেরিয়ে আসে কিংবা ঢুকে পড়ে গলির ভেতর তারা সব মুসলমান, নয় ইহুদী, নয় তো বা ফিরিঙ্গী।

বড়ো রাস্তা থেকে দেখা যায়, এ-গলি সে-গলির খানিকটা। সে-সব অলি-গলি দু'-চার পা এগিয়েই মোড় ফিরে এঁকে-বেঁকে কী যেন এক রহস্যঘন অজানায় মিশে গেছে! কতো গল্প এই চীনেপাড়াকে নিয়ে, রোমহর্ষক আলোচনা শ্যামবাজারের রকে, ভবানীপুরের ক্লাবঘরে আর চৌরঙ্গীর রেস্তরাঁয়, কতো রোমাঞ্চ-শিহর কল্পনা-বিলাস বটতলার গোয়েন্দা উপন্যাসের নিউজপ্রিন্ট পাতায়। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত নাগরিক ও-পাড়ার ছায়া মাড়ায় না। কখনো হয়তো দু'-চার জন শখ করে সোয়াদ পাল্টাতে যায় চীনেপাড়ার বিখ্যাত রেস্তরাঁয়। সেখানে সোনালী গালার কাজ-করা পরিবেশে, সূক্ষ্ম খোদাই করা টেবিলের পাশে মার্বেলের মসৃণ চেয়ারে বসে চিলি-স'স্ দিয়ে চাও-মিয়েন, চিকেন সহযোগে বাঁশের কোঁড়, সোয়া-বীন স'স্ দিয়ে চিংড়ি ভাজা, কাঁকড়া সেদ্ধ প্রভৃতি চাখতে চাখতে চীনে জাফরির ওপার থেকে ভেসে-আসা অনুস্বরাস্ত কাকলী শুনে সরেশ হয়ে টাটকা হয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে ফিরে আসে চেনা পৃথিবীর নিরাপদ আবহাওয়ায়। সেই বিখ্যাত রেস্তরাঁটির ওপাশে যে সরু অন্ধকার গলি ভেতরে ঢুকে গেছে, যার গুমোট পরিবেশ থেকে ভেসে আসে মিহি গলায় তীক্ষ্ণ হাসির তরঙ্গ,—সেদিকে তাকায় না। এ পাশের ছোট্টো দোকান, যার ভেতর কাঠের টেবিলের চার পাশে দু'-চারজন বিভিন্ন জাতের লোক জোরগলায় হাসে আর চাপা গলায় গল্প করে, সেদিকেও ফিরে তাকায় না। ডাস্টবিনের পাশের মাদী শূয়োরটা এড়িয়ে, দু'-চারটি নির্বিকার মুরগী আর পাতিহাঁস পেরিয়ে, শুকনো মাংসের টুকরো ঝোলানো, সুঁটকী মাছ আর শূয়োরের চর্বি সাজানো নোংরা দোকানটির সামনে পড়তেই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ব্ল্যাকবার্ণ লেন, ফিয়ার্স লেন পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে যায়।

গত ছয় সাত বছরে অনেক বদলে গেছে এ পাড়ার আবহাওয়া। অনেক চীনে চলে গেছে এ পাড়া থেকে, অন্য জাতের লোক অনুপ্রবেশ করছে আস্তে আস্তে। সেণ্ট্রাল এভিনিউ থেকে দেখা যায় ইডেন হসপিট্যালের উল্টোদিক থেকে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নতুন চওড়া রাস্তা বেরুচ্ছে, সরু সরু গলিগুলো

নিশ্চিহ্ন করে, জীর্ণ বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে সুরকি পাথরের কুচি আবর্জনা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে চিৎপুরের দিকে। মাঝখানে ফাঁকা পড়ে আছে অনেকখানি জায়গা। এক পাশে ইহুদীদের সিনাগগ আর একটি মসজিদ বড়ো কাছাকাছি, অন্য পাশে দু'-চারটি চীনে দোকান, আর এদিক ওদিক ফুটফুটে চীনে খোকা-খুকুদের হট্টগোল। দোকানগুলোর সামনে সাজানো রঙিন মোমবাতি, রঙিন ফানুস, বাজি-পটকা, কাগজের ফুল আর ফেস্টুন, ঝাপসা কাচের শো-কেসের ভেতর থেকে উঁকি মারা চীনে মাটির পুতুল, আর আশে-পাশের রান্নাঘর থেকে চর্বির গন্ধ—সুদূর প্রাচ্যের পরিবেশ যা একটুখানি টিমটিম করছে এরই মধ্যেই। এ-ও যে আর বেশী দিন থাকবে না, কর্পোরেশনের স্টীমরোলার আর রোড-ক্লোজ্‌ড সাইন দেখে বেশ বোঝা যায়। এদিক ওদিক তাকালেই চোখে পড়ে নতুন নতুন চার-পাঁচটা পানের দোকান। কান খাড়া করলেই বোম্বের হিন্দি ফিল্মের গান শোনা যায়।

সেখানেই একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল জেনী ওয়াং'এর সঙ্গে।

নানকিংএ খেতে ডেকেছিলো এক পাঞ্জাবী বন্ধু যোগীন্দর সিং। খাওয়া-দাওয়ার পর সে চলে গেল অফিসপাড়ার দিকে। আমার গন্তব্য সেণ্ট্রাল এভিনিউ; তাই শর্টকাট করছিলাম এদিক দিয়ে।

আকাশে তখন মেঘ করেছে। সেদিন আষাঢ় মাস।

হঠাৎ দেখি, ওধার থেকে আসছে খুব চেনা-চেনা মনে হওয়া কে একজন,—প্যারাসোলের নিচে বব্ চুল, ছোটো ছোটো দুটো চোখ, চাপা নাক, লাল টুকটুকে সরু ঠোঁট, ফর্সা গলার নিচে সাদা সিল্কের জামা আর কালো স্কার্ট, তার ভেতর থেকে বেরুনো দুটো নিটোল ফর্সা হাত। সব মিলিয়ে খুব মিষ্টি দেখতে।

জেনী? জেনী ওয়াং?

ভাবলাম ডেকে কথা বলবো কি না। যদি চিনতে না পারে? সাত বছর আগেকার কয়েকটি ঝড়ের মত দিন,—সেই দিনগুলোর কথা সে যদি মুছে ফেলে থাকে তার জীবন থেকে, তা'হলে তো আমাকে আর আরো

অনেককে তার মনে রাখবার কথা নয়। আর মনে রাখলেও যদি চিনতে না চায়!

কাছে আসতেই দেখি, লাল টুকটুকে ঠোঁঠের ফাঁক দিয়ে এক সারি মুক্তোর মতো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে সহজ হাসিতে।

"হা—ল্—লো! তুমি?"

দাঁড়িয়ে পড়লাম।

জেনী বললে, "অনেক দূর থেকেই তোমায় দেখতে পেয়েছি। বহুদিন পর দেখা হোলো, তাই না? তুমি তো এদিকে আজকাল আসোই না।"

"আসি মাঝে মাঝে—।"

"তবে আগের মতো নয়, কি বলো?" হাসলো জেনী। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সেই বন্ধুটি কোথায়?"

হঠাৎ বুক দুরদুর করে উঠলো। "কোন্ বন্ধু?"

"সেই মিস্টার সুলেমান?"

বুকের স্পন্দন স্বাভাবিক হোলো। যার কথা ভাবছিলাম, তার কথা সে জিজ্ঞেস করলো না।

"সুলেমান? সে এখন করাচিতে আছে।"

"তাই নাকি? আর সেই বন্ধুটি?"

বুক আবার দুলে উঠলো।

"কে?"

"হেনরি ডি' সুজা?"

বুক আবার স্থির হোলো।

"সে এখানেই আছে।"

"আর যোগীন্দর সিং?"

"সে-ও এখানেই আছে। নিজের অফিস করেছে স্ট্র্যাণ্ড রোডে। এতক্ষণ তো তারই সঙ্গে ছিলাম।"

"ও!" চুপ করে রইলো জেনী।

আমি ভাবলাম যার কথা এড়ানোর চেষ্টা করছি, তার কথা কি জিজ্ঞেস করবে সে ?

জেনী বললো, "আজ-কাল আর কারো সঙ্গেই দেখা হয় না। এত ব্যস্ত থাকি !"

"কাজ করছো নাকি কোথাও ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, আমাদের একটি নতুন স্কুল হয়েছে, হুং-সুং-তাও মেমোরিয়্যাল হাই স্কুল। সেই স্কুলের অফিসে কাজ করি।"

তারপর যেন আর কিছু বলবার নেই।

আর কি বলা যায়, আমিও ভেবে পেলাম না।

অনেকের কথাই মনে এলো। জেনীর ভাই সুং-চাং আর চিয়েন-চাং, সুং-চাং এর বন্ধু ফেং-চেং-শিয়াং, ফেং-চেং-শিয়াংএর চোখ-ধাঁধাঁনো বোন টিং-লিং, ওদের বন্ধু স্টীভ রবিনসন, আর আরো অনেকে, যাদের সঙ্গে অনেক মধুর দিন কাটিয়েছি এ পাড়ায়, কে জানে আজ তারা কোথায়! তাদের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করতে পারলাম না।

শুধু বললাম, "তুমি কি এখনো সেই আগের বাড়িতেই থাকো ?"

"আগের বাড়ি ?" জেনী হেসে উঠলো। "ও বাড়ি আর নেই। সে রাস্তাই নেই। তুমি দেখছি সব ভুলে গেছ। আমাদের রাস্তাটি কোথায় ছিলো তোমার মনে নেই ? ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো !"

তাকিয়ে দেখলাম চারদিক।

চারদিক ফাঁকা—পাথরের টুকরো আর সুরকি ছড়ানো। কর্পোরেশানের নিশ্চল স্টীমরোলারটির চালে বসে দু'-চারটি কাক জটলা করছে।

জেনী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

"ওই যে লোকটি যাচ্ছে, ওখান থেকে বেরিয়েছিলো বিবি আমেলিয়া লেন। ওই যে মেয়েটি বসে বালি দিয়ে প্যাগোডা বানাচ্ছে, সেখানেই ছিলো আমাদের—," হঠাৎ থেমে গেল জেনী। মুখ ফিরিয়ে নিলো কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে।

তারপর ফিরে তাকিয়ে হেসে বললে, "তুমি এত আসতে। সেই গুড্ ওল্ড্ ডে'স! মনে পড়ে ?"

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। এদিকে ব্ল্যাকবার্ণ লেন, ওদিকে ছাতাওয়ালা গলি। আর এপাশে ছিলো আঁকাবাঁকা অসংখ্য গলিঘুঁজি। জানা না থাকলে বিবি আমেলিয়া লেন খুঁজে পাওয়া বড়ো শক্ত। সব ভেঙে গুঁড়িয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে।

"কি ভাবছো ?" জিজ্ঞেস করলো জেনী ওয়াং।

হেসে বললাম, "ভাবছি ওখানে একটি মার্বেল ফলক লাগিয়ে দিলে কেমন হয়, যেখানে লেখা থাকবে: Here lived Jennie Wang and had fine time with her friends sometime in the summer of 1948......"

জেনী হাসলো। উত্তর দিলো, "তা' হলেও কি কারো মনে থাকবে ?"

আকাশের মেঘ আরো ঘন হয়ে এলো।

"বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে," জেনী বললো, "এবার বাড়ি যাই।"

বলতে না বলতেই টিপ-টিপ করে বৃষ্টি সুরু হোলো।

প্যারাসোল গুটিয়ে নিলো জেনী। বৃষ্টিতে সেটি অচল। সকালবেলা ফুটফুটে রোদ্দুর ছিলো। এমন দিনে কেউ ছাতা নিয়ে বেরোয় না! কে জানতো যে আমার সঙ্গে দেখা হবে জেনীর! কে জানতো যে এমন ঝলমল রোদ্দুর মুছে গিয়ে মেঘ করে বৃষ্টি নামবে!

কাছেই সরু গলিটির মোড়ে একটি ছোটো দোকান। দিনের বেলা বেশ ফাঁকা, নিরিবিলি। গোটা তিন কাঠের টেবিল ঘিরে কয়েকটি চেয়ার।

আমরা ঢুকতেই নীল পায়জামা আর নীল জামা-পরা একটী স্ত্রীলোক বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। মনে হোলো জেনীকে সে চেনে। তাকে দেখে হাসতেই সোনায় বাঁধানো দাঁত চিকমিক করে উঠলো। চীনে ভাষায় সে কি যেন জিজ্ঞেস করলো জেনীকে।

জেনীও উত্তর দিলো চীনে ভাষায়।

স্ত্রীলোকটি ফিরে এলো এক পট চা আর পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে। জেনী পেয়ালায় চা ঢেলে দিলো।

যেখানে আমি আর জেনী ওয়াং মুখোমুখি বসে, সেখান থেকে ওধারের ফাঁকা জায়গাটি দেখা যায়। সেখানে তখন ঝাপসা হয়ে বৃষ্টি নেমেছে।

কখন দেখি সেখানে আর ফাঁকা নয়, ঝাপসা নয়। সেখানে তখন আঁকা-বাঁকা গলি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া। উনিশ শো ছাপ্পান্নোর আষাঢ় মাসের সজল দুপুর মুছে গিয়ে আমার মন ঘিরে নামলো উনিশ শো আটচল্লিশের ফাল্গুনের এক ধূসর সন্ধ্যা।

উনিশ শো আটচল্লিশের ফাল্গুনের সেই ধূসর সন্ধ্যায় বাসের অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম বৌবাজার সেণ্ট্রাল এভিনিউর মোড়ে। হঠাৎ সামনে এসে থামলো একটি উড়ন্ত ট্যাক্সি। যে নামলো তার পরনে খাকি প্যাণ্ট আর সিল্কের স্পোর্টস শার্ট, মুখে চুরুট। কাছে এসে পিঠ চাপড়ে বললে, "তোকে দেখে নেমে পড়লাম। কি রকম আছিস? দাঁড়া, ভাড়াটা মিটিয়ে দিই। এখান থেকে হেঁটেই যাওয়া যাবে।"

"আমি যে সিনেমায় যাচ্ছি।"

"পাগল। এখন ছ'টা দশ। টিকিট পাবি না।"

"টিকিট করা হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি? তা'হলে ওটা কাউকে দিয়ে দে।"

"কা'কে আবার দিতে যাবো?"

"দে' না রাস্তার যে কোনো লোককে বিলিয়ে। সে সারা জীবন তোকে মনে রাখবে।"

দিলীপ দা'র জীবনদর্শন আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারলো না। বললাম, "সে হয় না। তিনটি টিকিট কেনা হয়েছে, দুটো আরেক জনের কাছে। ওরা আগে গিয়ে বসে থাকবে।"

"তাই নাকি ? বেচারা! তাদের তুই একদিনও একটু শান্তিতে সিনেমা দেখতে দিবি না ?—আরে, এই যে, সলোমন, শোনো শোনো, তোমার কথাই বলছিলাম।"

পাশ দিয়ে হন-হন করে যাচ্ছিলো একজন। এক বিঘত লম্বা নাক, শ্যেন দৃষ্টি, ফর্সা গায়ের রঙ, আধময়লা জামা-কাপড়, মাথায় বাটির মতো দেখতে একটি কাপড়ের টুপি।

সে থেমে পড়লো। কাছে এসে বললো, "হ্যালো মুখার্জী, তোমার বাড়ি চারদিন গিয়ে—"

দিলীপ দা' একগাল হেসে আমায় দেখিয়ে তাকে বললে, "এর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই বুঝি ? এ আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে অন্তরঙ্গ বন্ধু রঞ্জন"। তারপর আমার দিকে ফিরে—"এই যে পাষণ্ড অশ্বতরকে দেখছো এর নাম সলোমন, আমার হিতৈষী বন্ধু এবং পাওনাদার। গত বছর আমার দুর্দিনে দশটা টাকা ধার নিয়েছিলাম। কী বদমাইশ, এখনো তাগাদা দেয়! কিন্তু লোকটির অনেক গুণ। অভিশপ্ত ইহুদী জাতির মধ্যে এত বড় প্রতিভা জন্মায় নি। সমাজবিজ্ঞানে কার্ল মার্কস্, মনোবিজ্ঞানে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইন—আর ঘোড়দৌড়-বিজ্ঞানে এই সলোমন। এত ভালো রেসের টিপস্ দেয়, কতো লোক যে ফতুর হয়ে গেছে ওর টিপস্ নিয়ে। না, না, ঘোড়া জেতে না সে কথা বলছি না। ঘোড়া জেতে ঠিকই। কিন্তু একটা দুটো জিতে ভালোমানুষের নেশা ধরে যায়, ব্যস, সহধর্মিণীর ভ্রাতা এই লোকটি আর টিপস্ দেয় না, ভালোমানুষেরা ফতুর হয়ে যায়।—ওহে সলোমন, এই শনিবার সিলভার-ফিশের উপর ধরবে বলে দিচ্ছি। যাচ্ছে বটে আটের দরে, কিন্তু ঘোড়ার মুখের খবর, উইন না হোক প্লেস যদি না পায় তো আমার ৺বাবা আমার মতো সুসন্তানের নাম দিলীপ মুখার্জী রাখেনি। টাকাটা ? হ্যাঁ, এসো, কালই এসো, কিংবা সোমবার আমার অফিসে। ক্যানিং স্ট্রীটে নতুন অফিস করেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি তো দেবো। তোমায় তো দেখছি ভাগানো মুশকিল। ওহে, এখন কোথায় যাচ্ছো ?"

"দেখি জনি ম্যাকডোনাল্ডের বাড়ি গিয়ে, ওকে যদি পাওয়া যায়," সলোমন উত্তর দিলো।

"কেন, টাকার তাগাদায় বুঝি? মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেবে না? এমন সোনার গোধূলি, কোথায় ময়দানে দিয়ে গাছতলায় বসে চীনেবাদাম খেতে খেতে গুন্‌গুন্‌ করে সিনেমার লেটেস্ট হিট্‌ গাইবে, তা'নয়, একটি লোক সারাদিন খেটেখুটে আগামী কালের অন্নব্যঞ্জনের সংস্থান করে বাড়ি ফিরে বৌয়ের হাতের তৈরী চা খেতে খেতে ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে আদর করছে, যাবে তার সন্ধ্যাটি মাটি করতে। এক কাজ করো, একটি সিনেমা দেখে এসো। হ্যাঁ মেট্রোতে, খুব ভালো বই। ওহে রঞ্জন, টিকিটখানি দেখি।"

ডোবালে দিলীপ দা!

"ওটা বাড়িতে ফেলে এসেছি," মরিয়া হয়ে বললাম, "দিলীপ দা, তোমার ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে। চলো আমায় বাড়িতে নামিয়ে দেবে।"

বলে উঠে পড়লাম ট্যাক্সিতে। দিলীপ দা'ও এলো পেছন পেছন।

"আমার টাকাটা পরশু দেবে তো?" সলোমন জিজ্ঞেস করলো।

"দেখছো ছেলেটার সামনে জীবনমরণ সমস্যা। ওর বাড়ির মহিলারা হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর ও বাড়িতে টিকিট ফেলে এসেছে, আর তুমি আমায় টাকার জন্যে তাগাদা দিচ্ছো? আমার নাম করে পাঁচটা টাকা সিলভার-ফিশের উপর ধোরো, বুঝলে? সিলভার-ফিশের মাসী আমার মেশোমশায়ের ল্যাণ্ডো টানতেন, নিমকের মান রাখতে সিলভারফিশ উইন হোক, প্লেস হোক, একটা কিছু করে আমার দশ টাকা নিশ্চয়ই তোমায় ফিরিয়ে দেবে। আচ্ছা, বাই বাই।—চলিয়ে সর্দারজী। সিধা মেট্রো সিনেমা। এ্যাঁ, মেট্রো নয়? কোথায় তা'হলে? ও, আচ্ছা, লাইটহাউস চলিয়ে।"

অন্য যে কেউ দিলীপদা'র কথাবার্তা শুনলে অবাক হোতো। কিন্তু আমি ওর সংলাপে অভ্যস্ত। সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি দীলিপ দা'কে। আমার জ্যাঠতুতো দাদার ক্লাসফ্রেণ্ড, কিন্তু আমার সঙ্গেও যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা। প্রতিভাধর ছেলে, কিন্তু নিজের কেরিয়ার নষ্ট করেছে মদ খেয়ে আর রেস্‌

খেলে। কে আজ বিশ্বাস করবে দিলীপ দা' ইতিহাসে ফার্স্টক্লাস এম-এ? দিলীপদার মা ইংরেজ। তাই দিলীপ দা'র সোনালী চুল, ফর্সা রং, তবু বাঙালীর মেজাজ। যখন স্কুলে পড়ে তখন ওর মা আর বাবার মধ্যে কি রকম যেন একটা গণ্ডগোল হয়। ওর বাবাকে ডিভোর্স করে মা বিয়ে করলো আসামের এক চা-বাগানের সায়েবকে। তখন থেকে ছেলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। দিলীপ-দা পিসীর কাছে মানুষ, আর তখন থেকেই একটু কি রকম যেন। সংসারে কোনো কিছুর উপরই কোনো আসক্তি নেই। সিরিয়াস নয় কোনো ব্যাপারে, সব কিছুই খুব হাল্কা ভাবে নেওয়ার অভ্যেস। বাপের কিছু পয়সা ছিলো। এম-এ পাশ করবার পর দিলীপ দা'কে বিলেত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কিছু করতে পারেনি। ও ফিরে আসবার পর বাপ চলে গেলেন পণ্ডিচেরি। তখন থেকে বাপের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ নেই।

বিলেত থেকে ফিরে এসে একটি প্রাইভেট কলেজে প্রফেসারি পেয়েছিলো দিলীপ-দা। কিন্তু নিয়মিত ক্লাসে যেতো না বলে, আর যখন যেতো তখন ছাত্রদের রেসের টিপস্ দিতো বলে ছাত্র-মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি পেলো না।

দিলীপ দা'র ক্লাস নেওয়ার বর্ণনা অনেকের কাছেই শুনেছি।

…"নাইন্টিটু?"

"প্রেজেণ্ট স্যার!"

"নাইন্টি থ্রি—কী হে আগরওয়াল, শনিবার দেখিনি কেন? কোন ঘোড়াটা খেললে? কতোর দর? আচ্ছা, নাইটি ফোর?"

"প্রেজেণ্ট স্যার!"

"কে প্রক্সি দিচ্ছে হে! নিতাই বোস? কে এবারের ফেভারিট্, খবর রাখো? জাহাঙ্গীরের নাম কিন্তু অনেকেই করছে। ওর উপর একবার ধরে দেখতে পারো। নাইটি ফাইভ?"…

এই ছিলো দিলীপ দা'।

একদিন প্রিন্সিপ্যাল ডেকে পাঠালেন।

"দেখ দিলীপ, তোমায় কতো বার বলেছি, কলেজে একটু সংযত কথাবার্তা না বললে কলেজের বদনাম হয়। তুমি এরকম ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র বলে, আর বিশেষ করে মুখুজ্যে মশায়ের ছেলে বলে তোমায় কতো শীল্ড করে চলি। কিন্তু তুমি তো ইমপসিবল্ হয়ে উঠছো। গভর্ণিং বডি তো কিছুতেই তোমায় আর রাখতে চাইছে না।"

"সে তো আমি জানি। কিন্তু কাউকে আগামী শনিবার মর্নিং গ্লোরির উপর পাঁচটা টাকা ধরবার পরামর্শ দিয়ে তাকে যদি দশ পোনেরো টাকা রোজগার করবার ব্যবস্থা করে দিই, কী অন্যায়টা হয় বলুন? ছেলেরা ভালো খেতে পায় না, কলেজের মাইনে দিতে পারে না, দুটো সিগারেট ফুঁকতে পারে না। একটু নিজে রোজগার করতে শিখুক! আপনারা নিজেরা তো ওদের কোনো রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবেন না, আর আমি যদি দু-একটা ফন্দি-ফিকির বাতলে দিই তা'ও সহ্য করতে পারবেন না। সত্যি, প্রতিভার আদর আমাদের দেশে হয় না। যাক, আমি কিন্তু এর জন্যে তৈরী হয়েই এসেছি। এই নিন আমার রেজিগনেশান।"

দিলীপ দা'র মুখে শোনা—প্রিন্সিপ্যাল দিলীপ দা'র রেজিগ্‌নেশান নিলেন। তারপর দিলীপ-দা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন ডাকলেন পেছন থেকে, "দিলীপ! এক মিনিট। কোন্ ঘোড়াটার কথা বললে? মর্নিং গ্লোরি? ঠিক তো! আচ্ছা, থ্যাংক্যু।"

শিক্ষা-জগতের সঙ্গে দিলীপ দা'র সম্পর্ক শেষ সেদিন থেকে।

কিন্তু দিলীপ-দা পড়াতো ভালো। আমি যখন এম-এ দিচ্ছি, দিলীপ-দা আমায় পড়িয়েছিলো কিছু দিন। বেশ খেটে পড়িয়েছিলো, যার দরুণ আমার মতো ফাঁকিবাজ ছেলেও একটি মাঝারি গোছের রেজাল্ট করে এম-এ পাশ করতে পেরেছিলো।

দিলীপ-দা মাইনে নিয়ে পড়াতে রাজী হয়নি, কিন্তু যতো টাকা ধার নিয়েছিলো, মাইনে দিয়ে মাস্টার রাখলে অনেক সস্তা পড়তো।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুনোর পর, বড় একটা দেখা হোতো না ওর সঙ্গে। শুনেছিলাম, একটু অর্থাভাব যাচ্ছে। তাই আজ ট্যাক্সিতে দেখে অবাক হলাম।

দিলীপ-দা এখন কি করছে, সেটা জিজ্ঞেস করবো কি করবো না যখন ভাবছি, সে বললে, "সলোমনকে টিকিটটা দিলি না কেন? বেচারা এ রকম একটা ভালো ছবি মিস্ করবে।"

"সে কথা ভেবে তো টিকিট কেনা হয়নি। আরেকজনের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা কাটাবো বলেই কেনা হয়েছে।"

"তাতে কি! না হয় তোর হয়ে সলোমন তার সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতো। বলতো, সে তোর বন্ধু, তুই-ই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিস। ভদ্রলোক কি মাইণ্ড করতেন?"

"কোন্ ভদ্রলোক?"

"তোর বন্ধু।"

"ভদ্রলোক নয়, ভদ্রমহিলা।"

"তাই নাকি? কে রে?"

"তুমি চিনবে না। আমার এক বন্ধুর বৌয়ের মামাতো বোন। আমার বন্ধুটিও সঙ্গে থাকবে অবশ্যি। সেই সিনেমা দেখাচ্ছে আমাদের।"

"তাই নাকি? নাম কি তার?"

"আমার বন্ধুর?"

"না রে তার শালীর—"

"রেবা। রেবা চৌধুরী।"

"বাঃ, বেশ নাম। আচ্ছা, চল তোকে নামিয়ে দিয়ে আসি।"

আর কিছু বললো না দিলীপ-দা।

লাইট হাউসে পৌঁছে দিয়ে বললো, "দেখি তোর টিকিট?"

বার করে দিলাম।

কাউন্টারে "হাউস ফুল" টাঙানো। দু-চার জন তার সামনে বিষণ্ণ মুখে ঘোরাঘুরি করছে।

দিলীপ-দা জিজ্ঞেস করলো, "এদের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর দেখতে কোন্ ছেলেটি বল তো? ওই সিল্কের হাওয়াইয়ান শার্ট-পরা ছেলেটি, না?" বলে টুক করে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, "আপনার টিকিট চাই?"

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠতে না উঠতেই লেন-দেন পরিষ্কার হয়ে গেল। ছেলেটা হলের মধ্যে ঢুকে পড়লো কোটর-মুখো কাঠবেড়ালীর মতো।

আমি স্তম্ভিত!

"এ কি হোলো দিলীপ-দা?"

"যা হোলো তোর ভালোর জন্যেই হোলো। তুই পারতিস? এমন গাধা! বন্ধুর প্যাঁচ বুঝিস না? দেখ তো, কী উপকার করলাম! তোর করলাম, এই ছেলেটির করলাম, তোর বন্ধুর শালীরও করলাম। তোরা চিরকাল আমার কাছে বাধিত থাকবি।"

আসন্ন একটি বন্ধু-বিচ্ছেদের কথা ভাবতে ভাবতে শ্লথ-পদক্ষেপে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

আবার ট্যাক্সি আরোহণ।

দিলীপ দা' কী যেন বকে যাচ্ছিলো, খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি বৌবাজার স্ট্রীট পেছনে রেখে ট্যাক্সি ঢুকছে একটি গলিতে।

"এ কোথায় নিয়ে এলে দিলীপ-দা?"

"আয়, এখানে নেমে পড়া যাক। ট্যাক্সি আর যাবে না। গলিটা বড্ড সরু এর পর থেকে।"

নামলাম।

ট্যাক্সি ব্যাক্ করে বেরিয়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি, ডাইনে চীনে ডেন্টিস্টের দোকান, শো-কেসে তুলোর উপর কয়েক পাটি নকল দাঁত পথচারীদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। বাঁয়ে একটি চীনে লণ্ড্রী। ওপাশে কাচের আলমারি সাজানো একটি মনোহারী দোকান, তার সাইন বোর্ডও চীনে ভাষায়। কী রকম একটা গন্ধ নাকে এসে লাগলো। তেল নয়, চবিতে রান্না হয় এদের খাবার, তারই গন্ধ।

"রঞ্জন, আগে কোনো দিন এ পাড়ায় এসেছিস ?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, দু'-একবার নানকিংএ খেতে এসেছি। কিন্তু সে দিনের বেলা। তবে এ তো নানকিং যাওয়ার রাস্তা নয় !"

"সেখানে তো যাচ্ছি না।"

"তা'হলে ?"

"যাচ্ছি আরেকটি আড্ডায়," দিলীপ হাসলো, "একেবারে হার্ট অফ দি চায়না টাউন।"

* দুই *

দিনের বেলা চীনে রেস্তরঁায় খেতে যাওয়ার সময় দেখেছি, কি রকম যেন একটা ঘুম-ঘুম নিস্তব্ধ আবহাওয়া! কিন্তু রাতের চায়না টাউন অন্য রকম। অনেক বেশী ভিড়, অনেক বেশী হট্টগোল, অনেক বেশী অনুস্বরান্ত কলরব, অসংখ্য কাঠের খড়মের ঠক-ঠক পদশব্দ। হয়তো বা আচমকা দু-চারটে বাজি পটকার বিস্ফোরণ, একটানা ভূতুড়ে সুরে তীক্ষ্ণ ভিনদেশী বাঁশী, তালে তালে চীনে কাঁসরের গা-ছমছমানো ডিং-ডং আওয়াজ,—সে কোনো উৎসবের আয়োজন হতে পারে, শবযাত্রার প্রস্তুতিও হতে পারে। ডাইনের বাড়ির একতলায় দরজা-খোলা বাইরের ঘর থেকে চপ-স্টিকের টুক-টুক শব্দ। এপাশের দোতলায় গোল-গোল অথবা হাতপাখার-অর্ধবৃত্ত-আকৃতির জানলার ওপারে 'মাহ্-জং' এর আসর। হয়তো আচমকা ওপাশের এক-কাঁধ চওড়া কোনো এক অন্ধকার এঁদো গলি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবে এক পাংশু-মুখ মোটা ইহুদী। বেরিয়ে এসে মিশে যাবে লোকের ভিড়ে। পেছন পেছন গলির মুখে এসে দাঁড়াবে অন্য দুজন লোক। তাদের মুখ দেখে আপনার পিলে চমকে যাবে। ওরা আপনাকে লক্ষ্যই করবে না। গলির চলতি ভিড়ও ফিরে তাকাবে না তাদের দিকে। সেই দুজন খুব আস্তে ধীরে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার ফিরে যাবে, মিশে যাবে গলির অন্ধকারে।

আর যা কিছু দেখবার, আর যা কিছু জানবার—সে সব দেখতে জানতে সময় নেবে। প্রথম দিন প্রথম পদসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে আপাতত এটুকুর বেশী নয়। অনেক বছর আগে দেখা সিনেমার ঝাপসা স্মরণের মতো,—পরিষ্কার খুঁটিনাটির চাইতে আভাসেই অনেক বেশী।

আজ শুধু মনে পড়ে এঁকে-বেঁকে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে ঘুরে পথ যখন আরো সরু হয়ে মোড় ফিরে হঠাৎ ঝুম করে নির্জন নিঃসাড় হয়ে গেল, আর

নিষ্প্রভ গ্যাসলাইটের ছায়া ছমছমে আধো-অন্ধকারের ওপার থেকে ভেসে এলো কোনো এক কিন্নর-কণ্ঠে চীনে অপেরার গান, দিলীপের গা ঘেঁসে আস্তে আস্তে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম,—"এ রাস্তার নাম কি ?"

দিলীপ হেসে আরো আস্তে আস্তে বললে, "এ রাস্তার নাম? খুব মিষ্টি নাম—বিবি আমেলিয়া লেন।"

পথ চলতে চলতে বিবি আমেলিয়ার গল্প বলে গেল দীলিপ-দা।

"সে যুগের কলকাতার একজন নামকরা সুন্দরী ছিলো আমেলিয়া বিবি। অনেক আমীর-ওমরাও রাজা-মহারাজার আসরে ডাক পড়তো তার, অনেক মহাজনের পায়ের ধূলো পড়তো তার বাড়িতেও। লোকে বলতো, সে জাতে ইহুদী, যদিও তার পদবীটা আজ আর কারো মনে নেই।

সে যখন এ রাস্তায় থাকতো, তখন এ অঞ্চলে অনেক ইউরেশিয়ানের বসবাস। সিপাই বিদ্রোহ যখন আরম্ভ হয়েছে তখন তার বোধ হয় উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস। সে সময় একজন খুব অর্থবান সায়েব মার্চেণ্ট ছিলো কলকাতায়, নাম ক্রিস্টোফার গ্রীণ। তার খুব অনুগ্রহভাজন ছিলো আমেলিয়া। গ্রীণ সাহেব ছিলো তখনকার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডের প্রিয় বন্ধু। সুতরাং তখনকার কলকাতার রাজনীতির নেপথ্যের অনেক ব্যাপারে আমেলিয়া বিবির বৈঠকখানার একটা গুরুত্ব ছিলো। লোকে বলে মিউটিনির সময় আমেলিয়া তার সায়েব বন্ধুদের বিশেষ একটা উপকার করেছিলো,—যদিও সে কথা ইতিহাসের পাতায় রেকর্ড করা হয়নি।

সে সময় সিন্ধুর গদীচ্যুত আমীরেরা থাকতো কলকাতার উত্তরে,—দমদমে। কয়েক শো সশস্ত্র রক্ষী ছিলো তাদের সঙ্গে। ওদের একজন নিকট-আত্মীয় সাহেবজাদা ইফতিকার ইসমাইল খান প্রায়ই আসতো আমেলিয়ার কাছে।

কলকাতার ইতিহাসে যাকে বলে "প্যানিক সানডে" (Panic Sunday), অর্থাৎ ১৮৫৭র ১৪ই জুন রবিবার,—তার আগের দিন রাত্তিরে নাকি সাহেবজাদা ইফতিকার এসেছিলো আমেলিয়ার কাছে, মদের ঘোরে তাকে বলেছিলো, ব্যারাকপুরের সেপাইরা তাদের সঙ্গে আসুক বা না আসুক, তার

পরিচালনায় তাদের কয়েক শো রক্ষী গার্ডেনরীচের নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র হাজার খানেক সশস্ত্র অনুগামীদের সঙ্গে দু'দিক থেকে কলকাতার উপর চড়াও হবে রোববার দিন সন্ধ্যেবেলা। তারপর ইফতিকার গ্রীণ সায়েবকে ময়দানের গাছে লটকিয়ে আমেলিয়াকে তার বেগম করবে। কলকাতা তখন নানা রকম গুজবে গমগম করছে। আমেলিয়া ইফতিকারকে মদের সঙ্গে আর কি যেন মিশিয়ে খাইয়ে বেহুঁশ করে রেখে গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা চলে গেল গ্রীণ সায়েবের বাড়িতে। কিন্তু গ্রীণকে পাওয়া গেল না। তার বোনের ছেলে হচ্ছে, সে ডাক্তার নিয়ে গেছে সেখানে।

সেদিনের রাত কেটে গেল। তার পরদিন সকালে গীর্জার মর্নিং সার্ভিস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, ব্যারাকপুরের সেপাইরা বিদ্রোহ করে কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে, আশে-পাশের শহরতলীর লোকজনও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে, খিদিরপুরে লুঠপাট করতে সুরু করেছে নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সায়েব আর ফিরিঙ্গী মহলে 'পালা-পালা' রব পড়ে গেল। সায়েবরা দলে দলে ছুটলো নদীর দিকে, গঙ্গার বুকে নোঙ্গর-করা জাহাজগুলিতে আশ্রয় নিতে। আর অনেকে আশ্রয় নিলো ফোর্টে। প্রাণের ভয়ে দিশাহারা সায়েবদের পাড়ায় সে কী দৃশ্য! তখনকার দিনের এক সায়েব, কর্ণেল ম্যালেসন, সেই ১৪ই জুনের কলকাতার আশ্চর্য বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন তাঁর বিখ্যাত "রেড-প্যাম্ফলেটে"। জানো রঞ্জন, তিনি খোলাখুলি লিখেছেন,—It has been said by a great writer that there is scarcely a more undignified entity than a patrician in a panic. The veriest sceptic as to the truth of this aphorism could have doubted no longer, had he witnessed the living panorama of Calcutta on the 14th June. All was panic, disorder, and dismay.

এদিকে সকাল না হতেই আমেলিয়া বিবি আবার বেরিয়ে পড়লো গ্রীণ সায়েবের খোঁজে। গিয়ে শুনলো, গ্রীণ সায়েবের একটি ফুটফুটে ভাগ্নে হয়েছে—

আর গ্রীণ সায়েব তল্পিতল্পা নিয়ে কেটে পড়েছে জাহাজঘাটার দিকে। আমেলিয়াও ছুটলো সেদিকে। তার সঙ্গে দেখা হতে আমেলিয়া বললে যে সাহেবজাদা ইফতিকার ইসমাইল খান তখনো তার ঘরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে! শুনে তো গ্রীণ সায়েব জুড়ি-গাড়ি হাঁকিয়ে তক্ষুণি ছুটলেন বেলভেডিয়ারে হ্যালিডে সায়েবের কাছে। কিন্তু হ্যালিডে সায়েব তখন বেলভেডিয়ার থেকে আস্তানা গুটিয়ে সরে এসে ডেরা পেতেছে গভর্নর জেনারেলের কাছাকাছি। গ্রীণ সায়েব ফিরে এসে শুনলেন একদল সায়েব এসে জড়ো হয়েছে,—কোথায় জানো?—এখন যে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, তখন তার নাম ছিলো উইল্‌সন্‌স্ হোটেল,—সেই হোটেলে। তাদের মধ্যে একদল হাতিয়ার যোগাড় করে গ্রীণ সায়েবের সঙ্গে চললো আমেলিয়া বিবির বাড়ি, সায়েবজাদা ইফতিকারকে ধরতে, আর প্রায় চল্লিশ জন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চেপে টহল মারতে গেল উত্তর-কলকাতার নিরীহ বাঙালীপাড়ায়।

সেদিন রাত্তিরে যখন অযোধ্যার নবাব আর তাঁর উজীরকে বন্দী করে ফোর্টে নিয়ে আসা হয়েছে, আর সে খবর তখনো না জেনে কলকাতার ভয়ার্ত ফিরিঙ্গীরা বন্দুকের এলোপাথাড়ি ফাঁকা আওয়াজ করে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে—আর দিল্লীতে লালকেল্লায় বাহাদুর শা' তখনো হিন্দুস্থানের বাদশা—তখন নাকি আমেলিয়া বিবির বাড়িতে একটি কুঠুরির ভিতর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলো সাহেবজাদা ইফতিকার ইসমাইল খান, আর দোতলার একটি হলঘরে স্কচ হুইস্কির আসর জমে উঠেছিলো আমেলিয়া, গ্রীণ সায়েব আর অন্যান্য খাঁটি বৃটিশ বীরপুরুষদের নিয়ে। কোনো নেটিভ রাজা-মহারাজা জমিদার সেদিন রাত্তিরে এপাড়ার ছায়াও মাড়াতে সাহস করেনি।

সেদিনকার সেই ফিরিঙ্গীবহুল অঞ্চল আজ চায়না-টাউন—তার মধ্যে শুধু আঁকাবাঁকা পড়ে আছে বিবি আমেলিয়া লেন।"

একটু চুপ করে থেকে দিলীপ বললো, "তার প্রায় বছর তিরিশ পর আমেলিয়া বিবি যখন মারা যায়, তদ্দিনে এসব গল্প অনেকেই ভুলে গেছে।

তখন চীনে অধিবাসীতে ভরে গেছে এ অঞ্চল, আর এ অঞ্চলের নামকরা দুর্ধর্ব আকর্ষণ হয়ে উঠেছে আমেলিয়ার মেয়ে রেবেকা বিবি।"

"যা বললে এ-সব সত্যি দিলীপ দা?" আমি পথ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম।

দিলীপ হাসলো। বললে, "চায়না টাউনের বুড়োদের মুখে নানারকম গল্প শোনা যায়।"

"তুমি কার কাছে শুনেছো এ-সব।"

"বুড়ো ওয়াং-এর কাছে। চল না দেখবি তা'কে।"

বলতে বলতে দিলীপ যেখানে এসে থামলো সেখানে দেখি, একটি বাড়ির একতলার সামনে একটি জীর্ণ সাইনবোর্ড, চীনে অক্ষরে লেখা। ঘরের ভিতর দুটো তিনটে চৌকো টেবিল। আশে-পাশে দু-চারখানা করে চেয়ার। লোকজন নেই। খুব কম পাওয়ারের দুটি আলো ঝুলছে ঘরের দু'পাশে। মাঝখানে একটি অচল ফ্যান। দু-চারটে বাদুড় উড়ছে। এক পাশে একটি কাউন্টার। সেখানে চার-পাঁচটা বয়ামে বিস্কুট আর এটা-ওটা-সেটা সাজানো।

"এটা কি দিলীপ দা'?"

"রেস্তরাঁ।"

"এখানেও রেস্তরাঁ?"

"আয় না।"

ঘরে ঢুকে কিন্তু সেখানে বসলো না। ডাইনে একটি স্প্রিংএর দরজা। সেটি ঠেলে এসে পড়লাম একটি প্যাসেজে। ম্লান সবুজ আলো জ্বলছে এক-পাশের দেওয়ালে। সেই প্যাসেজ ধরে ভেতর দিকে খানিকটা এগিয়ে ডাইনে একটি সমকোণে ঘুরে আরো একটু যেতেই প্যাসেজের শেষে ফ্রস্টেড্ কাচের দরজা। খুব উজ্জ্বল আলো আসছে কাচের ভেতর দিয়ে।

উচ্ছ্বসিত হাসির আওয়াজ এলো।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি, একটি বেশ বড় ঘর। মাঝখানে একটি বড়ো গোল টেবিল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। দেয়ালের গায়েও দু-তিনটে চেয়ার সাজানো। দু-কোণে গোটা দুই নিচু টেবিল। টেবিলে ফুলদানি, তাতে দু'টো তিনটে করে কার্নেশান, গ্লাডিওলা আর এ্যাসটার ফুল। দেওয়ালে গোটা দুই চাইনিজ স্ক্রোল্।

গোল টেবিল ঘিরে বসে ছিলো কয়েক জন। আমাদের ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়ালো। "হিয়ার কাম্স আওয়ার ফ্রেণ্ড মুখার্জী—।"

"এত দেরি হোলো কেন? তোমার আশা করছিলাম অনেকক্ষণ আগে।"

"আসছো না দেখে ভাবলাম আজ হয়তো রেস-এ অনেক টাকা হেরেছো।"

"ও—নো। হারুক বা জিতুক মুখার্জী আসবেই। হারলে দুঃখ ভুলতে আসবে, জিতলে সেলিব্রেট করতে আসবে।"

"বাই দি ওয়ে, আজ আমাদের একজন নতুন বন্ধু এসেছে। জেনীর সঙ্গে আসছে আরো দু'জন। আর তুমিও তো দেখছি একজনকে এনেছো। লেট্'স ইনট্রডিউস আওয়ার সেলভ্স টু ওয়ান এনাদার। সুলেমান, এদিকে এসো। মীট প্রফেসার দিলীপ মুখার্জী। সে এখন আর প্রফেসার নেই। হী ইজ ইন বিজনেস লাইক মোস্ট অফ আস। কিন্তু অল্ দি সেম আমরা ওকে প্রফেসার বলে ডাকি। এ হোলো আমার বন্ধু হাসিম সুলেমান। করাচী থেকে এসেছে। হী ইজ ইন টী।"

"গ্ল্যাড টু মীট ইউ। হা' ড্যু' ডু।"

"হা' ড্যু' ডু।"

"জেনী কোথায়?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"জেনী ওর বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে তিনটের শো'তে। এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই।"

"মীট মাই ফ্রেণ্ড রঞ্জন।—এ আমার বন্ধু ওয়াং চিয়েন-চাং, এই রেস্তরাঁর প্রোপাইটার।"

নিখুঁত ছাটের স্যুটপরা, মাঝারি গড়ন। শ্মশ্রুবিহীন মোলায়েম ফর্সা মুখ।

বয়েস বোঝা যায় না। তবে দিলীপ-দার চাইতে বয়সে বড়ো হবে না নিশ্চয়ই।

"রেস্তরাঁর দু'টো অংশ দুরকম কেন?"

"বাইরেরটা বাইরের লোকের জন্যে," চিয়েন-চাং বললো, "ভেতরটা প্রাইভেট। এ শুধু বন্ধুবান্ধবের জন্যে। আসলে এদিকটায় আমরা থাকি, এ ঘরটার সঙ্গে রেস্তরাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।"

রেস্তরাঁর দীন চেহারার সঙ্গে রেস্তরাঁর মালিকের মহার্ঘবাস চেহারার কোনো মিল নেই। তবু আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

ওয়াং চিয়েন-চাংই আলাপ করিয়ে দিলো অন্য সবার সঙ্গে।

"এ আমার ছোটো ভাই ওয়াং চিয়েন-চাং।···আমার বোন মীনি ওয়াং।··· আমার বন্ধু ফেং চেং-শিয়াং···"

অত্যন্ত দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা, পরনে দামী রেয়নের স্যুট, স্পষ্ট মার্কিণ ছাঁট। সবুজ জেড্ পাথরের দামী হোল্ডারে একটি ধূমায়মান সিগারেট, কড়া গন্ধে বোঝা যায় ভাজা আমেরিকান তামাক। নাক, যেটুকু আছে, মনে হলো অত্যন্ত উঁচু।

"চেং শিয়াং-এর বোন মিস ফেং টিং-লিং!"···

টিং-লিং মীনি ওয়াং-এর চাইতে অনেক সুন্দর দেখতে। মীনি ওয়াং অতি সাধারণ চীনে মেয়ে। মিষ্টি মুখশ্রী, লিনেনের ফ্রকে প্রায় স্কুলের মেয়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু টিং-লিং আশ্চর্য সুন্দর, দুধে-আলতা গোলা রং বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই, কিংবা সাদা বরফের উপর এক ফোঁটা গোলাপী সিরাপ ঢেলে দিলে যে রকম হয়,—মোমের মতো নরম, চীনে মাটির ডলের মতো কমনীয়, চীনে শিল্পীর তুলির দু-চার টানে আঁকা ছবির মতো। পরনে হাতকাটা চীনে গাউন, হাঁটুর ঠিক নিচে অবধি তার ঝুল, কিন্তু উরুর দু-পাশ দিয়ে হাঁটু থেকে উরুর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত কাটা। জুতোর হীল অস্বাভাবিক উঁচু।

"আমাদের আরেকজন বন্ধু যোগীন্দর সিং।"

শেরওয়ানি আর চুড়িদার পায়জামায় দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা, মনে হয় যেন ময়দানের ও-প্রান্তে মনুমেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। খুব সরু করে ছাঁটা গোঁফ, ঘন চাপ দাড়ি, মাথায় গোলাপী পাগড়ির আবগুলো ইলেকট্রিক আলোয় চিক-চিক করছে। ফর্সা রং আর চোখা নাক, দীর্ঘ চোখ দুটো বেশ হাসিখুশী।

"হেনরি লরেন্স। পোর্টে কাজ করে।"

কলকাতার সাধারণ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ময়লা রং, বেশ স্মার্ট দেখতে।

"জয়প্রকাশ ত্রিবেদী। এ এসেছে দিল্লী থেকে, একটি ফার্মের এঞ্জিনিয়ার।"

জয়প্রকাশ ত্রিবেদী হাত তুলে নমস্কার করলো।

সে আমার পাশেই বসেছিলো।

সবাই যখন আবার গল্প-গুজব করতে সুরু করলো, সে আমায় বললো খুব পরিষ্কার বাংলায়, "আপনি দিলীপের খুব বন্ধু বুঝি? আপনাকে আগে কোনো দিন দেখিনি—।"

"দিলীপ-দার সঙ্গে আমার মাঝখানে বছর দু-তিন দেখা হয়নি। কিন্তু আপনি তো পরিষ্কার বাংলা বলেন!"

জয়প্রকাশ হেসে বললো, "আমরা দিল্লীর লোক। কিন্তু আমার মা বাঙালী।"

"আমার জন্যে বীয়ার,—" দিলীপ-দার গলা শোনা গেল।

"আমিও তাই। যা গরম! আর কিছু খাওয়া যায় না।"

"হোয়াট কুড আই অফার ইউ?"

"আমি? আমার এক কাপ চা হলেই চলবে।"

"হোয়াট? নো ড্রিঙ্কস্?"

"নট্ য়েট্,—" আরেক জন কে যেন হেসে বললো।

"অল রাইট, উই শ্যাল অল্ হ্যাভ্ টী। জেনী আর ওর বন্ধুরা আসুক, তার পর উই মে হ্যাভ সামথিং এল্‌স্।"

"জেনী কখন আসবে? সাতটা যে বেজে গেছে!"

"তুমি ওর বন্ধু ম্যাবেল রবিনসনকে নিশ্চয়ই চেনো ?"

"হ্যাঁ, একদিন দেখেছি।"

"সে আছে, আর, হেনরির গার্ল ফ্রেণ্ড মা-খিন-চ্যি আর ওর ভাই মওং মওং জ্যি।"

"বার্মিজ্ ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা! আমি জানতাম না হেনরির একটি নতুন গার্ল-ফ্রেণ্ড হয়েছে। বোধ হয় এটি তোমার চার নম্বর ?"

দিলীপের কথায় সবাই হাসলো।

"এ্যাণ্ড সো হোয়াট ?" জিজ্ঞেস করলো হেনরি লরেন্স।

"কিচ্ছু না। ঠিক আছে। তুমি সেই ভদ্রমহিলার কতো নম্বর ?"

টেবিলে ঘুষি মেরে হেনরি উঠে দাঁড়ালো দিলীপের প্রশ্ন শুনে।

"ব্যস, ব্যস, বুঝেছি," দিলীপ বললো, "তুমি অনেক গভীর জলে তলিয়ে গেছ। তা' না হলে তুমি চট্‌তে না। আমি তোমার সাফল্য কামনা করি, যাতে তুমি সারা জীবন একটি বিশ্বস্ত বধূর বাক্যবাণ-জর্জরিত হয়ে সুখী হও। —আ-হা, আমার কথায় রাগ করছো কেন ? একজন বিখ্যাত আধুনিক দার্শনিক বলেছে, সাত বার প্রেম-করা ছেলে যদি অষ্টম বার একটি পাঁচ-বার-প্রেম-করা মেয়ের প্রেমে পড়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করে, তা হলে মানব-সমাজে ডিভোর্স বলে কোনো কিছু থাকবে না, পারিবারিক জীবন সত্যি সত্যি শান্তিময় হবে।"

"তুমি ক'বার প্রেম করেছো প্রফেসার ?"

"আট বার হয়ে গেছে। A cat has nine lives জানো তো! পরেরটির পথ চেয়ে বসে আছি।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি। পঞ্চমার খোঁজ করতে করতে আরো সংখ্যা বেড়ে যাবে।"

"ওহে প্রফেসার, জানো, মা-খিন-চ্যি একজন আর্টিস্ট! খুব ভালো ছবি আঁকে। ওদের দেশে ওর খুব নামডাক।"

"তাই নাকি?" একটু চুপ করে গেল দিলীপ। তারপর বললো, "দেখ হেনরি, বন্ধুর একটি পরামর্শ গ্রহণ করবে? যাকে খুশি বিয়ে করো, কিন্তু আর্টিস্টকে নয়।"

"কেন?"

"যে মেয়ে আর্টিস্ট, সে তো কোনো দিন তোমায় সময় মতো ব্রেকফাস্ট তৈরী করে খাওয়াতে পারবে না? তোমায় বকাবকি করতে পারবে না, ছুটির দিনে বাড়িতে পাওনাদার এলে তুমি থাকলেও নেই বলে তাকে ভাগিয়ে দিতে পারবে না—নেহাৎ সে যদি আমার বন্ধু সলোমন দি জু না হয়। আর্টিস্ট শুধু বসে বসে ছবি আঁকবে, যা সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। ছবি দেখে তুমি যখন হাসবে, সে অন্য কোনো সমঝদারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে ঘর ছেড়ে। মেয়ে-আর্টিস্ট খুব ভালো সুইট-হার্ট হয়, ভালো বৌ হতে পারে না।"

"কে বললে? তুমি মা-খিন-চ্যিকে জানো না—"

"দেখ ছোক্‌রা, তুমি ক'জন আর্টিস্টের সঙ্গে প্রেম করেছো?"

"তুমি ক'জনের সঙ্গে করেছো?"

"আমি? যখন বিলেতে ছিলাম, ব্রাইটনে একটি ফ্রেঞ্চ মেয়ে-আর্টিস্টের সঙ্গে প্রেম করেছি দু' হপ্তা। যখন রিভিয়েরায় গিয়েছিলাম, ক্যালিফর্নিয়ার এক মেয়ে-আর্টিস্টের সঙ্গে প্রেম করেছি তিন দিন। যখন নেপল্‌স্‌-এ ছিলাম, একজন হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে-আর্টিষ্টের সঙ্গে—"

"প্রফেসার, তোমার কী আর্টিস্টিক রুচি!"

"বেছে বেছে শুধু আর্টিস্টরাই কেন তোমার প্রেমে পড়লো বন্ধু?"

"ব্যস, ব্যস, অনেক হয়েছে। মানলাম তুমি যখনই যে সমুদ্রতীরে গেছ, সেখানেই এক বিদেশী মেয়ে-আর্টিস্টের সঙ্গে প্রেম করেছো! তা'তে কি প্রমাণ হোলো?"

"বৎস, আমার কথা শেষ করতে দাও। ফ্রেঞ্চ মেয়ে আমায় বসিয়ে একটি ছবি আঁকলো, ছবির নাম দিলো: The dreamer from India। একজিবিশানে এক ইংরেজ ধনী সে-ছবি কিনতে চাইলো কয়েক হাজার পাউণ্ড দিয়ে। মেয়েটি তাকে ছবি না বেচে তাকে বিয়েই করে ফেললো। ক্যালিফর্নিয়ার মেয়ে মন্টিকার্লোয় সমুদ্রের তীরে আমায় একটি বিছানার চাদর হাঁটুর উপর আঁট ধুতির মতো পরিয়ে, মাথায় একটি লাল চেক পর্দা লাল গামছার মতো জড়িয়ে ছবি আঁকলো: The fisherman from Puri। সেটি কভার পেজ-এ ছাপলো একটি বিখ্যাত মার্কিন ম্যাগাজিন। মেয়েটি সেই ম্যাগাজিনে চাকরি নিয়ে নিউইয়র্কে চলে গেল। হাঙ্গেরিয়ান মেয়েটি আর আমি নেপল্‌স্‌-এ এক নাইট-স্পটে বসে গল্প করছিলাম, এমন সময় হলিউডের ফিল্ম কোম্পানির এজেণ্ট এসে তাকে আবিষ্কার করলো। ব্যস, এখন তার ছবি কলকাতায় এলে তোমরা হুড়মুড় করে এ্যাডভান্স বুকিং করতে ছোটো আর আমি বসে ধরমতলার বার-এ বসে দিশী হুইস্কি খাই।—এদের বিয়ে করলে কেউ কোনো দিন সুখী হতে পারবে?"

"মনে হচ্ছে ওদের বিয়ে করতে না পেরে তুমি খুব মর্মাহত হয়ে আছো।"

"যদি ওদের বিয়ে করতে তা'হলে কি তোমায় আমাদের মধ্যে পেতাম?"

"তুমি কী লাকি, যেই তোমার সঙ্গে একবার প্রেম করে তারই ভবিষ্যৎ খুলে যায়!"

"আর্ট যারা ভালোবাসে তারা চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।"

"তা'ছাড়া ওরা পশ্চিমের মেয়ে—," বললো হেনরি লরেন্স।

"মেয়েদের আবার পূব-পশ্চিম কি?"

"হাজার হোক আমাদের চীন বা বর্মা বা ভারতের মেয়েরা ইউরোপ-আমেরিকার মেয়েদের মতো নয়।"

"কি করে জানলে? তুমি বিচার করে দেখবার সুযোগ পেয়েছো?"

"তুমি পেয়েছো?"

"হ্যাঁ—আমি ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি, ফ্রেঞ্চের সঙ্গে করেছি,

আমেরিকান, সুইডিশ, হাঙ্গেরিয়ান, জার্মাণ, নিগ্রো, টার্কিশ, পার্শিয়ান, স্পেনিশ, বাঙালী, মাদ্রাজী—"

"ব্যস, ব্যস, প্রফেসার, আর বলতে হবে না। মানলাম তুমি ইণ্টার-ন্যাশনেল ফিগার। কিন্তু আটের বেশী হয়ে গেল যে!"

"তুমি চাইনীজ মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েছো কোনো দিন?"

চট করে কোনো উত্তর দিলো না দিলীপ।

"ওকে ও কথা জিজ্ঞেস কোরো না। চায়না টাউনের মাঝখানে বসে সত্যি কথা বলতে হয়তো ওর সৌজন্যে বাধবে—"

"দেখ, আমি যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলাম তখন হংকং থেকে একটি চাইনীজ মেয়ে—"

সবাই হাসতে সুরু করলো। এমন হাসি, হাসির তোড় আর থামে না কিছুতেই।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। এমন সময় চা নিয়ে এলো মীনি ওয়াং।

একটি মস্তো বড়ো ল্যাকারের ট্রে, তা'তে সোনালী রেখায় ছবি আঁকা। ট্রে থেকে একটি পট নামিয়ে রাখলো টেবিলে। নীল পোর্সিলেনের টি-পট, ড্রাগন আঁকা। তার সঙ্গে রং মেলানো কয়েকটি ছোটো ছোটো পোর্সিলেনের বাটি, উপরটা ঢাকা। চা ঢেলে এগিয়ে দেওয়া হোলো সবাইকে। ঢাকনির এক পাশে একটি ফাঁক! সবাই দেখি, সেখানে ঠোঁট লাগিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

বাটি ধরে আমিও চুমুক দিলাম। ওয়াং সুং-চাং আমার মুখের দিকে তাকালো। "এনি থিং রং উইথ্ ইওর টী?"

"না, না। চমৎকার ফ্লেভার, কিন্তু," আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "আমারটিতে বোধ হয় দুধ-চিনি দিতে ভুলে গেছেন।"

সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকলো।

ফেং চেং-শিয়াং বললো, "এটা আমাদের গ্রীণ-টী। বোধ হয় তোমার অভ্যেস নেই।"

মীনি বললো, "আচ্ছা, আমি দুধ-চিনি দিয়ে এক কাপ চা করে আনছি।"

"দরকার নেই," বললো দিলীপ, "ও অভ্যেস করুক! দুধ-চিনি চায় তো এনে দাও। ওগুলো আলাদা খেয়ে নেবে। পেটে গিয়ে সব ইণ্ডিয়ান টী হয়ে যাবে।—কিন্তু, জেনী ওয়াং এখনো আসছে না কেন?"

আমায় সহানুভূতি করেই বোধ হয় আর কেউ দিলীপের কথায় হাসলো না। শুধু বোকার মতো আমিই হাসলাম।

দিলীপ আমায় বললো, "জানিস, আমাদের চায়ে আর ওদের চায়ে শুধু একটি মিল। চা'কে আমরা চা বলি, ওরাও বলে চা। ম্যাণ্ডারিন চাইনীজে 'চা', ক্যাণ্টনীজ ভাষায় উচ্চারণে একটু তফাৎ—ওরা বলে 'ছা'। তার থেকে আমাদের বাংলায় 'চা', হিন্দিতে 'চায়'। আর হকিয়েনের ভাষায় বলে 'টে', যার থেকে ফরাসী আর ইংরেজী প্রতিশব্দ এসেছে।"

"আমাদের ভাষার প্রভাব তা'হলে আন্তর্জাতিক বলতে হবে—"

"নো ব্রাদার, এটা ওয়ান-ওয়ে ট্র্যাফিক নয়। আমাদের সংস্কৃত ভাষা থেকেও কিছু শব্দ গেছে তোমাদের ভাষায়। যেমন? এই ধরো, ম্যাণ্ডারিন। তোমাদের দেশে রাজপুরুষকে বলে ম্যাণ্ডারিন, তোমাদের জাতীয় ভাষাকেও বলে ম্যাণ্ডারিন। এ শব্দটা কোত্থেকে এসেছে জানো? সংস্কৃত 'মন্ত্রিন' থেকে।"

ফেং চেং-শিয়াং হাসলো। বললো, "আমাদের ভাষায় ম্যাণ্ডারিন বলে কোনো শব্দ নেই।"

"সে কি!"

"ওটা ইউরোপীয়েরা আমাদের সম্বন্ধে ব্যবহার করে। কথাটা এসেছে পর্তুগীজ 'ম্যাণ্ডারিম' থেকে। ওরা নিয়েছে মালয় ভাষার 'মান্‌ত্রি' থেকে। 'মান্‌ত্রি' মানে উপদেষ্টা, মালয় ভাষায় শব্দটা হয়তো সংস্কৃত 'মন্ত্রিন্‌' থেকে এসেছে। 'ম্যাণ্ডারিন' ইংরেজী শব্দ।"

"তোমরা কি বলো তা হলে?"

"আমরা বলি তং-শান'এর ভাষা। তং-শান মানে 'তং'এর দেশ। 'তং' হচ্ছে 'তাং' শব্দটির ক্যান্টনীজ উচ্চারণ। তাং রাজাদের আমলে দক্ষিণ চীন থেকে যারা বিদেশে যেতো, ওরা নিজেদের বলতো 'তং-য়েন', অর্থাৎ 'তং' বা 'তাং'এর সন্তান। চীনদেশকে বলতো তং-শান অর্থাৎ তং বা তাংদের দেশ। তার থেকে 'তং-শান'এর ভাষা, যাকে ইউরোপীয়ানরা বলে ম্যাণ্ডারিন।"

"মনে হচ্ছে তুমি যেন ঠকে গেলে প্রফেসার—"

"না, ঠকে যাবো কেন? আমরা সবাই সবার কাছে অনেক কিছু শিখি।"

"বেশ তো, তোমার কি শেখাবার আছে বলো?" বললো সুলেমান।

"তুমি আজ নতুন এসেছো, না?"

"হ্যাঁ।"

"রঞ্জনও আজ নতুন—।"

শুনে আমি একটু হাসলাম।

"বেশ শোনো। তোমাদের কাছে এ একেবারে নতুন গল্প। সুং-চাং আর চিয়েন-চাং বোধ হয় জানে, কিন্তু মিস ফেং আর চেং-শিয়াং না-ও জানতে পারে।"

সবাই নড়ে-চড়ে বসলো।

দিলীপ-দা প্রচুর মদ্যপান করুক বা রেস খেলুক বা প্রচুর 'গুল' ওড়াক বা যাই করুক, যখন ইতিহাসের চাটনি দিয়ে গল্প বলতে বসে, তখন যে ওর জুড়ি নেই, সে কথা সবারই জানা।

"এ কথা তোমরা সবাই জানো," দিলীপ আরম্ভ করলো, "যে পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে চায়না টাউন নেই। সানফ্রান্সিস্‌কো, ইলিনয়স্‌, লিমা, কেপটাউন, ড্রেসডেন, লণ্ডন, মার্সেইল, নিউইয়র্ক, কলকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, জাকার্তা সব জায়গায় এরা একটি করে নিজেদের অঞ্চল

গড়ে তোলে। এই রঞ্জনকে জিজ্ঞেস করো, সে কি কোনো দিন জানতো যে কলকাতায় এমন পাড়া আছে যেখানে এলে মনে হয় হ্যাংকাও কি ক্যান্টনে বেড়াতে এসেছি? কিন্তু কোনো দিন কি কেউ ভেবে দেখেছো এই উপনিবেশ-গুলো গড়ে তোলার পেছনে আছে অনেকখানি রোমাঞ্চকর ইতিহাস? তোমাদের তো ধারণা, কলকাতায় যা কিছু দেখছো সবাই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু জব চার্ণক যখন ১৬৯০'র ২৪-এ আগস্ট সুতোনুটির ঘাটে এসে নামলো তখন কি ছিলো এই চায়না টাউন?"

দিলীপ যখন পুরোনো কলকাতার গল্প করতে বসে তখন সে আরেক দিলীপ, যার জীবনের একটি সময় কেটেছে শুধু বইয়ের মধ্যে ডুবে থেকে।—কিন্তু সেই ডুবে থাকাও তাকে ভোলাতে পারেনি যে তার ইংরেজ মা তার ছেলেবেলায় তাকে ছেড়ে, তার বাবাকে ছেড়ে, চলে গেছে আসামের টী-প্লান্টারের সঙ্গে। সেই ছেলেবেলা থেকে কি একটা যেন খুঁজে পাওয়ার দুর্বোধ্য অসহনীয় আকাঙ্ক্ষার বেদনা তার সব কিছু পাওয়ার সামর্থ্য নিংড়ে নিঃশেষ করে অপচয় করে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে একটি পলাতক মনো-বৃত্তির মধ্যে। সেসব ভুলে গিয়ে সবুজ-চা খেতে খেতে সেদিন তার মুখে গল্প শুনলাম বাঙালী, চীন, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, উত্তর-ভারতীয়, পাঞ্জাবী ও পাকিস্তানীর ঘরোয়া জনতায়।

"তখন তো শুধু জলা মাঠ, এখানে-সেখানে দু-চারটে গোল-পাতায় ছাওয়া মাটির ঘর। বেণ্টিক স্ট্রীট তখন একটি দীর্ঘ শীর্ণ পথের অংশ যা দক্ষিণে কালিঘাট থেকে বহুদূর উত্তরে ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে চলে গেছে। সে অংশের তখনকার নাম কসাইটোলা। পুরোনো কলকাতার ম্যাপে দেখা যায়, সে পথের পুবে শুধু জঙ্গল, যেখানে আজ আমরা বসে গল্প করছি। তখন ইংরেজরা কলকাতায় নতুন, চীনেও প্রায় অপরিচিত—যদিও কলকাতায় আসবার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, মিং রাজবংশের রাজত্বের শেষভাগে, ১৬৩৭ খৃস্টাব্দে প্রথম ইংরেজ জাহাজ চীন গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতা যখন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠলো

তখন একজন দুজন করে চীনে দেখা যেতে লাগলো কলকাতায়। ওরা সাধারণত আসতো ম্যাকাও থেকে, যেটা পর্তুগীজদের দখলে চলে গিয়েছিলো পলাশী যুদ্ধের দুশো বছর আগে, ১৫৫৭ সালে। বাংলা দেশে যখন পলাশীর যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে তখন অবশ্যি চীনাদের নাম-গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে পুরোনো কাগজপত্রে। সায়েব-পাড়ার নীলাম থেকে বাঙালী জমিদার চীনে ছবি কিনে নিয়ে যাচ্ছে প্রচুর দাম দিয়ে, তারও খোঁজ পাচ্ছি। সে সময় ইংরেজরা অন্যান্য ইউরোপীয়দের মতো উঠে-পড়ে লেগেছে চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্যে। আময়, নিংপো, তিংহাই বন্দরে ইংরেজ জাহাজ আনাগোনা সুরু করেছে। তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে পিকিং এর মাঞ্চু-সম্রাট। পলাশীর যুদ্ধের বছর দুয়েক পরে, কোয়াংতুং আর কোয়াংসির রাজপ্রতিনিধি লি শিহ্-যাও চীন সম্রাটের কাছে লিখতে বাধ্য হোলো :—The foreigners who come to China from afar do not know the Chinese language. They have to conduct their business transactions in Canton with the aid of Chinese merchants who know foreign languages···It is my most humble opinion that when uncultured barbarians who live far beyond the borders of China, come to our country to trade, they should establish no contact with the population, except for business···"

তখন থেকে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য শুধু ক্যান্টনেই সীমাবদ্ধ করা হোলো। যে সব চীনা ব্যবসায়ী ইউরোপীয়দের ভাষা জানতো বা তাদের চীনে ভাষা শেখাতে উৎসুক হোতো, তাদের সঙ্গে বেশী মাথামাখি করতো, তারা সবাই মাঞ্চু সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়লো। তাদেরই একজন একদিন দেশ ছেড়ে ক্যান্টন থেকে চলে এলো কলকাতায়। তার নাম তং আৎ-ছু।

পলাশীর যুদ্ধের পর ষোলো-সতেরো বছর কেটে গেছে। তখন কলকাতায়

গভর্নর জেনারেল অফ ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল—মিস্টার ওয়ারেন হেস্টিংস।

কলকাতার ইংরেজেরা তখন চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে খুব উৎসুক। আৎ-ছু'র সঙ্গে কলকাতার অনেক বড়ো বড়ো সায়েব-সুবোর সঙ্গে জানাশোনা হয়ে গেল। শোনা যায়, ক্যান্টনের বিখ্যাত ইংরেজ সওদাগর জেমস্ ফ্লিন্টের সঙ্গে আৎ-ছু'র জানাশোনা ছিলো। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, এ সব জনশ্রুতি আৎ-ছু'র পক্ষে কলকাতার অভিজাত ইংরেজ সমাজে পৃষ্ঠপোষক যোগাড় করে নেওয়ার খুব সাহায্য করলো। কে যেন ওয়ারেন হেস্টিংসকে বলেছিলো যে ক্যান্টনের ইংরেজদের সঙ্গে আৎ-ছু'র সদ্ভাবই তার দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হওয়ার অন্যতম কারণ।

সুতরাং, কিছুদিন পরে আৎ-ছু যখন সাড়ে ছ'শো বিঘে জমির পাট্টা চাইলো, হেস্টিংস দ্বিধাবোধ করলো না। বজবজ থেকে মাইল ছয়েক পশ্চিমে, গঙ্গার ধারে উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোডের পাশে সেই জমির উপর ভারতের প্রথম চিনির কল বসালো সেই অজ্ঞাতকুলশীল চীনে সওদাগর আৎ-ছু। সেই সাড়ে ছ'শো বিঘে জমির উপর গড়ে উঠলো ভারতের প্রথম চৈনিক উপনিবেশ। তার প্রতিষ্ঠাতা তং আৎ-ছু'র নামে সে জায়গার নাম হোলো আছিপুর।

তখনো কলকাতায় চীনেপাড়া নেই। তখনকার ম্যাপে কসাইটোলায় দেখানো হচ্ছে মোটে তিন-চারখানা বাড়ির নিশানা। সে-পথের পূবের জঙ্গল তখনো সাফ হয়নি, বর্ষার দিনে এত কাদা যে যাওয়া যায় না।

আজ সন্ধ্যায় আমরা সবাই এখানে বসে চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছি।

সেদিন সন্ধ্যায়, তং আৎ-ছু যখন দিনের কাজ সেরে গঙ্গার ধারে বসে তার পাইপে টান দিচ্ছে তখন এখানে ঘনঘোর অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে।

আৎ-ছু'র চিনির কল, যাকে তখনকার দিনে বলা হোতো sugar manufactory, প্রথম দিকটা বেশ চলতে লাগলো। তখন ম্যাকাও থেকে

যেসব পর্তুগীজ আর ওলন্দাজ জাহাজ আসতো কলকাতায় তাদের ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে চীনে শ্রমিক এদেশে আনানোর ব্যবস্থা করেছিলো আৎ-ছু। চীনের জনসংখ্যা তখন অভূতপুর্ব ভাবে বাড়ছে। দক্ষিণ-চীনে ইউরোপীয় বণিকদের আফিং রপ্তানি স্বরু হয়ে গেছে। চীনের আর্থিক অবনতি স্বরু হয়েছে আস্তে আস্তে। স্বতরাং সপরিবারে বিদেশে গিয়ে বসবাস করতে রাজী হওয়া চীনে শ্রমিকের অভাব হোলো না। দলে দলে অনেক লোক এলো কোয়াংতুং, ফুকিয়েন আর চেকিয়াং প্রদেশ থেকে।

আর এলো ফেং স্বং তাও।

ফেং স্বং-তাও ছিলো আময় শহরের একজন বিখ্যাত গুণ্ডার সর্দার। ইংরেজদের কাছ থেকে আফিং কিনে সেগুলো সে চালান দিতো কোয়েইচাও, হোনান, কিয়াংসি এসব অঞ্চলে। ফুকিয়েন প্রদেশের উপকূলে যে সব ডাকাতি হোতো তাতেও নাকি হাত ছিলো ফেং স্বং-তাও'এর। কোয়াংতুংএর প্রাদেশিক সরকার তাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টায় ছিলো অনেক দিন থেকে, কিন্তু কোনো উপলক্ষ পায় নি। একদিন চি তু-শিউ নামে কোয়াংতুংএর রাজপ্রতিনিধির অনুগ্রহভাজন এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী স্বং-তাও'এর এলাকায় ছোরার ঘায়ে নিহত হওয়ার পর স্ব-তাওকে গ্রেপ্তার করতে গেল আময়ের পুলিশ। কিন্তু তার আগেই খবর পেয়ে আময় থেকে সিঙ্গাপুর রেঙ্গুন হয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলো ফেং স্বং-তাও।

তার মতন একজন লোকের প্রয়োজন ছিলো তং আৎ-ছু'র। সে তাকে আছিপুরে ডেকে নিয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যে ফেং স্বং-তাও ডান হাত হয়ে উঠলো আৎ-ছু'র।

হয়তো একদিন আছিপুর বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল হয়ে উঠতো। কিন্তু সে আর হোলো না। গোলমাল বাধলো আৎ-ছু' আর ফেং স্বং-তাও'এর মধ্যে।

এমন শত্রুতা বাধলো যে, আছিপুরের উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা ব্যাহত হোলো।

গোলমালের সূত্রপাত, চিরকাল যা হয়, একটি মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটির নাম জু-শী, তং আং-ছু'র পালিতা কন্যা।

জু-শী'কে ভীষণ ভালোবাসতো তং আং-ছু। ফেং সুং-তাও এসে একদিন তং আং-ছু'কে কো-টাও করে বললো, জু-শী'কে বিয়ে করতে চাই।

খুব দাম্ভিক লোক ছিলো আং-ছু'। ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো খুব মোলায়েম গলায়, "জু-শী তোমায় বিয়ে করতে যাবে কেন?"

"কেন করবে না?" সুং-তাও বললো।

"দেখ সুং-তাও," তং আং-ছু বললো, "তুমি খুব কাজের লোক, আমি তোমায় পছন্দ করি, আমি চাই যে তুমি বিয়ে-থা করো, তোমার বংশ বৃদ্ধি হোক, ফেং পরিবারের নবাগত সন্তানেরা তোমার পূর্বপুরুষদের গৌরব বৃদ্ধি করুক। বাপ-পিতামহের দেহ-নিষ্ক্রান্ত আত্মার সন্তুষ্টিবিধান করা যে কোনো তং-য়েন্'এর কর্তব্য। কিন্তু ভাই সুং-তাও, তুমি আমার বন্ধু, তোমায় বন্ধুর মতো পরামর্শ দিতে চাই, আর যাকে খুশি বিয়ে করো, কিন্তু জু-শী'কে নয়।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো সুং-তাও।

"কারণ জু-শী একটি শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে," উত্তর দিলো আং-ছু, "জু-শী নিজেও কবিতা লিখতে পারে। তার পিতামহ ছিলো একজন য়া-মেন্ রাজপুরুষ। আর তোমার বাবা ছিলো কসাই, তুমি আফিং বেচতে আময়ে, তোমার সঙ্গে জু-শী'র বিয়ে দিলে ওদের আত্মীয়-স্বজন আর আমার আত্মীয়-স্বজন যে 'মুখ' হারাবে।"

সুং-তাও এর ধমনীতে আময়ের গুণ্ডা-সর্দারের রক্ত টগবগ করে উঠলো। সে বললে, "ও সব আমি বুঝি না। জু-শী'কে ডেকে জিজ্ঞেস করো। সে আমায় বিয়ে করতে চায়।"

আং-ছু' হেসে বললো, "বেশ তো, এস আমরা খেতে বসি। বেশ বেলা হয়ে গেছে। জু-শীকে সেখানে ডেকে জিজ্ঞেস করছি।"

ভাপে-সেদ্ধ কচ্ছপের স্যুপ ও বাঁশের কোঁড় আর খুব যত্নে রান্না করা সুন-ফং-গাই খেতে খেতে আং-ছু জু-শীকে জিজ্ঞেস করলো, "আমার বন্ধু সুং-তাও

তোমার পাণিগ্রহণ করে সম্মানিত হতে চায়। তোমার কি মনে হয় না এরকম একটি অসম্ভব প্রস্তাব করে স্থং-তাও তার সাময়িক মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয় দিচ্ছে ?"

জু-শী মাথা নিচু করে বসে রইলো। আং-ছু' তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো। জু-শী মাথা নাড়লো আস্তে আস্তে। "কী" ? লাফিয়ে উঠলো আং ছু'।

স্থং-তাও হেসে বললো, "আজ অনেক দিন ধরে নদীর পাড়ে সন্ধ্যের পর আমাদের দেখা হচ্ছে, তাই না ?"

জু-শী মাথা নাড়লো।

স্থং তাও জিজ্ঞেস করলো, "মাঝে মাঝে অনেক দিন আমরা নৌকো করে গঙ্গায় বেড়িয়েছি, তাই না ?"

জু-শী মাথা নাড়লো।

"আমি তোমায় বলিনি যে আং-ছু' রাগ করবে ?" স্থং-তাও আবার জিজ্ঞেস করলো।

জু-শী মাথা নাড়লো।

স্থং-তাও বলে চললো, "আর তুমি আমায় বলোনি যে যতক্ষণ আকাশে চাঁদ আছে আর আমার বুকে ভালোবাসা আছে ততক্ষণ তুমি আং-ছু'র রাগকে ভয় করো না ?"

জু-শী মাথা নাড়লো।

স্থং-তাও সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমি তোমায় জিজ্ঞেস করিনি, তুমি আং-ছু'র অমতে আমার বৌ হয়ে সুখী হবে কি না ?"

জু-শী মাথা নাড়লো।

স্থং-তাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, "আর তখন তুমি আমায় বলেছো কি না যে তুমি খুব ভালো রাঁধতে পারো, আর আমি টাকা রোজগার করতে জানি, সুতরাং আমরা ঘর বেঁধে খুব সুখী হবো।"

জু-শী লাল হোলো একটু, লাল হয়ে মাথা নাড়লো

আং-ছু তখন বললে, "ওই যথেষ্ট, জু-শী এবার বাড়ির ভেতর যাও।"

জু-শী চলে যেতে আং-ছু আস্তে আস্তে বললো, "সুং-তাও, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। তোমায় কষ্ট দিতে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ বিয়ে হবে না।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো সুং-তাও।

"আমি কাউকে কৈফিয়ত দিই না সুং-তাও," আং-ছু উত্তর দিলো।

সুং-তাও ঠোঁট কামড়ালো।

আং-ছু বলে চললো, "আমার এখানে থেকে আর মনে কষ্ট পাওয়ার কোনো দরকার নেই সুং-তাও। তুমি আজই আছিপুর ছাড়ো। চলে যাও কলকাতায়। ইংরেজ এ দেশের রাজা হয়েছে। ভবিষ্যতে ওরা সারা ভারতেরই রাজা হবে। কলকাতা শহর আরো বড়ো হবে। ওই বর্বরদের মধ্যেই তোমার প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর হবে। আমরা সভ্যজাত। আছিপুরে তোমার আর যত্ন হবে না বন্ধু।"

"যদি না যাই," সুং-তাও আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

আং-ছু আরো আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "তা'হলে হয়তো ইংরেজ সরকার খবর পাবে যে-সব আফিং কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া হয় ক্যাণ্টনে চালান করে দেওয়ার জন্যে, সেগুলোর বেশির ভাগ ফেং সুং-তাও নামে একটি লোক চুরি করে মুর্শিদাবাদ, পাটনা, লক্ষ্ণৌএ চালান দেয় আর কিছু গুম হয়ে যায় কলকাতা শহরের মধ্যেই। তারা হয়তো আরো জানবে যে ওয়া-তাওএর কাছে মে-ফ্লাওয়ার নামে যে ইংরেজ জাহাজটি লুঠ হয়েছিলো তার মালপত্তর সওদা সব তোমারই হাত দিয়ে আময় থেকে ফু-চাও শহরে চালান হয়েছিলো। একথাও জানতে পারে যে আময়ের শাসনকর্তা তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাগল হয়ে আছে। তোমায় হয়তো ক্যাণ্টনের এক ইংরেজ জাহাজে তুলে দিয়ে তারপর আময়ে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে। আমাদের দেশে অপরাধীদের খুব কষ্ট দিয়ে মারে সুং-তাও। তোমার খুব কষ্ট হলে সে আমার সইবে না বন্ধু— !"

সুং-তাও আস্তে আস্তে উঠে গেল সেখান থেকে। সেদিন রাত্রে সে চলে গেল আছিপুর থেকে। তার পরদিন সকালে জু-শী'কেও দেখা গেল না।

এ ব্যাপারে আং-ছু'র মনে খুব লেগেছিলো। কিন্তু সে লোক ছিলো ভালো। সুং-তাওকে যা সব শাসিয়েছিলো, সে সব করলো না। হয়তো ভেবেছিলো, আমি চাইনি যে ওদের বিয়ে হোক, কিন্তু ওরা বিয়ে যখন করলোই, তখন সুখী হোক ওরা।

আং-ছু'র বয়স হয়ে যাচ্ছিলো। শরীরটা ভাঙতে সুরু করলো তখন থেকে। কিন্তু সুং-তাও'এর মনে শান্তি ছিলো না। তার সব সময় ভয়, কখন আং-ছু' গিয়ে ইংরেজদের সব কথা বলে দেয়, আর ইংরেজরা তাকে বা'র করে দেয় কলকাতা থেকে।

লোকের মুখে শুনতে পেলো আং-ছু প্রায়ই কলকাতায় আসে, সায়েব-সুবোদের সঙ্গে দেখা করে ছু-একদিন কাটিয়ে আছিপুর ফিরে যায়।

তার মনে হোলো আং-ছু তাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে। ভাবতে ভাবতে আং-ছু'র সম্বন্ধে একটা তীব্র ভয় আর ঘৃণা জন্মালো সুং-তা'ওএর মনে। সেও শত্রুতা করতে সুরু করলো।

জু-শী'কে নিয়ে সে কিছুদিন ছিলো মুর্গীহাটায়। তারপর দেখলো কসাইটোলার পেছন দিকের জায়গাটা খুব সুবিধের। ওদিকে খানিকটা জঙ্গল সাফ করে ঘর বাঁধতে পারলে বেশ নিরিবিলি থাকা যায়, অন্য জাতের লোকজনেরা কেউ ঘাঁটাবে না। তা'ছাড়া সে আফিং নিয়ে যে কারবার করছিলো, তার জন্যে একটু নিরিবিলি থাকতে পারলেই সুবিধে।

কলকাতায় তখন চার জন পাঁচ জন করে চীনে দেখা যাচ্ছে, মুর্গীহাটায় দোকান করেছে ছু'-একজন।

কয়েকটি চীনে পরিবারকে নিয়ে কসাইটোলার পেছন দিকে জঙ্গল খানিকটা সাফ করে বসবাস করতে লাগলো সুং-তাও। তারপর লাগলো আং-ছু'র পেছনে।

সে সময় কলকাতায় প্রায়ই জাহাজ আসতো ম্যাকাও থেকে। সে-সব

জাহাজের খালাসী ছিলো বেশির ভাগ চীনেম্যান। জাহাজের সায়েবরা খুব দুর্ব্যবহার করতো তা'দের সঙ্গে। জাহাজ এসে গঙ্গার বুকে নোঙর করলে অনেকেই জাহাজ থেকে পালিয়ে কলকাতায় থেকে যেতো।

তাদের থাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতো সুং-তাও, তারপর তাদের কাজে লাগিয়ে দিতো। মুচির কাজ, ছুতোরের কাজ, দোকানদারী, সায়েবদের বাবুর্চি কিংবা খানসামার কাজ, যা'র যাতে সুবিধে। কেউ বা ভিড়ে গেল সুং-তাও'এর দলে, কেউ তার আফিংএর চোরা ব্যবসায়, কেউ তার অধীনে চীনের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার খবরদারী করবাব কাজে—কারণ চীনেরা সরকারী আইন-শৃঙ্খলার ধার ধারতো না, নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে থাকতো, এবং অবস্থা গতিকে তাদের নেতৃত্ব এসে পড়লো ফেং সুং-তাও'এর উপর।

রাজা থাকলে রাজার প্রজা চাই। কলকাতার যে কয়জন চীনে, সে পর্যাপ্ত নয়। সুং-তাও নজর দিলো আছিপুরের দিকে।

আছিপুরের অবস্থা তখন ভালো নয়। চিনির কল ভালো চলছে না। মজুরদের আয় খুব কম। অথচ কলকাতায় প্রচুর পয়সা। কলকাতার বাতাসে পয়সা উড়ছে। ধরতে জানলে এবং ধরতে পারলেই হোলো।

সুং-তাও'এর লোকজন আছিপুরের চীনেদের গিয়ে বলতে লাগলো যে, তারা যদি কলকাতায় এসে থাকতে চায় তা'হলে সুং-তাও তাদের সব রকম সুবিধে করে দেবে। ম্যাকাও থেকে অনেকে এসে কলকাতায় বসবাস করছে। তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে সুখেই থাকবে আছিপুরের চীনেরা।

তখন আস্তে আস্তে দুজন চারজন করে চীনেরা এসে কলকাতায় জড়ো হতে সুরু করলো। আর কলকাতা থেকে কোনো চীনে গিয়ে আছিপুরে আং-ছু'র কলে কাজ করতে রাজি হোলো না।

আং-ছু ভাবনায় পড়লো। প্রথমে নিজে চেষ্টা করলো এসব ঠেকানো। যখন পারলো না তখন কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করলো যে ম্যাকাও-এর জাহাজ-পালানো চীনেরা তার শ্রমিকদের ফুসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আছিপুরের চিনির কল বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতার সায়েবদের অসুবিধে। কারণ, তখনো জাভা সুমাত্রা থেকে ব্যাপকভাবে চিনির আমদানি আরম্ভ হয়নি। ইংরেজ সরকার আৎ-ছু'কে আশ্বাস দিলো যে, তারা তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

১৭৮১র ৫ই নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে একটি বিশেষ সরকারী বিজ্ঞপ্তি বেরুলো। তাতে জানানো হোলো যে, গভর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প করেছে "to grant every encouragement to the colony of Chinese under the direction of At Chew…and to afford him every support and assistance in detecting such persons..."

কিন্তু কথা দিয়েও ইংরেজ সরকার কিছু করলো না। কলকাতার কাউন্সিলে তখন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের গোলমাল চলছে। এসব নিয়ে সরকারী মহল মশগুল। আৎ-ছু'র তুচ্ছ ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাদের নেই। ইংরেজ এলাকায় একজন চীনে ব্যবসায়ীর সাফল্যও অনেক ইংরেজ মার্চেণ্ট-হাউসের কাম্য নয়। জাভা সুমাত্রা থেকে চিনি আমদানি করে মুনাফা করবার সম্ভাবনা তখন অনেক ইংরেজের মাথায় ঘুরছে।

১৭৮২ খৃস্টাব্দে সুং-তাও আর জু-শী'র একটি ফুটফুটে খোকা হোলো। সুং-তাও'এর বাড়িতে বিরাট নেমন্তন্ন দেওয়া হোলো। নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলো আৎ-ছু'ও। জু-শী'র রান্নার প্রশংসা করে গেল সবাই।

সেদিন কেউ ভাবতে পারে নি যে, সুদূর ভবিষ্যতে সুং-তাও'এর এই ছেলেটিই হবে দক্ষিণ চীন-সমুদ্রের বিখ্যাত জলদস্যু ফেং পাও-হুং, ১৮৪০-এর ওপিয়াম-ওয়ার'এর সময় যে হঠাৎ দেশপ্রেমিক হয়ে উঠে একটি বৃটিশ জাহাজ আক্রমণ করবার সময় কামানের গোলায় প্রাণ দেবে।

তার পরের বছর আৎ-ছু খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন তার চিনির কলের পড়ন্ত অবস্থা। তার শরীর আর মন দুই-ই ভেঙে গেছে।

জু-শী গেল আং-ছু'র শুশ্রূষা করতে। কিন্তু আং-ছু আর বাঁচলো না। মারা গেল সেই বছরই।

সুং-তাও খুব দুঃখিত হলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সে কি ও কে, ইংরেজ সরকারকে জানানোর আর কেউ নেই।

এবার বাকী জীবনটা সে আর জু-শী নিশ্চিন্ত হয়ে কাটাতে পারবে। কিন্তু সেটা হয়ে উঠলো না। আং-ছু'র প্রতিহিংসা যে এত ভীষণ কে জানতো?

আং-ছু'র মারা যাওয়ার কয়েকদিন পরে নেসফীল্ড নামে এক ইংরেজ সলিসিটারের চিঠি এলো সুং তাও'এর কাছে। তার মর্মার্থ এই :—আং-ছু একটি বড়ো তামার বাক্স রেখে গেছে, যার তালা সীল করা। সেটির বর্তমান মালিক জু-শী। কিন্তু একটি শর্ত এই যে সুং-তাও যদ্দিন বেঁচে থাকবে তদ্দিন সে বাক্স জু-শীকে দেওয়া হবে না।...

সুং-তাও খুব উৎসুক হয়ে উঠলো সেই বাক্সে কি আছে জানবার জন্যে। জু-শী কিছু বলতে পারলো না। কিছুদিন পর চীনে মহলে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে সেই বাক্সে আং-ছু এক হাজার গিনি রেখে গেছে জু-শী'র জন্যে। সে কথা সুং-তাও'এর কানেও এলো।

জু-শী বললো, তার দরকার নেই এ টাকা। সুং-তাও'এর আগে মরতে পারলেই সে খুশী হবে! কিন্তু তখন সুং-তাও'এর কানের কাছে শয়তান ফিশ-ফিশ করতে সুরু করেছে।

জু-শী যদি খাবারের সঙ্গে বিষ মেশায়! জু-শী যদি রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে গলায় ক্ষুর চালিয়ে দেয়! হাজার হোক জু-শী'র বয়েস একুশ, তা'র বয়েস প্রায় চল্লিশ!

তখন মনে পড়লো যে, হ্যাঁ, তাই তো! য়াং'দের বাড়ির ছেলে য়ু-লিনের সঙ্গে তো জু-শীর খুব ভাব। আজকাল সে প্রায়ই আসে এ বাড়িতে।

রাত্তিরে আর ঘুম হয় না সুং-তাও'র। খাবার মুখে রোচে না। আস্তে আস্তে দেখা গেল সুং-তাও আর রাত্তিরে জু-শী'র সঙ্গে এক ঘরে শোয় না, জু-শীর রান্না খাবার মুখে তোলে না। অত্যন্ত রুক্ষ তার ব্যবহার জু-শী'র সঙ্গে।

তারপর জানুয়ারী মাসের এক কুয়াশা-ঘন সকালবেলা দেখা গেল একলা ঘরে জু-শী' মরে পড়ে রয়েছে। সুং-তাও সবাইকে বললে জু-শী হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গেছে। কিন্তু লোকে বললে অন্য কথা।

তার কিছুদিন পরে আং-ছু'র এক আত্মীয় একটি সীল-করা চিঠি এনে দিলো সুং-তাও' কে। বললো, আং-ছু'র চিঠি, সে মারা যাওয়ার আগে তাকে ডেকে চিঠিখানি রেখে দিতে বলেছিলো আর বলে গিয়েছিলো জু-শী যখন মারা যাবে তখন যেন এ চিঠি দেওয়া হয় সুং-তাওকে।

সুং-তাও নিজে পড়তে পারতো না। আরেকজনকে দিয়ে পড়িয়ে নিলো। শুনলো আং-ছু লিখে গেছে :

ভাই সুং-তাও, আমি জানি যে তুমি এমন একজন লোক যার ভীষণ প্রাণের ভয়। আর এ-ও তুমি চাও না যে তোমার বৌ জু-শী ধনবতী বিধবা হয়ে বেঁচে থাকুক। যখন তুমি এ-চিঠি পাবে তখন আমার কবরের মধ্যে আমি হয়তো কঙ্কাল হয়ে গেছি, কিন্তু তোমার বৌয়ের কবরের মাটি তখনো নরম ও কাঁচা, তখনো হয় তো ঘাস গজায়নি তার কবরের উপর। তোমায় শুধু এ খবরটা দিতে চাই যে, নেসফীল্ডের কাছে যে তামার বাক্সটি আছে, তার মধ্যে রাখা যে এক হাজার গিনির গুজব তোমার কানে যাবে বলে আমি আশা করছি, (কারণ গুজবটা রটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আমিই করে যাচ্ছি) সেটা সত্যি নয়। এক হাজার কেন, একটি গিনিও তাতে নেই। বাক্সটি ফাঁকা। আর এ-ও বলতে চাই যে জু-শী খুব ভালো মেয়ে। তোমায় খুব ভালো-বাসতো। আশা করি দেবতারা তোমায় ক্ষমা করবেন এবং তোমার মনে শান্তি দেবেন।—আং-ছু।

বছর তিন-চার পর ফেং সুং-তাও যখন মারা গেল তখন তার মন এবং শরীর একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ছেলে ফেং পাও-হুং'কে নিয়ে গেল এক দূর আত্মীয়।

তং-আং-ছু'র চিনির কলও অচল হয়ে গেল। ১৮০৫ এর ১৫ই নভেম্বর আং-ছু'র জায়গা জমি চিনির কল সব নিলামে চড়ানো হোলো।

আছিপুরের চীনেরা সব আস্তে আস্তে কলকাতায় সরে এলো। বছর কুড়ি পর দেখা গেল আর একজনও নেই সেখানে। সব পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতার এই কসাইটোলা আর মুর্গীহাটায় এসে আস্তানা গেড়েছে। কিছু চলে গেছে ট্যাংরায়।—

আজ আর আছিপুরে চীনে উপনিবেশের কোনো চিহ্নই নেই।

শুধু গঙ্গার পাড়ে বিস্মৃত অযত্নে পড়ে আছে তং আৎ-ছু'র সমাধি। বিশেষ কেউ জানে না, খোঁজও নেয় না ওটা কার। লাল সিমেণ্ট-বাঁধানো সমাধির অবতল দেওয়ালে একটি মার্বেল ফলকে চীনে অক্ষরে যা লেখা আছে সে কেউ বুঝতেও পারে না।

থামলো দিলীপ মুখার্জী। আমরা সবাই চুপচাপ শুনছিলাম। আমাদের সবার মন যেন উদাস হয়ে ভেসে গেল কলকাতার বাইরে এক নদীর পাড়ে, যেখানে বিস্তীর্ণ শ্যামল পটভূমিকায় এক নির্জন সমাধি। খুব নিচু, ঘোড়ার খুরের মতো অর্ধবৃত্ত। লাল সিমেণ্টে বাঁধানো। দেওয়ালের গায়ে একটি মার্বেলের ফলক, চীনে অক্ষরে লেখা আৎ-ছু'র নাম। আর দূর থেকে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক।

প্রায় দু'শো বছর আগে হয়তো সে-জায়গা বাজি-পটকার আওয়াজে, ঝাঁঝর আর কাঁসরের তালে তালে, বাঁশির সুরে, ড্র্যাগন নাচে মুখর হয়ে উঠতো চীনে নববর্ষের দিন।

আজ সেই গঙ্গার তীর নিঃসাড়, নিস্তব্ধ।······

* তিন *

তার পরদিন রোববার। অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হোলো সারাটা দিন। বড়ো বেশী নিস্তব্ধ মনে হোলো শনিবার সন্ধ্যার কোলাহলের পর।

সকালের দিকে মনেই ছিলো না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কি করবো ভাবছি, হঠাৎ রেবার কথা মনে পড়লো। রেবা—রেবা চৌধুরী, সুবিমল ভট্টাচার্যির বৌয়ের মামাতো বোন, যার সঙ্গে কাল সিনেমা দেখার কথা ছিলো।

তাই তো! অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে। সকালেই যাওয়া উচিত ছিলো! সিনেমার হলে যদি দেখা যায়, বই আরম্ভ হবার পরও প্রত্যাশিত ব্যক্তিটি এলো না, খালি রইলো তার চেয়ার—তা'হলে একটু দুর্ভাবনা হয় তার জন্যে, পথে কোথাও গাড়িচাপা পড়লো, না কি ঠ্যাং ভাঙলো তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময়! কিন্তু যদি দেখা যায় তার সীটে এসে বসলো আরেক জন অপরিচিত কেউ, যে আপনার অনুসন্ধানের উত্তরে জানালো যে টিকিটখানি সে কাউন্টারের সামনেই আরেকজনের কাছ থেকে কিনেছে, যার বর্ণনা মিলে যায় আপনার প্রত্যাশিত ব্যক্তিটির সঙ্গে, তখন তার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করবার কোনো কারণ থাকে না। আর সিনেমা দেখার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়।

সুতরাং সুবিমল, তার বৌ আর রেবা যে আমার অনুপস্থিতিতে খুব ফুর্তি করে সিনেমা দেখেছে, সে কথা মনে করার কোনো কারণ নেই।

তাই আমার যাওয়া উচিত ছিলো সকাল বেলা। গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত ছিলো যে, আমার বন্ধু দিলীপ মুখার্জীর অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই গোলমালটা হয়েছে।

সুবিমলের বাড়ি ছুটলাম তক্ষুণি। গিয়ে দেখি, ওরা সাজগোজ করে বেরোচ্ছে।

সুবিমল বললো, "তুমি আসবে না, আগে বললেই হোতো। অন্ত কাউকে ডেকে নিয়ে যেতাম। টিকিটটা বেচে দেওয়ার দরকার ছিলো না।"

দিলীপের কথা বললাম তাকে। বিশদ ভাবে বর্ণনা করলাম, সে কেমন করে আমার কাছ থেকে টিকিটটা নিয়ে আমি কিছু বুঝে উঠবার আগেই সেটি আরেকজনকে বেচে দিয়ে আমায় ট্যাক্সিতে তুলে একেবারে চায়না টাউনে নিয়ে গেল!

সুবিমল কোনো উত্তর দিলো না। মুখ দেখে বেশ বোঝা গেল যে, সে বিশ্বাস করলো না একটি কথাও। সে দিলীপকে চেনে না। সুতরাং তার বিশ্বাস করবার কোনো কারণও নেই।

সুবিমলের বৌ মল্লিকা শুকনো হাসি হেসে বললো, "তা'হলে কাল সন্ধ্যা আপনার ভালোই কেটেছে বলুন? চীনে মেয়ে, বার্মিজ মেয়ে, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, এদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গে না এসে নিশ্চয়ই ভালো কাজ করেছেন। আমরা আটপৌরে সেকেলে মানুষ, আমাদের সঙ্গে চুপচাপ বসে সিনেমা দেখে আর বাড়ি ফেরার মুখে কোনো রেস্তরাঁয় একটুখানি চা খেয়ে কি আপনি আর সেই বৈচিত্র্য পেতেন যা কাল চায়না টাউনে পেয়েছেন? আপনি অতো কুণ্ঠিত হবেন না রঞ্জন বাবু, আমরা কিছু মনে করিনি।"

বুঝলাম, এ অভিমানের কথা।

"না, না, বৈচিত্র্য কিছুই নয়, আমার একটুও ভালো লাগেনি," আমি বলে উঠলাম, "কিন্তু দিলীপটার পাল্লায় পড়ে—"

"ঠিক আছে রঞ্জন," সুবিমল বললো, "আমরা কিছু মনে করিনি। তবে টিকিটটা হলের দরজায় এসে বেচে দেওয়ার কষ্টটুকু না করলেই পারতে।"

রেবা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। সে হঠাৎ তাড়া দিয়ে বললো, "চলো, সুবিমল দা,' বড্ডো দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আমি বললাম, "যদি তোমাদের অন্য কোনো বিশেষ প্রোগ্রাম না থাকে, তা হলে চলো সবাই মিলে একটি সিনেমা দেখে আসি কোথাও। আমি তোমাদের নিয়ে সিনেমায় যাবো বলেই এসেছি।"

সুবিমল আর মল্লিকা কোনো উত্তর দিলো না। রেবা উত্তর দিলো, "আমরা সিনেমা দেখতেই যাচ্ছি। আমি তো টিকিট করে এনেছি সকাল বেলা। তুমি আসবে তা তো জানতাম না, জানলে তোমার জন্যেও একটি করে আনতাম।"

সুবিমল আর মল্লিকা একটু হাসলো।

ওরা চলে গেল ওদের গন্তব্য সিনেমা-হলের দিকে।

আমি একা-একা চলে এলাম চৌরঙ্গিতে, লাইট হাউসে এসে একটি টিকিট কিনে একলা বসে একটি সিনেমা দেখলাম, উপভোগ করলাম না একটুও, তারপর সিনেমা শেষ হতে লাইট হাউস বার্-এ চুপ করে বসে রইলাম এক গ্লাস অরেঞ্জ নিয়ে।

"চায়না টাউনে কাল সন্ধেটা আপনার ভালোই কেটেছে বলুন,"—মল্লিকার কথাগুলো ফিরে এলো আমার মনে।

হাসি পেলো একটুখানি।—ভালো? না, একটুও নয়। রেবার পাশে বসে চুপচাপ সিনেমা দেখা অনেক ভালো। দিলীপের বন্ধুরা সবাই কি রকম যেন! বেশ হৈ হৈ করে গল্পও করলো, কিন্তু তারই মাঝে যেন উঁকি মারছিলো একটু ঈর্ষা, একটু মন-কষাকষি, একটা চাপা বিরোধ এর ওর তার মধ্যে। মনে হয়েছিলো যেন আরো অনেক কিছু ভেতরের ব্যাপার আছে যা আমি জানি না। একটুও ভালো লাগছিলো না ওদের মধ্যে।

মনে পড়লো, দিলীপ বলছিলো তং-আৎ-ছু'র উপনিবেশের গল্প, ফেং-সুং-তাও আর জু-শী'র করুণ রোমান্সের কাহিনী।

গল্প যখন শেষ হলো ঘরখানি তখন নিস্তব্ধ। দূর থেকে পুরোনো গ্রামোফোনে ভেসে আসছে চীনে অপেরার গান। আমার মনে ভাসছিলো গঙ্গার পাড়ে আৎ-ছু'র সমাধির একখানি মনগড়া ছবি।

হঠাৎ কানে এলো ফেং চেং-শিয়াং এর প্রশ্ন, "আজ রাত্তিরে আমরা সবাই কি করছি? আমাদের প্রোগ্রাম কি?"

হেনরি লরেন্স উত্তর দিলো, "ঠিক করো কি করা যায়, আমি যে কোনো কিছুতেই রাজী।"

"কিছু খাবারের অর্ডার দাও", দিলীপ বললো, "আমি এক বোতল হুইস্কি স্ট্যাণ্ড করছি। আর এখানে বসেই গল্পসল্প করা যাবে।"

"না, না, এখানে নয়, বেরোনো যাক," বললো যোগীন্দর সিং।

"কোথায় যাবে ?" জিজ্ঞেস করলো হাসিম সুলেমান।

"অর্ডন্যান্স ক্লাবে যাবে ?"

"না।"

"প্রিন্সেস্‌এ গিয়ে ক্যাবারে দেখবে ?"

"না। না। ও সব নয়। আমরা নিজেরা মিলে হৈ-হৈ করবো।"

দু-একজন অন্য কয়েকটা মতলব দিলো। কেউ রাজী হোলো না।

তখন ওয়ং সুং-চাং বললো, "চলো সবাই মিলে যাই গোল্ডেন স্লিপার'এ।"

"তার আগে কোথাও খেয়ে নিতে হবে," মনে করিয়ে দিলো টিং-লিং।

"এখানেই কোথাও খেয়ে নেবো," বললো জয়প্রকাশ ত্রিবেদী, "আমার চীনে খাবার খুব ভালো লাগে।"

"তা হলে তোমরা আজ রাত্রে বেরোবেই ?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। কেন, তোমার বেরোতে ইচ্ছে করছে না ?" বললো চিয়েন-চাং।

"না, তা নয়। তাহলে আমায় আবার বাড়ি ফিরে পোশাক বদলে আসতে হয়।"

"বেশ তো," উত্তর দিলো ফেং চেং-শিয়াং, "আমরা সবাই আগে খেয়ে নি কোথাও। তারপর আমরা চলে যাই গোল্ডেন স্লিপার'এ, তুমি বাড়ি ফিরে জামা কাপড় বদলে সেখানে এসে যোগ দিও আমাদের সঙ্গে।"

"রঞ্জন কি করবে ?" দিলীপ ফিরে তাকালো আমার দিকে।

"আমি এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরবো," আমি উত্তর দিলাম।

"বাড়ি ফিরবে ? শনিবার সন্ধ্যেবেলা ?" চিয়েন-চাং তার ছোটো ছোটো চোখ দুটো যতোটা সম্ভব আয়ত করে জিজ্ঞেস করলো।

টিং-লিং একটু হেসে বললো, "আমাদের সঙ্গ বোধ হয় ওর ভালো লাগছে না ?"

"না, না, তা' নয়," আমি একটু বিব্রত বোধ করলাল, "আমি তো বাড়িতে ব'লে আসিনি—"

"বলে আসোনি ?" যোগীন্দর অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, "বাড়িতে আবার বলে আসতে হয় না কি ? ইয়াং ম্যান, ব্যাচেলার মানুষ, যতো রাত করে খুশি বাড়ি ফিরবে।"

"না, আমায় বাড়ি ফিরতে হবে।"

"যদি পোশাক বদলাতে বাড়ি ফিরতে চান, আমি বলি কি তার দরকার নেই," সুং-চাং বললো, "আপনার শুধু দরকার একটি টাই। সে না হয় আমি দিচ্ছি—"

"এখনি বাড়ি ফিরবেন কেন ?" মিনি ওয়াং বললো, "আগে খেয়ে নিই কোথাও, তারপর সত্যিই যদি বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে, আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গোল্ডেন স্লিপার'এ বসে না' হয় একটু সকাল করে উঠে পড়বেন।"

"দেখুন, আপনারা সবাই বন্ধু। আমি বাইরের লোক, আজ প্রথম এসেছি—"

"ও—এই ?" বললো ফেং চেং-শিয়াং।—তারপর সবার কী হাসি।

"রঞ্জন কি বলছে শোনো ! সে একজন বাইরের লোক। হাঃ হাঃ হাঃ—"

"মিস্টার ওয়াং, আমি শুধু বলছিলাম—"

"না, না, মিস্টার ওয়াং নয়, আমার বন্ধুরা আমায় সুং-চাং বলে ডাকে।"

"আমার বন্ধুরা আমায় ডাকে চেং-শিয়াং—"

"—আমায় যোগীন্দর।"

"—আমায় হাশিম।"

"আমায় টিং-লিং—"

"আমায় তুমি জয়প্রকাশ বলবে।"

"আমি সবারই কাছে মিনি।"

"এ্যাণ্ড, অফ্ কোর্স, আমি চিয়েন-চাং"—

"আর তোমার নাম, যদি আমরা ভুল না শুনে থাকি, নিশ্চয়ই রঞ্জন। নাও, রঞ্জন ডার্লিং, কি বলতে চাও বলো।"

আমি একটু চুপ করে রইলাম। বেশ ভালো লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে বললাম, "বলছিলাম, একটি টাই দরকার। নীল রঙের উপর একটা কিছু, যা এই স্যুটের সঙ্গে যায়।"

সবাই মনের আনন্দে টেবিল চাপড়ালো।

স্যুং-চাং বললো "এসো আমার সঙ্গে। তোমার পছন্দ মতো বেছে নেবে।"

"ইতিমধ্যে আমরা কি করছি," জিজ্ঞেস করলো জয়প্রকাশ।

"জেনী আর ওর বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করছি। ওদের ফেলে নিশ্চয়ই যাবে না," বললো টিং-লিং।

"ওদের এতক্ষণে এসে পড়া উচিত," দিলীপ ঘড়ির দিকে তাকালো, "পৌনে আটটা এখন।"

"এসো রঞ্জন," স্যুং-চাং আমার দিকে তাকিয়ে বললো। আমি চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু যাওয়া হোলো না। জুতোর শব্দ এলো বাইরে থেকে। সবাই দরজার দিকে ফিরে তাকালো।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো একটি মেয়ে। চৈনিক মুখশ্রী, নিটোল শরীর, পরনে পাশ্চাত্য পোষাক, বড়ো বড়ো লাল কালো গোল গোল ফুটকি-দেওয়া হাল্কা হলদে স্থতির গাউন। তার পেছন পেছন এক জন শ্যামলা রং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে আর একটি বার্মিজ মেয়ে। বার্মিজ মেয়েটির পায়ে ভেলভেটের ফানা, পরনে সোনালী জরির কাজকরা নীল সিল্কের 'লোন্জ্যি', গায়ে শুভ্র অরগাণ্ডির 'এন্জ্যি'। তাদের সঙ্গে আরেকটি ছেলে, তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, হাল্কা বাদামী স্যুটে বেশ টিপটপ দেখতে।

"এই যে এসো, তোমাদের জন্যে বসে আছি," বললো দিলীপ।

"আমরা একটি চমৎকার প্রোগ্রাম ঠিক করে নিয়েছি। সবাই যাচ্ছি গোল্ডেন স্লিপার'এ" বললো ফেং চেং-শিয়াং।

"দাঁড়াও এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই," বললো ওয়াং সুং-চাং, "এ আমাদের নতুন বন্ধু রঞ্জন।...এ আমার বোন জেনী, আর এ জেনীর বন্ধু ম্যাবেল,—আমাদের আরেক জন বন্ধু মওং-জ্যি,—ওর বোন মা-খিন-চ্যি।"

ওদের কিন্তু গম্ভীর মনে হোলো একটুখানি।

জেনী বললো, "তোমরা যদি প্রোগ্রাম করে থাকো, ভালোই। তবে আমাকে বাদ দাও।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো দিলীপ।

"আমার মন ভালো নেই। আমি আজ আর বেরোবো না।"

"কেন? কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো জেনীর বোন মিনি ওয়াং।

"খারাপ খবর আছে।"

"কি?"

"আহ্-কিমকে একলা পেয়ে ওরা খুব মার দিয়েছে।"

ওরা?—আমি ভাবলাম—ওরা কারা? দেখলাম, সবাই হঠাৎ চুপ মেরে গেল। টিং-লিং নির্বিকার, কিন্তু বাঁকা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো ফেং চেং-শিয়াং-এর মুখে।

বললো, "আহ্-কিম কম্যুনিস্ট। ওরা মাঝে মাঝে এক-আধটু মারধোর খায়। আমি কম্যুনিস্ট নই। আমি জীবন উপভোগ করতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি আমার প্রোগ্রাম বাতিল করবো না।"

মিনি ওয়াং তাকালো ফেং চেং-শিয়াং'এর দিকে। একটুখানি বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো সেই চোখে।

"কাম, কাম, এখানে কোনো পলিটিক্স নয়", একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো ওয়াং সুং-চাং, "আহ্-কিম' এর খবর তোমায় কে দিলো, জেনী?"

"দাই-সাও' এর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হোলো। সেই বললে।"

"ম্, খুব বেশী জখম হয়েছে?"

"দাই-সাও বললে মাথা ফেটে গেছে। আর বুকেও লেগেছে খুব। দাই-কো এখানে নেই। তাই দাই-সাও নিজেই ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলো।"

"আহ্-তং এখানে নেই ? কোথায় গেছে ?

"ও গ্যাছে ট্যাংরা। কাল সকালে ফিরবার কথা। আমি ভাবছি আমি নিজেই ট্যাংরায় গিয়ে ওকে খবর দোবো।"

"তুমি একা যাবে ?" দিলীপ বললো, "চলো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।"

ওয়াং চিয়েন-চাং একটু তাকিয়ে দেখলো দিলীপের দিকে। একটু যেন বিরূপ সেই চাউনী। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, "জেনীর অতদূর না যাওয়াই ভালো। আমি বরং কুয়ো-ফান্'কে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"না, আমি নিজেই যাবো", জেনী উত্তর দিলো, "চলো দিলীপ।"

"তোমরা এখন ট্যাংরা যাচ্ছো ?" মিনি ওয়াং জিজ্ঞেস করলো। স্থির সংযত তার গলা, কিন্তু তবু যেন বিষাদ-করুণ।

"না, আগে একবার দাই-কো'র বাড়ি যাচ্ছি। আহ্-কিমকে একবার দেখে আসি।"

"আমিও যাবো তোমার সঙ্গে", মিনি বললো।

"তুমিও ট্যাংরায় যাবে ?" চিয়েন চাং জিজ্ঞেস করলো।

"না, আমি যাবো শুধু আহ্-কিমের ওখানে।"

"চলো, দেরি করে লাভ নেই," জেনী বললো।

"দাঁড়াও একটু" দিলীপ বললো, "রঞ্জন, একটু শোন।" আমাকে ডেকে বাইরে নিয়ে গেল সে। "ওরে, দশটা টাকা হবে তোর কাছে ? দে তো ! কাল সকালে গিয়ে তোকে দিয়ে আসবো !"

"কি হয়েছে দিলীপ দা' ?"

"সে অনেক ব্যাপার। তুই বুঝবি না। আহ্-তং এর ভাই আহ্-কিম'কে ওদের বিপক্ষদলের লোকেরা মেরেছে। ওরা ওয়াং পরিবারের খুব বন্ধু। ওদের জানাশোনা প্রায় তিন চার পুরুষের। তাই জেনী মিনি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।"

"দাই-কো দাই-সাও এরা কারা ?"

"ও," হাসলো দিলীপ, "আহ্‌-তং কে এরা বড়ো ভায়ের মতো, মানে, তাই ওকে ডাকে দাই-কো, মানে বড়দা। আর ওর বৌকে ডাকে দাই-সাও, অর্থাৎ বড় বৌদি। আমার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। তুই অন্যদের সঙ্গে গোল্ডেন স্লিপারে যা।"

"না, আমি এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরবো।"

জেনী ওয়াং, মিনি ওয়াং আর দিলীপ চলে গেল।

ফেং চেং-শিয়াং বললো, "আমরা আর এখানে বসে থেকে কি করবো? চলো বেরিয়ে পড়ি।"

হাশিম উত্তর দিলো, "আমায় কিন্তু মাপ করতে হবে। আমার এইমাত্র মনে পড়লো যে আমি আরেকজনকে কথা দিয়েছিলাম তার ওখানে গিয়ে ডিনার খাবো।"

"তোমার যা অভিরুচি," বললে সুং-চাং, "এসো রঞ্জন, তোমার টাই বেছে নেবে।"

"আমার মনে হয় না আমার আর টাই দরকার হবে," আমি বললাম।

"কেন তোমারও কি মনে পড়লো নাকি যে তুমি কারো সঙ্গে ডিনার খাবে বলে কথা দিয়েছো?" জিজ্ঞেস করলো ফেং চেং-শিয়াং।

আমার কান একটু লাল হয়ে উঠলো। তবু হেসে বললাম, "না, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।"

"বেশ, আমরা জোর করবো না," হাত বাড়িয়ে দিলো সুং-চাং, "আজ তোমায় নিশ্চয়ই মিস্ করবো, তবে আশা করি তুমি শীগগিরই একদিন আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।"

হাশিমের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

বাইরে বেরিয়ে হাশিম বললো, "দেখ, ওদের এড়ানোর জন্যে আমি অন্যত্র ডিনার খাওয়ার কথাটা বললাম। চলো, তুমি আর আমি মিলে কোথাও বসে পরটা-কাবাব খেয়ে নিই।"

"না", আমি উত্তর দিলাম, "আমার শরীরটা সত্যিই ভালো নেই।"

হাশিমের সঙ্গে একটু শর্টকাট করে বেরিয়ে এসে পড়লাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে।

লাইট-হাউস বার'এ বসে অরেঞ্জ'এর গেলাসে চুমুক দিতে দিতে এসব কথাই ভাবছিলাম। আশ্চর্য সব বন্ধু দিলীপের, এক মিনিটের মধ্যেই সবাই বন্ধু, প্রত্যেকে প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকছে, তারপর আচমকা কী যেন হয়ে গেল, এ ওর দিকে ধারালো চাউনি হানলো, একজন গম্ভীর হয়ে গেল, আরেক জন রুক্ষ হয়ে উঠলো, অন্য একজন মিথ্যে ডিনারের নাম করে সরে পড়লো, অন্য সবাই চুপ করে রইলো।

মল্লিকা যদি জানতো, সে কি বলতো, 'চায়না টাউনে কাল সন্ধ্যা আপনার ভালোই কেটেছে বলুন,'—?

· • না, একটুও ভালো কাটেনি। তার চাইতে রেবা চৌধুরীর পাশে বসে সিনেমা দেখাটা অনেক সুখের।

রেবা! বেশ মিষ্টি মেয়েটি। আলাপ হয়েছিলো সুবিমলের বাড়িতেই। মল্লিকাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো,—রঞ্জন বাবু, এ আমার মামাতো বোন রেবা!—রেবা চা করে আনলো, গান গেয়ে শোনালো। হস্টেলে থাকতো সে।

সন্ধ্যে হয়ে আসতে তাকে হস্টেলে পৌছে দিতে হোলো আমায়—কারণ সুবিমল বললে, তার কি একটা কাজ আছে, সে বেরোতে পারবে না।

ট্রামে পাশাপাশি বসে ওকে হস্টেলে পৌছে দিয়ে এসেছিলাম। পাশাপাশি বসে নানারকম গল্প—সিনেমার, সাহিত্যের, বিশ্বরাজনীতির, কলেজের মেয়েদের, ছেলেদের।

তারপর আরেক দিন সুবিমলের বাড়ি নেমন্তন্ন। এলোমেলো গল্প। ফুরোতে চায় না। একঘেয়ে লাগে না। ভালো লাগে, নতুন মনে হয়, এলো চুল থেকে মিষ্টি তেলের গন্ধ ভেসে আসে, কাজল চোখের চাউনি তোলপাড় করে তোলে মনকে।

কাল সিনেমার অন্ধকারে পাশে বসে হয়তো একটু কাঁধে কাঁধ ঠেকতো,

হয়তো হাতে হাত রাখতো সে—দিদিকে, জামাইবাবুকে লুকিয়ে। ওরা টের পেতো হয়তো, টের পেয়েও টের না পাওয়ার ভান করতো। হয়তো আজ বিকেলে রেবাকে একলা নিয়েই বেরোনো যেতো, হয়তো একলা বসা যেতো কোনো নিরালা রেস্তরাঁয়।

হয়তো আজ কোনো কথা আসতো না কারো মুখে। হয়তো দুজনেই আনমনা।

"কী এত ভাবছো," সে হয়তো একবার জিজ্ঞেস করতো।

শুনতো আমি বলছি, "তোমার কথাই ভাবছি রেবা।"

একটু লাল হয়ে উঠতো সে। চোখ নিচু করতো।

আমি হয়তো একটু ভেবে নিতাম, আস্তে আস্তে বলতাম, "আচ্ছা রেবা, আমি যদি আজ তোমায় বলি—"

"না, না, বোলো না," কেঁপে উঠতো রেবার গলা, "এখন নয়, আরো কিছু দিন যাক।"

আর হতভাগা দিলীপ! এরকম একটি সম্ভাবনার সূত্রপাতেই আমার সিনেমার টিকিটখানি আচমকা বেচে দিলে আরেকজনকে। আর আমি যেন আরেকটি সিনেমা দেখে এলাম চায়না টাউনে, যা দেখলে মাথা ধরে যায়।

আর ওদের ছায়াও মাড়াচ্ছি না, মনে মনে ভাবলাম। তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

"হালো রঞ্জন!"

গলা শুনে চমকে উঠলাম। খুব চেনা গলা।

যোগীন্দর সিং এসে একটি চেয়ার টেনে বসলো। "তুমি এখানে একা বসে আছো? ভালোই হোলো। বসে গল্প করা যাবে। ভাবছিলাম একলা বসে কি করবো। বিয়ার খাবে? খাবে না? কেন? কি খাবে? আচ্ছা আরেকটা অরেঞ্জ খাও। বেয়ারা—!"

তারপর বললো, "কাল তুমি চলে এসে ভালোই করেছো। এমন কিছু জমলো না। দিলীপ তো জেনী আর মিনিকে নিয়ে চলে গেল। তারপর

দেখি হেনরিরও আর উৎসাহ নেই। সে চায় মা-খিন-চ্যিকে নিয়ে বেরোতে। নতুন প্রেমে পড়েছে। খুব স্বাভাবিক। আমরা কিছু বললাম না। সে, মা-খিন-চ্যি. মওং-জ্যি আর ম্যাবেল বেরিয়ে গেল। ম্যাবেলের সঙ্গে বেশ ভাব হোয়েছে মওং-জ্যির। তখন চেং-শিয়াং বললে সে প্রিন্সেসএ গিয়ে ক্যাবারে দেখবে। চিয়েন-চাং তার সঙ্গে যেতে চাইলো, কারণ চেং-শিয়াং এর বোন টিং-লিংকে তার খুব চোখে লেগেছে। স্যুং-চাং বললে সে আর কোথাও যাবে না, মেট্রোতে গিয়ে একটি সিনেমা দেখবে। তখন আমি আর জয়প্রকাশ কি করি? কারনানি থেকে দু'জন চেনা মেয়েকে পিক্-আপ করে ব্রিস্টলে গিয়ে বসলাম। বুঝলে রঞ্জন, শনিবার রাত্তিরে স্ট্যাগ-পার্টি আমার বরদাস্ত হয় না। রোববারটা আমি একা-একা চুপচাপ কাটাই। যাই বলো, কলকাতায় লাইফ নেই। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এ-দেশ ছেড়ে নিউইয়র্কে গিয়ে সেটেল ডাউন করতে।"

যোগীন্দর সিং-এর আলোচনার ধরণ আমার ভালো লাগলো না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, ওই আহ্-কিম লোকটি কে?"

"আহ্-কিম?" যোগীন্দার বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকালো। "আহ্-কিম বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে একটি লণ্ড্রি চালায়। তাছাড়া আরো অন্যান্য কি সব করে। ঠিক জানি না। তবে ওদের কি একটা এসোসিয়েশান আছে। একটা কাগজ বার করে ওরা। কেউ কেউ বলে আহ্-কিম নাকি কম্যুনিস্ট। হতে পারে। আমি মাথা ঘামাই না। হু কেয়ারস? পলিটিক্স্এ আমার একটুও ইন্টারেস্ট নেই। আমি বিজনেস করি, আমার যে টাকা দরকার, সেটা খেটে রোজগার করি, আরো বেশী রোজগার করবো বলে আশা করি, খাই দাই ফুর্তি করি। আহ্-কিমকে আমি তেমন ভালো করে চিনি না। আমি চিনি ওর বড়ো ভাই আহ্-তং'কে।"

"কে এই আহ্-তং?"

"আহ্-তং জুতোওয়ালা, ওর একটি জুতোর দোকান আছে চিৎপুর রোডে। আমি তো জুতোর অর্ডার সাপ্লাই করি, তাই ওর কাছ থেকে জুতো কিনতে

হয় আমাকে। চমৎকার লোক। খুব সস্তায় জুতো দেয়। এই যে জুতো-জোড়া পরে আছি, এর দাম কতো বলো তো?

"ম—আটাশ টাকা?"

"পাগল হয়েছো? আমি যোগীন্দর সিং পরবো আটাশ টাকা দামের সস্তা জুতো? আমি ঠিক সেই জুতো পরবো যার দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা বললে লোকে একটুও অবিশ্বাস করবে না, অথচ যে জুতো আহ্-তং আমার ষোলো টাকা দিয়ে করে দেবে। তুমি যে জুতো পরে আছো, সেটা আহ্-তং'এর কাছে পাওয়া যাবে আট-ন' টাকায়। এসো আমার সঙ্গে একদিন। আমি দশ টাকার মধ্যে তোমায় খুব ভালো জুতো কিনিয়ে দেবো। তবে আর কাউকে বলতে পারবে না।"

আমি একটু হাসলাম। তারপর বললাম, "জানো, যোগীন্দর, তোমার চাইনিজ বন্ধুরা খুব এ্যাংলিসাইজড্ বলে মনে হোলো। আমার কিন্তু চায়না টাউনের চীনেদের সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা ছিলো।"

যোগীন্দর উত্তর দিলো, "চায়না টাউনে একদিন সন্ধ্যা কাটিয়ে ওদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারবে না রঞ্জন! চেং-শিয়াং টিং-লিং'এর মতন কিছু এ্যাংলিসাইজড্ চীনে আছে বটে, কিন্তু সে খুব কম। প্রায় চীনাই চীন দেশের চীনাদের মতো, সে কলকাতায় হোক, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে হোক, রেঙ্গুনে হোক, সিঙ্গাপুরে হোক—ওরা একটুও বদলায় না। কিছু কিছু আছে জেনী, মিনি, চিয়েন-চাং, আহ্-কিম এদের মতো, অন্য জাতের বন্ধুর সঙ্গে মেশে, স্যুট পরে, ফ্রক গাউন পরে, ইংরেজি বলে, নাচে,—কিন্তু ওরাও মনে মনে খাঁটি চাইনীজ। এই দেখ না, আহ্-কিম'এর মাথা ফাটলো। সে কথা শুনে জেনী, মিনি এরা এলো আমাদের সঙ্গে?"

"আচ্ছা, চিয়েন-চাং লোকটি কি রকম?"

"কেন?"

"বাইরে ও-রকম একটি নোংরা ছোটো রেস্তরাঁ, ভেতরে এত ফিটফাট, জমকালো?"

"তুমি বুড়ো ওয়াংকে দেখেছো ?"

"না।"

একটু ভাবলো যোগীন্দর। তার পর বললো, "দেখ, আমি ওদের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানি না। জানতে চাইও না। আমরা হৈ-হৈ করে ফুর্তি করে বেড়াই, ব্যস ওই পর্যন্ত। ভেতরে ভেতরে কে কি করে, কে কিরকম লোক, কে মাথা ঘামায় ? দিলীপকে জিজ্ঞেস কোরো, সে বলতে পারবে। সে ওদের খুব অন্তরঙ্গ, অনেক কথাই জানে।"

"অন্তরঙ্গ ?"

"হ্যাঁ। তুমি জানো না ? সে জেনী ওয়াংকে বিয়ে করতে চায়।"

"এ্যাঁ ? ? ?"—আমার চোখ কপালে উঠলো।

যোগীন্দর হাসলো। বললো, "দেখ, আমি যদি তুমি হতাম, আমি দিলীপের সঙ্গে চায়না টাউনে যেতাম না। চিয়েন-চাং দিলীপকে খুব পছন্দ করে না, সে চায় না যে সে জেনীর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হোক। আর চিয়েন-চাং'এর সঙ্গে মনোমালিন্য থাকাটা খুব নিরাপদ নয়। আর দেখ, দিলীপ তোমায় ওখানে কেন নিয়ে গেছে জানি না। যদি তোমার সঙ্গে মিনির ভাব করিয়ে দিতে চায়, আমি বন্ধু হিসাবে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি এড়িয়ে চলবে। কাল তোমার গিয়ে উপস্থিত হওয়াটা চেং-শিয়াং'এর খুব ভালো লাগে নি। সে অন্য কারো সঙ্গে মিনির ঘনিষ্ঠ হওয়াটা ভালো চোখে দেখে না। আর চেং-শিয়াংএর মতো লোকের কাছ থেকে এক মাইল তফাতে থাকাটাই হোলো বুদ্ধিমানের কাজ। তবে হ্যাঁ, এরা তো খুব ভদ্র, তোমাকে পছন্দ না করাটাও এরা খুব ভদ্রভাবে করবে।"

"মানে ?"

"মানে, এই ধরো, কেউ যদি তোমায় ছুরি মারতে চায়, তাও খুব ভদ্র ভাবে মারবে।"

আমি বললাম, "দেখ যোগীন্দর, আমি ওদের মধ্যে আর যাচ্ছিও না,

ওদের সম্বন্ধে কিছু জানবার আমার আগ্রহও নেই। এবার অন্য কিছু আলোচনা করা যাক।"

যোগীন্দর হাসলো, "না, ভাই রঞ্জন, চীনারা এমনি লোক ভালো। সবাই চেং-শিয়াং নয়। তোমরা ডিটেকটিভ গল্পে যে ছবি পাও চায়না টাউনের, আসল চায়না টাউন কিন্তু তা নয়। বেশীর ভাগ লোকই সাধারণ অবস্থার লোক, খাটে, রোজগার করে, খায়-দায়, বিয়ে করে, সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে, রোজকার করে আর খাটে, খাটে আর রোজগার করে। ব্যস। এক সময় তো বেশ ছিলো এরা। চীন-জাপানের যুদ্ধের সময় কোনো গোলমাল ছিলো না এদের মধ্যে। এখন, সম্প্রতি যে অন্তর্বিপ্লব চলছে চীনে, তার দরুণ এখানে এদের মধ্যে খুব গোলমাল। কি জানি, আমি ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝি না। আমরা ওদের সঙ্গে কতোটুকুই বা মিশি, কতটুকুই বা জানি?"

"হ্যাঁ, যা জানি তা শুধু মনগড়া ডিটেক্টিভ গল্প থেকে।"

গেলাসে আরেক চুমুক দিয়ে যোগীন্দর বললো, "তাও যে খুব ভুল, তা' নয়। ডাকাত, খুনে, স্মাগলার সে সবও আছে। জুয়ার আড্ডা আছে, ব্রথেল আছে, ওপিয়াম ডেন আছে। আমি কিছু কিছু দেখেছি। তুমি দেখতে চাও?"

"না,"—আমি উত্তর দিলাম।

"যদি কোনো কিছু দেখতে চাও তোমার বন্ধু দিলীপকে বোলো, সে চায়না টাউনকে আমাদের চাইতেও ভালো চেনে। সব একবার ঘুরে-ফিরে দেখতে পারো। মন্দ লাগবে না। তুমি তো আশ্চর্য লোক হে! আমি সাধছি তোমায় দেখতে, তুমি রাজী নও। অথচ অনেকেই শুনলে লাফিয়ে ওঠে, জানো? তবে হ্যাঁ। ওয়ান হ্যাজ টু বি কেয়ারফুল। একবার আমার এক বন্ধুর যা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিলো!" বলতে বলতে হেসে উঠল যোগীন্দর।

হাসলো, খুব হাসলো সে। পাশের টেবিলে আইসক্রীম খাচ্ছিলো একটি বাচ্চা ছেলে, চমকে উঠে ফিরে তাকালো।

যোগীন্দর বললো, "সে-ও একজন বাঙালী। নাম মনে করো লাহিড়ী। আসল নাম বলবো না। এটুকু জেনে রাখো যে, সে কলকাতার কোনো এক খবরের কাগজের সাব-এডিটার। শুনবে তার গল্প?"

আমি একটি সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

যোগীন্দর সিং সুরু করলো তার বাঙালী বন্ধু সাব-এডিটার লাহিড়ীর চায়না টাউনের অভিজ্ঞতার গল্প।

* চার *

লাহিড়ী এক দিন আমায় এসে বললে—যোগীন্দর সিং সুরু করলো—ভাই যোগীন্দর, আমাদের কাগজে আমি একটি নতুন ফিচার লিখছি : ইনসাইড ক্যালকাটা। আগের দুটো সংখ্যায় জোড়াবাগানের উপর লিখেছি, চৌরঙ্গির উপর লিখেছি। ভাবছি এবার চায়না টাউনের উপর লিখবো। তুমি তো ওদিকটা জানো, আমায় নিয়ে একদিন দেখাতে পারো ?

নিশ্চয়ই, আমি বললাম, তবে খরচা-পত্তর তোমার। সে রাজী। আমিও খুশী। ফ্রী লাঞ্চ, ফ্রী ডিনার, ফ্রী ড্রিঙ্কস—আর লাহিড়ীর যদি তেমন তেমন শখ হয়, ফ্রী গার্ল্স্—এমন মওকা কে ছাড়ে বলো ?

তাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলাম আমার এক চাইনিজ বন্ধু লিয়াং কুয়ো-ফান্ এর সঙ্গে। কুয়ো-ফান ব্যবসা করে, কিসের ব্যবসা আমরা ঠিক জানি না, কিছু কিছু আঁচ করি বটে, তবে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করি না। তার সঙ্গে আমি আর লাহিড়ী একটি জুয়ার আড্ডা দেখলাম, একটি চণ্ডুর আড্ডা দেখলাম, একটি মেয়েছেলের আড্ডা দেখলাম। লাহিড়ী খুব খুশি। সে ভাবলো সে চায়না টাউন সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছে। একদিন সে বললে, এবার একটু সাধারণ লোক দেখবে সে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও কিছু জানবে এবার। একদিন সে সারা দুপুর বসে রইলো চিশিউ-চিং'এর জুতোর দোকানে। তার পর বললে, একটা দুপুর কাটাবে কোনো একটা সাধারণ চীনে রেস্তরাঁয়, যেখানে সাধারণ চীনেরা খেতে আসে, আড্ডা দিতে আসে। এখন, এ-সব কি আমার ভালো লাগে ? নো ড্রিঙ্কস্, নো গার্ল্স্, নো ফান্, চুপ-চাপ বসে অন্য লোকের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা আমার কি পোষায় ? যাই হোক, ওখানে তিরেটি বাজারের কাছেই একটি ছোটো গলির ভিতর ত্‌-শিউ-চুয়ান নামে একটি

লোকের একটি ছোটো রেস্তরাঁ আছে। তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শিউ-চুয়ানকে বললাম, আমার এই বন্ধুটি খবরের কাগজের লোক। এখানে বসে একটু লোকজন দেখতে চায়। ওর যা লাগে দেবে। আর দেখো, ওর যেন কোনো অসুবিধে না হয়।

যাক, ওকে সেখানে রেখে তো আমি আমার অফিসে চলে এলাম। আর সেখানেই একটি মজার এ্যাডভেঞ্চার হোলো লাহিড়ীর, মজার বিপদে পড়লো সে। চণ্ডুর আড্ডা, জুয়ার আড্ডা, স্ত্রীলোকের আড্ডা সব নির্বিঘ্নে ঘুরে এসে সেই পুওর লাহিড়ী কি না বিপদে পড়লো ভালো মানুষ শু-শিউ-চুয়ানের অতি সাধারণ একটি রেস্তরাঁয়।

বলে যোগীন্দর সিং আবার হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে বিয়ার শেষ করলো সে। আরেক বোতল বিয়ারের অর্ডার দিলো। তারপর আবার আরম্ভ করলো।

—আমি লাহিড়ীর কাছে যেরকম শুনেছি, সেরকমই বলে যাচ্ছি তোমায়। লাহিড়ী তো সেখানে বসে চা খেতে খেতে দেখলো সাধারণ দু-চার জন চীনা এসে কাঠের চপ-স্টিক দিয়ে সাধারণ ভাত তরকারি খাচ্ছে, চপ-সুয়ে নয়, চাও মিয়েন নয়, ফ্রাইড রাইস নয়, শার্কস্ ফিন্ স্যুপ নয়, ওসব কিচ্ছু নয়,—প্লেন এ্যাণ্ড সিম্পল্ কারি এ্যাণ্ড রাইস। কয়েকজন বসে শুধু গল্প করছে, দু'একজন ফিরিঙ্গীও আসছে মাঝে মাঝে।

লাহিড়ী বসে বসে ভাবছিলো, এই ক'দিন যা দেখলো তা নিয়ে একটা জমকালো রোমাঞ্চকর ফিচার কি করে লেখা যায়।

হঠাৎ একজনের ডাকে তার চমক ভাঙলো।

মুখ ফিরিয়ে দেখে শার্ট-প্যাণ্ট পরা একজন ভদ্রলোক পরিষ্কার বাঙলায় তাকে জিজ্ঞেস করছে, "আচ্ছা আপনার সঙ্গে যে মিস্টার দত্ত ছিলেন, উনি কোথায় গেলেন ?"

"মিস্টার দত্ত !" লাহিড়ী অবাক, "আমার সঙ্গে তো ও-নামে কেউ ছিলো না ?"

"ছিলো না? ও, তা' হলে আমারই ভুল হয়ে থাকবে," বলে সেই ভদ্রলোকটি চারদিক তাকিয়ে দেখলো। খালি টেবিল নেই একটিও। তখন লাহিড়ীকে বললো, "আচ্ছা, আমি কি দু-চার মিনিট এখানে বসতে পারি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই", উত্তর দিলো লাহিড়ী।

লোকটির হাতে ছিলো একটি এটাচি কেস। সেটি রাখলো টেবিলের উপরে। তারপর একটি সিগার ধরালো। চুপচাপ বসে চুরুট ফুঁকলো কিছুক্ষণ।

তারপর বললো, "আমি অপেক্ষা করছি এক ভদ্রলোকের জন্যে। একটার সময় আসবার কথা, এখন দেড়টা প্রায় বাজে। এখনো দেখা নেই।"

লাহিড়ী উত্তর দিলো, "আজকাল সময় ঠিক রাখার বড্ড অসুবিধে। ট্রামে-বাসে এত ভিড়, ঠিক মতো ওঠা যায় না। তা ছাড়া অনেকে দেড়টায় টাইম দিলে আড়াইটার আগে আসে না।"

এমনি করে গল্প করতে সুরু করে দিলো ওরা দুজন। লাহিড়ী খুব গল্পে লোক, একজন কাউকে পেলেই চেনা হোক, অচেনা হোক, আলাপ জমিয়ে ফেলে। আর এ-ভদ্রলোকও দেখা গেল, গল্প করতে একটুও গররাজী নয়।

খানিকক্ষণ পর ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "আরে! দুটো বাজে যে!—ম্—একটা টেলিফোন করতে পারলে হোতো। এখানে তো টেলিফোন নেই। দাঁড়ান, আসবার সময় ওদিকে একটি ওষুধের দোকান দেখেছি। ওদের নিশ্চয়ই ফোন আছে। আচ্ছা, আমি আসছি এক্ষুণি"—

ভদ্রলোক উঠে বেরিয়ে গেলেন। লাহিড়ী দেখলো যে, এটাচি কেসটি উনি রেখে গেলেন। গা করলো না সে। ভাবলো, ফোন করতে গেছে। এক্ষুণি ফিরে আসবে।

দোকানটা তখন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। শুধু এক কোণে একটি লোক বসে আছে। কিছুক্ষণ পর আরেকজন লোক এলো। অন্য লোকটির টেবিলে বসলো। দু-একটা কি যেন কথাবার্তা হোলো ওদের মধ্যে। তারপর

চুপচাপ এক কাপ চা খেয়ে লোকটি চলে গেল। আগের লোকটি আরেক কাপ চা নিয়ে বসে রইলো সেই টেবিলে।

লাহিড়ী লক্ষ্য করলো যে, লোকটি মাঝে মাঝে আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাহিড়ী একটু উদ্বিগ্ন হোলো। আড়াইটে বেজে গেছে। সেই ভদ্রলোকের দেখা নেই। এতক্ষণ ফোন করছে সে?

একবার ভাবলো, যাক গে। সে যখন আসবে আসুক। আমার কি? আমি চলে যাই। তারপর ভাবলো, নাঃ, সে ঠিক হবে না। ভদ্রলোক তার ভরসায় এটাচি কেসটি রেখে গেছে। লোকটি ফিরে আসুক, তার-পর চলে যাবে।

তিনটে যখন প্রায় বাজে, লাহিড়ী শু-শিউ-চুয়ানকে ডাকলো। সে বসে ছিলো দরজার কাছে, তার কাউন্টারে। সেখানে থেকে উঠে লাহিড়ী কাছে আসতে, লাহিড়ী বললো, "দেখ, একটি লোক এখানে এসে বসেছিলো, সে গেছে ওদিকে একটি ওষুধের দোকানে টেলিফোন করতে—"

"না তো", বললো শিউ-চুয়ান, "ও একটি ট্যাক্সিতে চড়ে এসেছিলো। সঙ্গে আরেকজন লোক ছিলো। সে যতক্ষণ এখানে ছিলো, ট্যাক্সিও ওদিকে অপেক্ষা করছিলো ততক্ষণ। লোকটি বেরিয়ে গিয়ে সেই ট্যাক্সিতে চড়েই চলে গেছে।"

লাহিড়ী অবাক! বললো, "দেখ, সে এই এটাচি কেসটি এখানে ফেলে গেছে।"

শিউ-চুয়ান একবার এটাচি কেসের দিকে, একবার লাহিড়ীর দিকে তাকালো। তারপর বললো, "আমি দেখি নি।"

"মানে?"

"আমি ওই লোকটিকে এটা নিয়ে ঢুকতে দেখি নি।"

"তা' হলে? এটা কি আমি এনেছি নাকি, না আমি আসবার আগে এখানে ছিলো?" জিজ্ঞেস করলো লাহিড়ী।

"আপনি এনেছেন কি না তাও আমি দেখি নি", শিউ-চুয়ান উত্তর দিলো, "তবে আপনি আসবার আগে এটা আমি এখানে দেখি নি।"

লাহিড়ী বললো, "যাই হোক, এটা রেখে দাও তোমার কাছে, ও নিশ্চয়ই মনে পড়লে ফিরে আসবে। তখন এটা দিয়ে দিও।"

মাথা নাড়ালো শিউ-চুয়ান। "জিনিসটা কার না জেনে আমি এখানে ওটা রাখতে পারবো না।"

"তা হলে আমি কি করবো?"

শিউ-চুয়ান চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর বললো, "আমার ধারণা, আপনি ভুলে গেছেন যে, ওটা আপনার। কিংবা হয়তো এখন আপনার মনে হচ্ছে, ওটা আপনার না হলেই ভালো হয়।"

শিউ-চুয়ানের কথার মানে প্রথমটা বুঝতে পারলো না লাহিড়ী। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল একটি ঘটনা। কিছু দিন আগে কাগজে বেরিয়েছে। ট্রেণে এক ভদ্রলোক আরেক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে নিলো। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট। যাত্রী শুধু ওরা দু'জন। সারাটা পথ বেশ গল্পগুজব করতে করতে এলো। হাওড়ায় এসে পৌঁছুতে লোকটি বললো, আপনি বসুন, আমার মালগুলো রইলো। আমি কুলি ডেকে আনি। কুলি ডাকতে সেই যে গেল আর দেখা নেই। তারপর বিরক্ত হয়ে কুলি ডেকে নিজের মালগুলো নামাতে যাবে এমন সময় পুলিস আর আবগারির লোক এসে উপস্থিত। অন্য লোকটির বাক্স খুলতে আফিং বেরোলো। তখন লোকটিকে নিয়ে টানাটানি। সে বললে, ও মাল তার নয়। কিন্তু এরা শুনলো না তার কথা। তাকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। অনেক হাঙ্গামার পর প্রমাণিত হোলো যে এ-বাক্স তার নয়, গাড়িতে অন্য যে লোকটা উঠেছিলো, তার। সে চোরা আপিং চালান দেয়। হাওড়ায় এসে যখন সে টের পেলো আবগারী পুলিস সন্ধান পেয়েছে যে এ গাড়িতে চোরা আফিং আসছে এবং পাহারা রেখেছে চার দিকে, সে আফিঙের মায়া ত্যাগ করে সরে পড়েছে।

মনে পড়তেই ঘেমে উঠলো লাহিড়ী। এটাচি কেসটা তুলতে গিয়ে দেখলো, না, বেশ ভারী।

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সে।

আর এরকম ভয় পেয়েই সে ভুল করলো। তা নইলে সেদিন তার যা দুর্ভোগ হয়েছিলো, সে রকম হোতো না।

তার যখন সন্দেহ হোলো যে এখানে এরকম সুটকেস ফেলে যাওয়ার মধ্যে কোনো গোলমাল আছে——যোগীন্দর সিং বলে চললো——সোজা পুলিস ডেকে ব্যাপারটা খুলে বললেই চুকে যেতো। এটা যে তার, এরকম কোনো প্রমাণ তো নেই, মনে করবার কারণও নেই। সে খবরের কাগজের সাব-এডিটার, তার একটা পরিচয় রাছে। শিউ-চুয়ানের দোকানে সে আমার সঙ্গে গেছে, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে ছিলাম। তাছাড়া আমাদের দেশের পুলিসও অতো কাঁচা নয় যে ঝট করে বিশ্বাস করে নেবে ওই এটাচি কেস লাহিড়ীর।

কিন্তু লাহিড়ী হঠাৎ বেদম ভয় পেয়ে গেল। বললো, "না, ওটা আমার নয়। আমি নিয়ে যেতে পারবো না।"

"কি আছে ওর মধ্যে?" শিউ-চুয়ান জিজ্ঞেস করলো।

"আমি জানি না," লাহিড়ী উত্তর দিলো।

"ওটা খুলে দেখা যাক্," শিউ-চুয়ান বললো।

কিন্তু লাহিড়ী বেদম নার্ভাস হয়ে বললো, "না না, অন্যের জিনিস তুমি খুলে দেখতে যাবে কেন? আর এটা তো আমি আনিনি।"

"কে এনেছে আমি তো দেখিনি।"

"ওই লোকটাকে তো আমি চিনি না।"

"আমি কি করে জানবো সে কথা। আমি দেখেছি সে লোকটা ট্যাক্সি চেপে এলো, আপনার সঙ্গে বসে গল্প করলো কিছুক্ষণ, তারপর চলে গেল সেই ট্যাক্সিতেই।"

"তুমি ওকে চেনো?"

"না, তবে নানা রকম লোক আসে এখানে। আমি দেখলে একটু একটু টের পাই," শিউ চুয়ান উত্তর দিলো।

"ও কি রকম লোক।"

"আমি জানি না।"

লাহিড়ী আস্তে আস্তে উঠে পড়লো। এটাচি কেসটা কিছুতেই রেখে যেতে পারলো না। শিউ-চুয়ান মানবে না কিছুতেই। ওকে নিয়ে আর বেশী ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে সাহস করলো না লাহিড়ী। এটাচি কেসটা নিয়ে বেরিয়ে এলো আস্তে আস্তে।

বাইরে এসে ভাবলো এটা নিয়ে এখন কি করা যায় ?

এমন সময় দেখে অন্য যে লোকটি কোণের টেবিলে বসে ছিলো সেও উঠে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

লাহিড়ী তখন আরো ঘাবড়ে গেল। তার ধারণা হলো, এ নিশ্চয়ই আবগারির লোক। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলো বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের দিকে। পেছন ফিরে দেখলো সে-লোকটিও আসছে তার পেছন পেছন।

আরো জোরে জোরে পা চালালো লাহিড়ী। বড়ো রাস্তায় এসে দেখে, পেছনের লোকটি তখনো গলির ভেতরে রয়েছে। কাছে একটি ট্যাক্সি। লাহিড়ী চট করে উঠ পড়লো ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে দেখে অন্য লোকটিও আরেকটি ট্যাক্সিতে উঠছে।

লাহিড়ীর মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এতক্ষণে তার ভুল বুঝতে পারলো। শিউ-চুয়ানের দোকানেই ওটা খুলে কি আছে দেখে, পুলিস-টুলিস ডেকে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো। কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন প্রথম কাজ পেছনের লোকটিকে এড়ানো। দ্বিতীয় কাজ এটাচি কেসটাকে দূর করা কোনো রকমে।

এসপ্লানেডের কাছে আসতে দেখে, সবুজ আলো জ্বলছে। লাহিড়ীর ট্যাক্সি রাস্তা পেরোতে লাহিড়ী পেছন ফিরে দেখে, লাল আলো জ্বলে উঠেছে। পেছন দিকে গাড়ির ভিড়ে আর অন্য ট্যাক্সিটাকে দেখা যাচ্ছে না।

লাহিড়ী তখন একটু নিশ্চিন্ত হোলো।

গাধাটা যদি তখন সোজা আমার অফিসে চলে আসতো—বলে গেল যোগীন্দর সিং—সমস্ত ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যেতো তখনই। কিন্তু লাহিড়ী সে কাজ করলো না, সে তখন ভাবছে কি করে এটাচি কেসটা দূর করা যায়।

হঠাৎ তার মাথায় মতলব খেলে গেল। ভাবলো, এ তো খুব সোজা, ইচ্ছে করে ভুল করে ট্যাক্সিতে ফেলে গেলেই হয়।

সে গ্র্যাণ্ডের সমানে ট্যাক্সি থামালো, ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো তাড়াতাড়ি, যেন তার ভীষণ তাড়া।

কিন্তু ভুল করে কোনো জিনিস ফেলে যাওয়া কি এতই সহজ? শুনলো, ট্যাক্সি-ড্রাইভার তাকে ডাকছে। তাকে ফিরে তাকাতে হোলো। দেখলো এটাচি কেসটি হাতে নিয়ে লোকটি তার পেছন পেছন আসছে। নিরুপায় হয়ে সেটি নিতে হোলো।

কিছুক্ষণ পর ভাবলো, আবার চেষ্টা করে দেখা যাক। সে আরেকটি ট্যাক্সি নিলো, ট্যাক্সিতে চেপে কিছুক্ষণ পার্ক স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট, থিয়েটার রোড ঘুরে, অবশেষে গ্লোবের সামনে এসে নামলো। বাক্সটা ইচ্ছে করে সীটের সামনে ফ্লোরের উপর রেখেছিলো যাতে ড্রাইভারের চোখে না পড়ে। গ্লোবের সামনে এসে নামলো এই ভেবে, যে ড্রাইভার যদি পরে টের পেয়ে ডাকেও বা, সে আর শুনবে না, সোজা ভেতরে ঢুকে, অন্য দিকে যে আরেকটি পথ আছে পাশের গলিতে বেরিয়ে যাওয়ার, সেদিক দিয়ে সরে পড়বে।

গাড়ি থেকে নামলো, ভাড়া মিটিয়ে দিলো। ড্রাইভারও লক্ষ্য করলো না যে এই ফ্যাকাসে-মুখ যাত্রী তার এটাচি কেস ফেলে গেছে ট্যাক্সিতে। ভাড়া নিয়ে সে চলে গেল ট্যাক্সি হাঁকিয়ে। লাহিড়ী এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

গ্লোবের ভিতরে ঢুকলো সে। মতলব—অন্য পথ দিয়ে পাশের গলিতে বেরিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলেসলিতে এসে ট্রাম ধরা।

কিন্তু সে আর হোলো না। অনীতা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে লাহিড়ীর তখন খুব ভাব। আর ভেতরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল সেই অনীতার সঙ্গে।

"সিনেমা দেখতে এলে বুঝি ?" জিজ্ঞেস করলো অনীতা।

"না, এই একটু ওজন নিতে এসেছি," লাহিড়ী উত্তর দিলো আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে।

অনীতা বললো, "আমি এসেছিলাম এ বইটি দেখবো বলে কিন্তু টিকিট পেলাম না। চলো কোথাও বসে চা খাওয়া যাক।"

অনীতাকে দেখলে লাহিড়ী সব কাজ ফেলে তার সঙ্গে লেপটে থাকতে চায়, কিন্তু সেদিন লাহিড়ী অনীতাকে এড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সে আর হয়ে উঠলো না। অনীতা তাকে সঙ্গে করে বাইরে বেরিয়ে এলো। আর বেরিয়ে আসতে দেখে, সেই ট্যাক্সি ফিরে আসছে।

অনীতার উপর ভীষণ রাগ হোলো লাহিড়ীর। কিন্তু কিছু করার নেই। রাগ হোলো ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের উপর। ওরা এত সাধুপুরুষ কবে ছিলো, লাহিড়ী ভাবলো। নিরুপায় হয়ে এটাচি কেস ফেরত নিতে হোলো। আট আনা পয়সা বখশিশ দিয়ে হারানো মাল ফেরত পাওয়ার জন্যে খুশী হওয়ার ভাণ করতে হোলো।

অনীতা দেখতে চাইলো এটাচি কেসের মধ্যে কি আছে। লাহিড়ী দেখে, আরো বিপদ! বললো, "অনীতা, কিছু মনে কোরো না। চা খাওয়া আর আমার হোলো না। আমার এখন ভীষণ কাজ। কাল তোমায় ফোন করে কোথায় দেখা হবে ঠিক করে নেবো। আমি এখন চলি।"

অনীতা রাগ করে চলে গেল। লাহিড়ী নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিনার্ভায় এলো।

মিনার্ভার কাছাকাছি আসতে সে ভাবলো, আচ্ছা, এটি সিনেমার ক্লোক রুমে রাখলে কি রকম হয়? ওরা তো ট্যাক্সি-ড্রাইভার নয়। ওরা নিশ্চয়ই আমার পেছন পেছন ছুটে এসে এটা গছিয়ে দেবে না। আর ভিড়ের মধ্যে কখন বেরিয়ে যাবো কেউ খেয়ালও করবে না।

মিনার্ভায় ঢুকে পড়লো সে। প্রথমে একটি ব্যালকনির টিকিট কাটলো। তারপর ভেতরে গিয়ে দেখে, ক্লোকরুম এটেন্ডেন্ট নেই। সেদিন লোক বেশী

হয়নি। একজন 'আশার' বললে, এই এটাচি কেস আপনি সঙ্গেই রাখতে পারেন।

সেটি হাতে নিয়েই উপরে উঠে ভিতরে ঢুকে সে নিজের সীটে গিয়ে বসলো। প্যাসেজের পাশেই তার সীট, লোকজন বেশী নেই।

তখন তার মাথায় আরেকটি মতলব এলো। এটাচি কেসটি সীটের তলায় রেখে দিয়ে এমনি বেরিয়ে পড়লেই হয়।

একবার ভাবলো এখনই বেরিয়ে পড়ে। তার পর ভাবলো, না। ঢুকবার সময় লোকটি দেখেছে যে একটি এটাচি কেস নিয়ে ঢুকছে। সে যদি লক্ষ্য করে সে এমন খালি হাতে বেরোচ্ছে? ঘণ্টা দুয়েক পরে বেরুলেই নিরাপদ। ততক্ষণ আর লোকটার মনে না-ও থাকতে পারে।

ঘণ্টা দুয়েক বসে বইখানি দেখলো অতি কষ্টে। নাচ গান হুল্লোড়ের বই—সাধারণত লাহিড়ীর ভালোই লাগে, কিন্তু এখন একটুও উপভোগ করলো না সে।

বই শেষ হতে যখন সে চুপচাপ খালি হাতে বেরিয়ে পড়ছে, তখন হঠাৎ শুনলো পেছন থেকে কে যেন ডাকছে,—আই সে, মিস্টার!

তার তিনটে সীট পরে বসেছিল একটি লোক। সে ওই শ্রেণীর পরোপকারী দর্শক যারা বেরোবার সময় সীটগুলো তুলতে তুলতে বেরোয়। লাহিড়ীর সীটটা তুলতেই সে লক্ষ্য করলো লাহিড়ীর এটাচি কেস।

যাই হোক—তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে এটাচি কেস হাতে লাহিড়ী যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে, তখন দেখে অনীতা আর আরেকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিচে। ওরা ছ'টার শো'এর টিকিট কিনেছে।

লাহিড়ীকে দেখে অনীতা বললো, "ও, এই তোমার ভীষণ কাজ?"

সে কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই অনীতা তার বন্ধুকে নিয়ে সরে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু অনীতার অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করার সময় লাহিড়ীর তখন নেই। সে রকম মেজাজও নেই।

সে তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এটাচি কেসটা দূর করতেই হবে। যে করেই হোক। কলকাতা শহরে, যেখানে এত লোকের এত জিনিস হারাচ্ছে, খোয়া যাচ্ছে, চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে—সেখানে একটি সামান্য এট্যাচি কেস কিছুতেই ইচ্ছে করে হারানো যায় না?

সেদিন অনেক চেষ্টা করলো লাহিড়ী। পেরে উঠলো না কিছুতেই।

নিউ মার্কেটের ভিতর একটি নিরিবিলি দেখে চায়ের স্টলের কেবিনে বসে চা আর প্যাটিস খেয়ে, টেবিলের নিচে এটাচি কেসটি রেখে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ওখানকার বয় কী সাধুপুরুষ, তাকে ডেকে এটাচি কেসটি ফিরিয়ে দিলো।

এদিক ওদিক ঘুরে একটা নিরিবিলি ডাস্টবিন পেলো না কোথাও, সব ডাস্টবিনের আশে-পাশেই লোকজন গিজগিজ করছে। লাহিড়ী ভাবলো কলকাতা শহরের জনসাধারণের রুচি কোথায় নেমেছে। ডাস্টবিনের পাশেও এত ভীড়!

তারপর গেল ময়দানে। তখনো ভালো করে সন্ধ্যে হয়নি। আলো আছে চার দিকে। খুঁজে পেতে একটি নিরিবিলি জায়গা দেখে এটাচি কেসটি রেখে আবার মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো সে।

এবার তাকে পেছন থেকে যে ডাকলো, তার গলা খুব কাঁচা।

পেছন ফিরে দেখে, একটি বাচ্চা স্কাউট ছুটতে ছুটতে তাকে ডাকছে।

মনে মনে লর্ড বেডেন পাওএলকে গালাগাল দিতে দিতে সে তার হাত থেকে এটাচি কেসটি গ্রহণ করলো। ছেলেটি তাকে তিন-আঙুলের সেলিউট মেরে চলে গেল।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে অন্ধকার হয়ে এলো। তখন ময়দানের এদিক ওদিক খুঁজে পেতে দেখে, এতক্ষণ যদিও বা নিরিবিলি ছিলো, এখন তা-ও নেই। সারা কলকাতার অসংখ্য ছেলে-মেয়ের জুড়ি এদিকে ওদিকে বসে ফিস-ফিস করে কথা বলছে।

সে তখন ফিরে এলো চৌরঙ্গিতে। ভাবলো, কী করা যায়!

ভাগ্য তাকে নিয়ে পরিহাসও করলো একটুখানি। কর্পোরেশান প্রেসের ওদিকে একটি ছেলে আচমকা তার এটাচি কেসটি ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় মারলো।

কি যেন ভাবছিলো লাহিড়ী। ওটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেই 'চোর চোর পাকড়ো পাকড়ো' বলে চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার করে উঠেই থেমে গেল সে। কি করলো সে! বেশ তো ছেলেটা এটাচি কেস চুরি করে পালাচ্ছিলো। কেন সে বোকার মতো চিৎকার করে উঠলো!

কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেল। কলকাতার পাব্লিক-স্পিরিটেড জনতা ততক্ষণে ছেলেটিকে ধরে ফেলেছে। এটাচি কেস তার হাতে আবার ফিরে এলো। সে আবার পথ চললো সেটি হাতে নিয়ে। তার মনে তখন খুব সমবেদনা ছেলেটির জন্যে—তাকে লোকে ঠ্যাঙাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে যখন সে মিউজিয়াম পেরিয়ে কিড স্ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়ালো, তখন সে আর ভাবতে পারছে না কি করবে।

এমন সময় লুঙ্গিপরা একটি লোক এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ফিস-ফিস করে বললো, "ছুকরী চাহিয়ে সাহাব? বহুত আচ্ছা আচ্ছা খাপসুরত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, বেঙ্গলী কলেজ গার্ল, পাঞ্জাবী, নেপালী, চীনা,—।"

শুনে লাহিড়ীর মাথায় আরেকটি মতলব এলো। বললো, "চীনা ছুকরী হ্যায়?"

গলির ভেতর দিকে একটু অন্ধকারে একটি ফিটন গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো। সে লোকটির পেছন পেছন সেই গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

ভেবেছিলো লোকটি যখন চীনা ছুকরীর খোঁজ দিচ্ছে, তাকে নিয়েও যাবে চায়না টাউনে।

কিন্তু লোকটি কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে তাকে নিয়ে এলো ওয়েলেসলি অঞ্চলের এক নোংরা গলিতে।

লাহিড়ী ভেবেছিলো, ওখানে কোনো মেয়েছেলের ঘরে এটাচি কেসটি ফেলে আসবে। ওরা নিশ্চয়ই সাধুপুরুষ নয়। সে ভুল করে একটি

এটাচি কেস ফেলে যাচ্ছে দেখলে নিশ্চয়ই তাকে ডেকে সেটি ফিরিয়ে দেবে না।

কিন্তু যা ভেবেছিলো তাও হোলো না।

লোকটির সঙ্গে একটি জীর্ণ বাড়ির দোতলায় উঠে একটি আধো-অন্ধকার ঘরে ঢুকে লাহিড়ী পড়লো কয়েক জন গুণ্ডার হাতে।

তার ঘড়ি গেল, ফাউণ্টেন পেন গেল, আঙটি গেল, টাকাভর্তি মানিব্যাগ গেল। তাতে তার মনে এমন কিছু দুঃখু হয়নি যখন সে দেখলো তার এটাচি কেসটিও ওরা নিয়ে নিলো।

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন এটাচি কেসটি এককোণে নিয়ে গিয়ে সেটি খুলে দেখলো। দেখে একবার লাহিড়ীর দিকে তাকালো। তারপর সেটি বন্ধ করে লাহিড়ীর হাতে দিয়ে বললো, "এটি আমাদের দরকার নেই। আপনি নিয়ে যান।"

আরেক জন জিজ্ঞেস করলো, "আপনি থাকেন কোথায় ?"

"সে জেনে কি হবে ?" লাহিড়ী জিজ্ঞেস করলো।

"না। শুধু জানতে চাইছিলাম আপনার বাস ভাড়া কতো লাগবে। হেঁটে গেলে তো তকলিফ হবে—। আচ্ছা, সাহাব, এই একটা টাকা নিয়ে যান।"

সর্বস্ব খুইয়ে এটাচি কেস হাতে নিয়ে বাড়ি রওনা হোলো লাহিড়ী। খানিকটা পথ গিয়ে ভাবলো, না, এটা নিয়ে বাড়ি ফেরা ঠিক হবে না, সবাই জানতে চাইবে এর মধ্যে কি আছে। সে আরেক বিপদ।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় ? একটু ভেবে স্থির করলো, না—অফিসে ফিরে যাই। আজ তার রাত্তিরে ডিউটি নেই বটে। কিন্তু ওখানে গিয়ে একটু নিরিবিলি বসে ভাবা যাবে, এটা নিয়ে কি করা যায়।

ওই টাকা খরচা করে সে কিছু খেয়ে নিলো একটা ছোটো রেস্তরাঁয়। খুচরো যা বাঁচলো তাতে ট্রামে চেপে অফিসে ফিরে এলো। অফিস থেকে সে তাদের পাড়ায় এক প্রতিবেশীর কাছে ফোন করে দিলো, যেন বাড়িতে খবর দিয়ে দেয় সে অফিসে আছে।

তার সহকর্মী সাব-এডিটারেরা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, আজ তার ডিউটি নেই, সে এখানে কেন!

সে এলোমেলো দু-চারটি কথা বলে তাদের কৌতূহল এড়িয়ে অন্য গল্প ফাঁদলো।

ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা।

কেটে গেল আরো আধ ঘণ্টা। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের মধ্যে বসে আস্তে আস্তে তার সাহস ফিরে এলো। ভাবলো, সত্যিই তো! এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। রাত একটু বেশী হলে পথঘাট নির্জন হয়ে আসবে। তখন একটি ডাস্টবিনে ফেলে দিলেই হোলো।

এগারোটা বাজলো। ভাবলো, এবার ওঠা যাক।

তখন এগারোটা দশ। হঠাৎ একজন ঘরে ঢুকে বললো, "আপনি এখানে? মিস্টার সেন পুলিসকে বলছিলেন আপনি এখানে নেই। কারণ আজ আপনার নাইট ডিউটি নেই। কিন্তু ওরা নাকি আপনার বাড়িতে খবর নিয়েছে। বাড়িতে বললে, আপনি নাকি এখানে।"

"পুলিস!" লাহিড়ীর মুখ শুকিয়ে গেল।

"হ্যাঁ। ওরা মিস্টার সেনের ঘরে বসে আছে।"

"ও, আচ্ছা, যাচ্ছি—।" এটাচি কেস হাতে নিয়ে উঠে পড়লো লাহিড়ী। সহকর্মীরা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? সে বললে, কি জানি কি ব্যাপার। দেখে আসি একবার।

বেরিয়ে এসে কিন্তু সেনের ঘরে ঢুকলো না লাহিড়ী। সোজা রাস্তায় নেমে এলো।

গলিটা পেরিয়ে এসে বড়ো রাস্তায় পড়তেই একটি বাস পেয়ে গেল। তাতে উঠে পড়লো সে।

চৌরঙ্গি পেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আসতেই সে বাস থেকে নেমে পড়লো। তার পর হাঁটতে লাগলো পার্ক স্ট্রীট ধরে। এখন চার দিক নির্জন। কোনো ফাঁকা জায়গায় একটা ডাস্টবিন পেলেই হয়।

অনেকটা পথ হেঁটে তার পর ডাইনে ক্যামাক স্ট্রীটে ঢুকলো। চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ। একটু এগুতেই একটি ডাস্টবিন। কাছাকাছি এসে যেই এটাচি কেসটি ফেলতে যাবে এমন সময় দেখলো ডাইনের গলির ভেতর থেকে একটি পুলিস-ভ্যান বেরোচ্ছে।

মনে পড়লো, আজকাল একটু বেশী রাত্তিরে ফাঁকা জায়গায় কোনো ভদ্রবেশী কাউকে ডাস্টবিনে কিছু ফেলতে দেখলে পুলিসেরা খুশী হয় না। কয়েক দিন আগে কোথায় যেন কা'কে হাতে-নাতে ধরেছে একটি নবজাত শিশুর মৃতদেহ সুদ্ধ।

সে তাড়াতাড়ি হেঁটে চললো। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়লো,—তাই তো, কেন পাগলের মতো ঘুরে মরছে সে। তার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রশান্ত দাসগুপ্ত, আবগারী বিভাগের বড়ো অফিসার। তাকে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেই হয়।

সে থাকতো বেক্‌বাগানে। ধুঁকতে ধুঁকতে তার বাড়ি এসে উপস্থিত হোলো লাহিড়ী। তখন বারোটা প্রায় বাজে। বাড়িতে থাকতো প্রশান্ত, তার ছোটো ভাই, আর একটি চাকর। ছোটো ভাই দরজা খুলে দিলো। এত রাত্তিরে লাহিড়ীকে দেখে সে অবাক !

বললে, "দাদা তো বাড়ি নেই। কি একটা জরুরী কেসে বেরিয়েছে সেই সন্ধ্যেবেলা।"

"যাই হোক, ফিরবে তো ! আমার খুব দরকার," বলে লাহিড়ী বসবার ঘরে গিয়ে বসে পড়লো।

প্রশান্ত যখন বাড়ি ফিরলো তখন রাত প্রায় একটা। লাহিড়ীকে দেখে সে-ও অবাক হোলো, জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এত রাত্তিরে ?"

"ভাই, খুব জরুরী দরকার আছে তোমার সঙ্গে। কতক্ষণ বসে আছি তোমার জন্যে।"

"হ্যাঁ, বড্ডো দেরী হয়ে গেল। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ওদিকে চোরাই আপিঙের বেশ একটি বড়ো চালান ধরা পড়লো। সেই ব্যাপারেই বেরিয়েছিলাম," প্রশান্ত উত্তর দিলো।

"বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ওদিকে ?" লাহিড়ীর মুখ শুকিয়ে গেল।

"হ্যা, একটি চীনেম্যানের রেস্তরাঁয়।"—

"এ্যাঁ—," চমকে উঠলো লাহিড়ী।

"কেন কি হয়েছে ?" প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলো।

লাহিড়ী তখন সব খুলে বললো প্রশান্তকে।

"শু-শিউ-চুয়ান'এর রেস্তরাঁয় ?"—প্রশান্ত সব শুনে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা। কেন ?" ঢোক গিলে লাহিড়ী বললো।

"তা হলে তুমিই সেই ?" জিজ্ঞেস করলো প্রশান্ত।

"আমিই সেই মানে ?"

প্রশান্ত হাসতে সুরু করলো। হাসতে হাসতে বললো, "এটাচি কেসটি একবার খুলে দেখে নিতেও পারলে না ?"

"ভয়ে খুলিনি—," উত্তর দিলো লাহিড়ী।

"আচ্ছা, এবার খুলে দেখ তো ?"

লাহিড়ী আস্তে আস্তে এটাচি কেসটি খুললো। তার ভেতরে চারটে কাগজের বাক্স ঠাসাঠাসি করে রাখা। প্রত্যেকটি খুলে দেখলো লাহিড়ী। প্রত্যেকটির ভিতর সন্দেশ।

"বুঝলে রঞ্জন, প্রত্যেকটির ভিতর সন্দেশ," বলে যোগীন্দর সিং আবার হাসতে সুরু করলো।

"সন্দেশ ?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "লাহিড়ীর সঙ্গে রসিকতা করছিলো নাকি কেউ ?"

যোগীন্দর বিয়ার খেলো দু' তিন চুমুক। তারপর উত্তর দিলো, "না। কেউ রসিকতা করেনি। কলকাতার দু'জন নামজাদা স্মাগলারের একটি প্যাঁচ ছিলো এর মধ্যে।"

"কি রকম ?"

"বুঝলে না ? শু-শিউ-চুয়াদের দোকানে ওই দু'জন লোকের দেখা

হওয়ার কথা ছিলো আরেক জনের সঙ্গে, যার হাত দিয়ে কিছু আফিং পাচার করে দেওয়ার কথা। ওই দু'জনের একজন বাঙালী, আরেকজন চীনেম্যান। যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিলো সেও বাঙালী, কিন্তু এদের কি রকম যেন সন্দেহ হয়েছিলো যে আবগারির লোকেরা এই খবরটা পেয়েছে এবং নজর রাখছে দোকানটির উপর। তখন আর অন্য লোকটিকে খবর দিয়ে অন্য জায়গায় দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করার সময় ছিলো না তাই এরা ভাবলো, আবগারির লোকের চোখে ধুলো দিতে হবে। যে রকম এটাচি কেসে ওদের আফিং পাচার করে দেওয়ার কথা, সে রকম আরেকটি এটাচি কেসে সন্দেশ ভরে সেটি সেখানে নিয়ে গেল, তাদেরই দলের একজনকে দেওয়ার জন্যে, যাতে আবগারির লোক তারই পিছু নিয়ে বেরিয়ে চলে যায় সেখান থেকে, আর যথাসময়ে আসল লোকটি এলে তার হাতে আসল মালটি নিরাপদে দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কোনো কারণে প্রথম লোকটি সময় মতো এসে পৌছুতে পারলো না। এদেরও আর দেরি করবার সময় ছিলো না। লাহিড়ীকে দেখে ওরা বুঝে নিলো যে সে ভালোমানুষ। এ পাড়ার খবর সে বেশী রাখে না। তাই একটু ঝুঁকি নিয়ে তারই কাছে সন্দেশভর্তি এটাচি কেসটা রেখে সরে পড়লো। দূরে কোথাও যায় নি, কাছেই আরেক জায়গায় বসে লক্ষ্য করছিলো। যখন দেখলো যে লাহিড়ী বেরিয়ে গেল, আর তার পিছু নিলো আরেক জন লোক, লাহিড়ী রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি নিতে সেও ট্যাক্সিতে চাপলো—তখন পথ পরিষ্কার ভেবে ওরা ফিরে এলো শিউ-চুয়ানের দোকানে। তার পর আসল লোক এসে পৌছুতে তার হাতে তুলে দিলো আপিং-ভর্তি এটাচি কেসটি।"

"তুমি কি করে জানলে এত সব কথা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"লাহিড়ীর কাছে শুনেছি।"

"সে কি করে জানলো?"

"সে শুনেছে আবগারী বিভাগের সেই অফিসার বন্ধু প্রশান্ত দাশগুপ্তের কাছে।"

"দাশগুপ্তই বা কি করে জানলো?"

"দেখ রঞ্জন," যোগীন্দর উত্তর দিলো, "আবগারী বিভাগের লোকেরা অতো কাঁচা নয়। সহজ কাজ নয় ওদের চোখে ধুলো দেওয়া। ওই স্মাগলার দু'জন যে ট্যাক্সিতে ঘুরছিলো, সেই ট্যাক্সির ড্রাইভার আসলে পুলিসের লোক। সন্দেশ কিনে একটি এটাচি কেসে পুরতে দেখে সে ওদের মতলবটা ঠিক ধরে ফেলেছিলো। আপিং-ভর্তি এটাচি কেসটা ওদের সঙ্গে ছিলো বলে ওদের আগেই ধরা যেতো, কিন্তু সেটা করেনি, যার হাত দিয়ে মালটা পাচার করে দেওয়া হবে তাকেও ধরবে বলে। ড্রাইভার সময় মতো খবর দিয়েছিলো আবগারির লোককে। তাই লাহিড়ী যখন শিউ-চুয়ানের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লো, একজন লোক তার পিছু নিয়েছিলো এদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে, যাতে এরা নিরাপদ মনে করে পরে ফিরে আসে শিউ-চুয়ানের দোকানে। ওরা জানতো না পুলিসের লোক আরো কয়েক জন ছিলো সেই দোকানের আশে-পাশে। সুতরাং আসল তিন জন লোক যখন একত্র হোলো, বামাল-সুদ্ধ ধরে ফেলা হলো ওদের সবাইকে। অফিসার দাশগুপ্ত সেই কেসের ব্যাপারেই অতো রাত অবধি বাইরে ছিলো।"

"আর যে লোকটা লাহিড়ীর পিছু নিয়েছিলো।"

"সে তো লোক-দেখানো। খানিকটা, এই এসপ্লানেড অবধি, ওর পেছন পেছন গিয়ে সে চলে যায় অন্য দিকে।

"আচ্ছা, তা'হ'লে লাহিড়ীর অফিসে এসে পুলিস ওর খোঁজ করেছিলো কেন?"

যোগীন্দর হাসলো। বললো, "সে আরেকটি ব্যাপার। সেই যে গুণ্ডাগুলো লাহিড়ীর কাছ থেকে ওর ঘড়ি, পেন, মানিব্যাগ সব কেড়ে নেয়, সেদিন ওদের মধ্যে কি একটা গণ্ডগোল বাধতে একজন ছুরির ঘায়ে জখম হয়। পুলিস ওর কাছে মানিব্যাগটি পায়। তার মধ্যে লাহিড়ীর নাম লেখা ভিজিটিং কার্ড ছিলো। তাই ওরা গিয়েছিলো লাহিড়ীর খোঁজে।"

যোগীন্দর বলতে বলতে হেসে খুন। বললো, "পুলিসের কাছে পরে লাহিড়ীর কী কাকুতি-মিনতি! ওর টাকা ঘড়ি পেনের দরকার নেই, বাড়িতে

বা অপিসে কেউ যেন জানতে না পারে যে সে ওরকম একটি জায়গায় গিয়েছিলো। একটি অবাঞ্ছিত এটাচি কেস ফেলে আসবার জন্যে যে একজন সুস্থমস্তিষ্ক লোক ওরকম পাড়ায় যাবে, এ-কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। যাই হোক, প্রশান্ত দাশগুপ্তের সাহায্যে সে কোনো রকমে এসব ঝামেলা এড়াতে পেরেছিলো।"

"তা হলে মিথ্যে ভয়েই একটা দিন তার খুব অশান্তিতে কেটেছে," আমি বললাম, "যাই হোক, অনীতা নামে সেই মেয়েটির সঙ্গে লাহিড়ীর মিটমাট হয়ে গিয়েছিলো তো?"

যোগীন্দর একটু হাসলো। কিন্তু অন্য রকম সেই হাসি। বিষণ্ণ, ম্লান।

অনেকক্ষণ কোনো উত্তর না দিয়ে সে বিয়ারের বোতলটি শেষ করলো।

তারপর বললো, "রঞ্জন, আজ দু'বোতল বিয়ার খেয়েই কি আমি একটু মাতাল হলাম, না কি?"

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমায় আরো অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে।" একটু থামলো সে। কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, "না, এ আলোচনা বেশী করে লাভ নেই। লাহিড়ী আমার বন্ধু। ও আর অনীতা এখন বিয়ে করে খুব সুখে সংসার করছে। অনীতার সঙ্গে আমার আগেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো লাহিড়ী। হঠাৎ দেখি, অনীতা আমার সঙ্গে খুব আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। আমি ভাবলাম, লাহিড়ী যদি অনীতাকে সামলে রাখতে না পারে সে আমার দোষ নয়। দিস ইজ এ ফ্রী কানট্রি। অনীতা যদি আমার সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে চায়, কার কি বলার আছে? ইফ উই হ্যাভ সাম ফান টুগেদার, ভালোই তো। আর জানোই তো আমরা এমনিতেই বাঙালী মেয়েদের খুব এডমায়ার করি। ক'দিন বেশ কাটলো। একদিন দেখ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের ওখানে ওরা হাত ধরাধরি করে বসে আছে। অনীতার গলা খুব ভারী, যেন একটু কেঁদেছে খানিক আগে। বলছিলো, তুমি আমায় আগে কেন বলোনি, কেন খুলে বলো নি।—এই এরকম সব মিষ্টি-মিষ্টি কথা। যা ওরা বলে থাকে। আমায়

ওরা দেখেনি। আমি সরে গেলাম। হাসি পেলো খুব। কি রকম বোকা, সেন্টিমেণ্ট্যাল, ওরা দু'জন। বাড়ি ফিরে এসে দেখি—এই বেয়ারা, আউর এক বিয়ার লাও—বাড়ি ফিরে এসে দেখি হাসি আর পাচ্ছে না। খুব মন খারাপ মনে হচ্ছে যেন। চুপ করে বসে ভাবলাম, আগে কেন জানতে পারলাম না নিজের মনকে। তারপর ভাবলাম, যাক, ভালোই হয়েছে। আমি পাঞ্জাবী, অনীতা বাঙালী। ওর মা-বাবা তো রাজী হোতো না। তাছাড়া, সে যখন সত্যি সত্যি লাহিড়ীকেই ভালবাসে, তখন আর এ-কথা ভেবে কী লাভ।"

বেয়ারা আরেকটি বিয়ার আনলো। গেলাসে বিয়ার ঢেলে যোগীন্দার আস্তে আস্তে বললো, "লাহিড়ী ওর বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিলো। আমি ধুতি পাঞ্জাবী পরে বিয়ের বরযাত্রীও গিয়েছিলাম। এখনও প্রায়ই যাই ওদের বাড়ি। খুব ভাব ওদের সঙ্গে। ওরাও বেশ সুখে আছে।"

সেই বোতলও আস্তে আস্তে শেষে করলো যোগীন্দর সিং। বললো, "তবে রঞ্জন, আমার এমন কিছু লোকসান হয়নি। তার কিছুদিন পরেই আলাপ হোলো টিং-লিং এর সঙ্গে। ওর ভাই ফেংচেং-শিয়াংএর সঙ্গে আমার কিছু কিছু ব্যবসার লেন-দেন আছে। একদিন ওদের বাড়িতে গিয়েই আলাপ হোলো। টিং-লিং অদ্ভুত মেয়ে," জিভ দিয়ে ওপরের ঠোঁট, নিচের ঠোঁট চেটে নিলো যোগীন্দর সিং, বলে গেল, "জানোই তো, আমি খুব সিরিয়াস টাইপ-এর ছেলে নই। আমি চাই টাকা, আমি চাই ভালো ভালো মেয়ে-বন্ধু, আমি চাই ভালো বিয়ার, ভালো স্কচ্ হুইস্কি—ব্যস, এতেই আমি সুখী। অনীতার জন্যে সব চাইতে ভালো লাহিড়ীরা, যারা ছোটোখাটো চাকরি করবে, ছোটো খাটো ফ্ল্যাটে সুখে ঘর করবে। আমি অন্য রকম। আই ওয়াণ্ট ফান্, ফান্, এ্যাণ্ড নাথিং বাট ফান্।"

যোগীন্দর উঠে দাঁড়ালো।

হাত বাড়িয়ে আমার হাত নিষ্পেষিত করে করমর্দ্দন করলো। বললো, "ওয়েল রঞ্জন। তুমি একটি ফাইন ফেলো। তোমায় আমার বেশ লাগছে। আমি ইতিমধ্যে একদিন টিং-লিংকে নিয়ে বেরোচ্ছি। তুমি আসবে নাকি?

যদি আসো তো আরো একটি মেয়েকে বলবো, সো দ্যাট শী মে কীপ ইউ কাম্পেনি। গিভ মি এ রিং টুমরো, আমি ডেট ফিক্স্‌ করবো। ও-কে, বাই বাই।"

যোগীন্দর সিং যখন চলে গেল, তখন লাইট হাউস বার-এ অনেক মেয়ে-পুরুষের ভীড়, বাইরের পথে অনেক আলো, আর বন্ধ জানলার ওপারে অনেক দূরে নিথর নীল আকাশে লাল-নীল-সবুজ নিয়ন সাইনের ঝাপসা আভাস।

* পাঁচ *

যোগীন্দর যে বলেছিলো চীনে-পাড়ায় জুতো পাওয়া যায় খুব সস্তায়, সে কথা মনে ছিলো। ভাবলাম, শৌখিন দোকানে অর্ডার দিয়ে তৈরী করানো জুতো তো অনেক পরেছি, এবার চীনে পাড়ার জুতো চেষ্টা করে দেখা যাক। যোগীন্দরের পায়ে যে জুতো দেখেছি, সে যদি অতো সস্তা হয় তো নিউ মার্কেট বা কলেজ স্ট্রীট বা ভবানীপুর থেকে জুতো কেনার কোনো মানেই হয় না।

এক দিন জুতোর খোঁজে হাঁটছিলাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে। হঠাৎ দেখি, একটি দোকানে দিলীপ বসে আছে।

আমায় দেখে সে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। রাস্তায় নেমে এ-পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "সিগারেট আছে?"

"হ্যাঁ।"

"দে একটা। তারপর, এদ্দিন তোর দেখা নেই কেন? এখানে কি করছিস?"

আমার বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট অভিযানের কারণ ব্যক্ত করলাম।

"ও, জুতো কিনবি? বেশ তো," বললো দিলীপ, বলে কি যেন ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কতো টাকার মধ্যে চাস?"

"এই টাকা পনেরোর মধ্যে—।"

"দে আমায় পোনেরো টাকা—।"

"আগে জুতো তো পছন্দ করি—।"

"টাকাটা আমায় দে না! আমি তোকে তিরিশ টাকার জুতো পোনেরো টাকায় কিনে দেবো। টাকাটা তোর কাছে থাকলে তোকে এরা পাঁচ টাকার জুতো পোনেরো টাকায় ঠকিয়ে দেবে।

"যোগীন্দর সিং বলছিলো—"

"যোগীন্দরের কথা বিজ্ঞজনেরা ধর্তব্যের বাইরে বলেই মনে করে। ও নিশ্চয়ই তোকে চি-শিউ-চিং'এর দোকান থেকে কিনতে বলেছে। ওই সিংহ-কুল-কলঙ্ক প্রবঞ্চকের কথা বাদ দে। সে শিউ-চিং'এর কাছে কমিশন খায়। ওদের এখনো চিনিস না? কমিশন ছাড়া ওরা মানব জীবনের অন্য কোনো জীবন-দর্শন ভাবতেই পারে না। তুই আয় আমার সঙ্গে। এটি আহ্-তং এর দোকান। এ আমার অনেক দিনের বন্ধু।"

"কোন আহ্-তং, দিলীপ দা? সেই যে সেদিন রাত্তিরে ট্যাংরা গিয়েছিলে এর খোঁজে—"

"হ্যাঁ রে। সে-ই। এর ভাই আহ্-কিম্'র সেদিন মাথা ফেটেছিলো। আয়, ভেতরে আয়। না, না, আগে টাকা পনেরোটা দে। ওদের সামনে দিলে ওরা কি মনে করবে!"

দোকানের ভেতরে উঠে এলাম আমরা দু'জন।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের চীনেম্যানের সাদাসিধে জুতোর দোকান। কোনো রকম সাজসজ্জার বাহার নেই। দিনের বেলা আলো জ্বলছে। এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল পর্যন্ত ঝোলানো দড়িগুলো থেকে ঝুলছে সারি সারি বুট জুতো, ক্যাস্‌য়েল শু, কাবলি আর পামশু। কালো চামড়ার, লাল চামড়ার, লাল-সাদা কম্বিনেশানের, সাদা স্যুয়েডের, কালো স্যুয়েডের, বাদামী স্যুয়েডের। দেওয়ালের দুপাশে দুটো লম্বা বেঞ্চি। ঘরের ভেতর একটি বাচ্চা ছেলে ট্রাইসাইকেল চালাচ্ছে, আর হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে আরো বাচ্চা একটি মেয়ে। ভারী ফরসা, ভারী ফুটফুটে মিষ্টি দেখতে, সোজা সোজা কালো কালো চুল, নাক তো নেই-ই, চোখ দুটোও প্রায় নেই বললেই হয়।

দরজায় বসে এক এদেশী মুসলমান—দোকানদারের এসিস্ট্যাণ্ট। পথের লোকজনকে এক নাগাড়ে ডেকেই চলেছে—এই যে স্যর, কী চাই বলুন না স্যর, প্রায় মাগনা দিচ্ছি স্যর, না লিবেন তো না লিবেন, একবার এসে দেখে লিন। ক্যা মাংতা ভাই সাহাব, আও না জী। আইয়ে, আইয়ে সর্দারজী, বহুত বঢ়িয়া চপ্পল মিলেঙ্গে। হোয়াট মিস্টার? গুড মোকাসিন,

কাম ইন এ্যাণ্ড লুক, দেন বাই, মাগনায় দিচ্ছি স্যর, নিয়ে যান, নিয়ে যান—।"

যতো সোরগোল, সবই কিন্তু বাইরে। দোকানের ভেতর নিস্তব্ধ প্রশান্তি, সুদূর প্রাচ্যের বৌদ্ধ মন্দিরের মতো। কাউন্টারের ওপাশে একজন জুতোয় রং দিচ্ছে। এক কোণে একটি মেয়ে বসে মেশিনে চামড়া সেলাই করছে। কাউন্টারের পেছনে একটি পাতলা পর্দা ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ। আবছা দেখা যায় তার পেছনে একটি মেয়ে কাঠের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

"আহ্-তং! আহ্-তং!" দিলীপ হাঁক ছাড়লো।

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একজন। তার গায়ে ধবধবে ফরসা গেঞ্জি, পরনে ফরসা খাকি হাফপ্যাণ্ট, পায়ে কাঠের খড়ম, কোমরে বাঁধা লংক্লথের আধময়লা এপ্রন? এক হাতে একটি জুতো, অন্য হাতে জুতোর লাস্। পাট করে আঁচড়ানো চুল, ধবধবে ফরসা রং, মুখে সোনালী-ঝিলিক-মারা হাসি।

"আহ্-তং, এ আমার বন্ধু রঞ্জন, জুতো কিনতে এসেছে।"

আহ্-তং হাসি মুখে বেঞ্চিটা দেখিয়ে দিলো।

সে অল্প কথার মানুষ। জিজ্ঞেস করলো পরিষ্কার বাংলাতেই, "কি রকম জুতো চাই?"

"ব্রাউন শু, ড্যুরাটা সোল হলেই ভালো হয়।"

"হ্যাঁ, হবে।" পায়ের দিকে তাকিয়ে মাপটা স্থির করে নিলো সে। তার পর চট করে উপর থেকে দু-তিন জোড়া পেড়ে নিলো।

দু-এক জোড়া পরে দেখতে পায়ের সাইজ মতো পাওয়া গেল।

"কতো দাম?"

"আঠারো টাকা।"

"আঠারো টাকা? কী যে বলো আহ্-তং! আঠারো টাকায় শিউ-চিং তিন জোড়া জুতা দেয়," দিলীপ বললো।

"শিষ্ট-চিং পিচবোর্ডের জুতো দেয়; আহ্-তং দেয় না। তুমি চায় তো আমি আঠারো টাকায় আঠারো জোড়া পিচবোর্ডের জুতো দেবে। চামড়ার জুতো হলে আঠারো টাকায় এক জোড়া।"

"আহ্-তং, রঞ্জন আমার বন্ধু।"

"দিলীপ বাবু, বিজনেস ইজ বিজনেস।"

"না, আহ্-তং, এ জুতো পাঁচ টাকা জোড়া।"

"বাবু কী বলছি! হিঃ হিঃ—" হাসলো আহ্-তং, "আচ্ছা, বাবুর বন্ধু, তাই পনেরো টাকা।"

"না, পাঁচ টাকা।"

আমি দিলীপকে আস্তে আস্তে বললাম, "দিলীপ দা, ফর ফিফটিন, এটা খুব চীপ।"

"শাট আপ," বললো দিলীপ, "আহ্-তং, তুমি আমার ফ্রেণ্ড। রঞ্জন আমার ফ্রেণ্ড। তাই এ জুতো ছ'টাকা।"

"না বাবু, তেরো টাকার কমে হবে না।"

"সাত টাকার বেশী এক পয়সাও দেবো না।"

"আচ্ছা, বারো টাকা দিয়ে দিন।"

"আহ্-তং, তোমার জন্য আট টাকা। ব্যস।"

"আমার প্রফিট কোথায় বাবু?"

"কেন, পাঁচ টাকা কস্ট, তিন টাকা প্রফিট—।"

"আচ্ছা, আট আনা পয়সা বেশি দিন—।"

"ঠিক আছে", আমি বললাম। আট টাকা আট আনায় এ জুতো, ভাবাই যায় না।

দিলীপ একবার আমার দিকে তাকালো। তারপর পকেট থেকে বার করলো দশ টাকার নোট। ভাঙতিটা ফেরত নিয়ে আবার নিজের পকেটেই পুরলো।

তার পর আমার মুখের ভাব দেখে বললে, "তুই তো পোনেরো টাকা খরচা করবার জন্যে রাজী ছিলি। এ টাকাটা আমার কমিশন হয় তা'হলে। তবে

তুই আমার ভায়ের মতো। তোর কাছ থেকে মার্জিন মেরে কী হবে। এ টাকা ধার বলেই নিলাম, পরে ফেরত পাবি।"

আহ্-তং জুতো-জোড়া আরেকজন অল্পবয়েসী চীনের হাতে দিলো। সে একজোড়া স্কতলি আর আঠার বোতল নিয়ে বসলো।

আহ্-তং বললো, "দিলীপ বাবু, তোমার বন্ধু চা খাবে?"

"আলবৎ খাবে। আমিও খাবো।"

আহ্-তং চীনা ভাষায় পর্দার অন্তরালবর্তিনীকে কি যেন বললো! দেখলাম অন্তরালবর্তিনী এক কোণে একটি ষ্টোভের উপর একটি কেতলি চাপিয়ে দিলো।

আহ্-তং একবার ভেতরে যেতে আমি দিলীপকে বললাম, "কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর! এরা খুব খাটে, না?"

"হ্যাঁ। খুব। সারা দিন খাটে," দিলীপ উত্তর দিলে, "এখন তো দেখছিস গেঞ্জি আর হাফপ্যাণ্ট পরে বসে আছে। সন্ধ্যের পর দেখবি শার্কস্কিনের প্যাণ্ট আর নাইলনের হাওয়াইআন শার্ট পরে মেট্রোতে সিনেমা দেখছে।"

আহ্-তং জুতোর কালি আর বুরুশ নিয়ে বেরিয়ে এলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ভাই এখন কেমন আছে, আহ্-তং?"

আহ্-তং একবার আমার দিকে, একবার দিলীপের দিকে তাকালো।

দিলীপ বললো, "ও সেদিন ওয়াংদের ওখানে ছিলো।"

আহ্-তং বললো, "আমার ভাই ভালোই আছে। ও আসবে একটু পরে। তুমি ওয়াংদের চেনো নাকি?"

"আলাপ হয়েছে সেদিন।"

"ওরা খুব ভালো লোক। বুড়ো ওয়াংকে দেখেছো?"

"না, ওকে দেখিনি—।"

"একদিন ওকে দেখে এসো। খুব ভালো লোক। অনেক জানে। অনেক দেখেছে। ওরও দিন ছিলো।"

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো আরেকজন তরুণ চীনে। পরনে হাফশার্ট আর প্যাণ্ট। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

দিলীপ আলাপ করিয়ে দিলো। আহ্-তং'এর ভাই আহ্-কিম!

আমি বাংলায় কথা বলতে সে ইংরেজিতে বললো, "আমি বাংলা বুঝি কিন্তু বলতে পারি না। আমাদের মধ্যে শুধু 'দাই-কো' বাংলা জানে।"

এমন সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ট্রাউজার আর জ্যাকেট-পরা চীনে মহিলা। অতি সাধারণ চেহারা, গেরস্থঘরের মেয়েদের মতো স্নিগ্ধ।

আহ্-কিম বললো, "আমার দাই-সাও।" অর্থাৎ বড়বৌদি।

আহ্-তংএর বৌ আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমরাও একটু হাসলাম। আমাদের চা দিয়ে সে ভেতরে চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে দেখি, ঠিক বাঙালী বাড়ির চা,—দুধ, চিনি মেশানো। শুধু একটু বেশী পাতলা।

"দেশের কি খবর," আহ্-কিমকে জিজ্ঞেস করলাম।

"বেশ ভালোই," আহ্-কিম উত্তর দিলো, "যুদ্ধ চলছে, কিন্তু খবর ভালোই।" উত্তর দিতে গিয়ে আহ্-কিমের মুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো।

"রঞ্জনের খুব আগ্রহ তোমাদের সম্বন্ধে জানবার জন্যে," দিলীপ বললো।

"জানবার বেশী কিছু নেই," আহ্-তং হেসে বললো, "সারা দিন খাটি, আঠারো টাকার জুতো আট টাকায় বেচি, আর যা কামাই তাতেই খুশি হয়ে দিন চালাই। এমনি চলছে, এমনিই চলবে।"

"জানবার অনেক আছে," আহ্-কিম বললো, "আমার একটি লণ্ড্রি আছে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের ওদিকে। ওয়াং'দের মেয়ে মিনি আমার দোকান দেখা-শোনা করে। সে খুব ভালো মেয়ে। তবে আমার দাই সাওর মতো অতো ভালো এখনো হয়ে উঠতে পারেনি। পরে হবে।"

আহ্-কিম আর আহ্-তং দু-জন দুজনের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে জোরে হাসলো। আহ্-তং তাদের ভাষায় চেঁচিয়ে কি যেন বললো পর্দার ওপারে তার বৌকে। তার বৌয়ের হাসি শোনা গেল।

আহ্‌-কিম বললো, "আমার দাই-কোর তিনটি ছেলে।"

আহ্‌-তং বললো, "আরো একটি শীগগিরই হবে।"

দু-ভাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আরো জোরে জোরে হাসলো।

আহ্‌-তং আমার দিকে ফিরে বললো, "এর বেশী জানাবার নেই।"

আহ্‌-কিম বললো, "এমনি করে আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটু একটু করে জানলে আমাদের সবার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবে।"

দিলীপ বললো, "সে দিন রঞ্জনকে ফেং-সুং-তাও আর জু-শী'র গল্প বলছিলাম।"

আহ্‌-কিম উত্তর দিলো, "ওদের সম্বন্ধে বলে কি হবে? ফেং-সুং-তাও' এর ছেলে ফেং-পাও-হুংএর কথা বলো, যাকে ফুকিয়েন প্রদেশের লোক এখনো ভোলেনি। Ah, what a man! ছেলেবেলায় তার আত্মীয়রা তাকে কলকাতা থেকে নিয়ে গেল ব্যাংককে। সেখানেই বড়ো হলো সে। তারপর তার কী নাম-ডাক। তিরাশী খান জাঙ্কের মালিক। দক্ষিণ চীন সমুদ্রের জাহাজের কাপ্তেনরা তার নাম শুনলে থর্‌থর করে কাঁপতো। আময়, ফুকিয়েনের সমুদ্রতীরের লোকেরা তাকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার চাইতেও বেশী মানতো। আর তেমনি ছিলো তার ছেলে ফেং-চিয়েন-চুং। বাপে ছেলেতে মিলে বিদেশী শোষকদের কতো জাহাজ লুঠ করেছে ওরা। কিন্তু দেশের লোকের কোনো ক্ষতি কোনো দিন করেনি। আর সম্রাটের লোকেরা বিদেশী শোষকদের প্ররোচনায় বার বার তাদের ধরতে চেয়েছে, বিদেশীদের হাতে ধরিয়া দিতে চেয়েছে। ১৮৩৮এ ক্যান্টনের দক্ষিণে এক ওলন্দাজ জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় ওদের কামানের গোলায় ডুবে যায় চিয়েন-চুং এর জাঙ্ক। সে সাঁতরে তীরে গিয়ে ওঠে। আর বিদেশীদের কুকুর ক্যান্টনের শাসনকর্তার লোকেরা তাকে গ্রেপ্তার করে কোতল করে, কোনো বিচার না করেই।"

বলতে বলতে লাল হয়ে উঠলো আহ্‌-কিমের মুখ। সে বলে গেল না থেমেই, "কিন্তু বছর দুয়েক পর ১৮৪০ এ যখন ওপিয়াম ওয়ার বাধলো, বাপ

তার প্রতিহিংসা ভুলে গেল। তখন দেশ বড়ো। সে তার জাঙ্কের বহর নিয়ে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বৃটিশ জাহাজ আক্রমণ করে বেড়াতে লাগলো। তারপর একদিন যুদ্ধের সময় এক বৃটিশ জাহাজের কামানের গোলার ঘায়ে সে মারা যায়। সে খবর যেদিন সমুদ্রতীরের প্রদেশগুলোর লোকেরা শোনে, সবাই চোখের জল ফেলেছিলো তার জন্যে। এই ফেং-পাও-হুংকেই বিদেশী বর্বরেরা নাম দিয়েছিলো the terror of the China seas."

"সে কোনোদিন কলকাতায় আসে নি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি যদ্দুর জানি আসে নি," উত্তর দিলো আহ-কিম। "কিন্তু সে মারা যাওয়ার পর তার ছোটো ছেলে ফেং-চি-আও কলকাতায় চলে এসেছিলো, কারণ তাকে ধরতে পারলে চীন সরকার তাকেও কোতল করতো। তার তখন খুব অল্প বয়েস। বছর বারো এরকম হবে। সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য শহরগুলিও তার পক্ষে নিরাপদ ছিলো না। কারণ সে সব জায়গায় তার বাবার অনেক শত্রু। তাই তার বাবার বন্ধুরা তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। এখানে ওদের কিছু আত্মীয়-স্বজন ছিলো।"

"সে-ও কি পরে বাপের মতো হয়েছিলো নাকি?"

"না," বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়লো আহ-কিম, "সে ছিলো এক বিখ্যাত বারাঙ্গনার রাঁধুনী।"

"কার জানো?" দিলীপ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "আমেলিয়া বিবির, যার গল্প সেদিন করছিলাম—।"

"যার নামে বিবি আমেলিয়া লেন," বলে গেল আহ্-কিম, "সেই বিবি আমেলিয়ার রাঁধুনী ছিলো ফেং-চি-আও। আমেলিয়া বিবি চীনা খাবার ভীষণ ভালবাসতো। আর খুব ভালো রান্না করতো চি-আও। তাই সে আমেলিয়া বিবির খুব পেয়ারের লোক ছিলো। হ্যাঁ, রান্না করা সে-ও খুব জ্ঞানী লোকের কাজ। কিন্তু ফেং-পাও-হুং'এর ছেলে ফেং-চি-আও কলকাতার এক নামী বিবিজানের পেয়ারের রাঁধুনী, সে ভাবা যায় না।"

"কিন্তু এই চি-আও হোলো ফেং হুং-মিংএর বাবা, সে কথা ভুলে যেও না," মনে করিয়ে দিলো আহ্‌-তং।

"ফেং হুং-মিং কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ফেং হুং-মিং?" আহ্‌-কিম্‌এর মুখ আবার ঝলমল করে উঠলো। "ফেং হুং-মিং ছিলো এই কলকাতার চায়না টাউনের রাজা। সিপাই বিদ্রোহের কিছু পরে জন্মেছিলো সে, মারা গেছে ১৯০২-এ। গত শতাব্দীর শেষ পঁচিশটা বছর সে-ই ছিলো চায়না টাউনের আইন, সে-ই ছিলো আদালত, সেই ছিলো সব। ও রকম লোক আর হবে না।"

আহ্‌-তং বললো, "না হলে ভালো। সবাই হোক শুধু আমার মতো, আমার বৌয়ের মতো, তোমার মতো, এদের মতো। খাটবে, রোজগার করবে, ফুর্তি করবে, বিয়ে করবে, ছেলে-মেয়ে মানুষ করবে, বুড়ো হয়ে সুখে মরবে। ব্যস। এনাফ।"

"হাই-লো। হাই-লো," বললো আহ্‌-কিম। তখন বুঝিনি! পরে দিলীপের মুখে শুনেছিলাম "হাই-লো" মানে "হ্যাঁ, ঠিকই।"

"হাই-লো। হাই-লো," বললো আহ্‌-কিম তার দাই-কো'র কথা শুনে। তার পর বলে গেল আমাদের দিকে ফিরে, "আর মজার কথা কি জানো? হুং-মিংএর বাবা চি-আও ছিলো ইহুদী বারাঙ্গনা আমেলিয়া বিবির রাঁধুনি। আর হুং-মিং ছিলো আমেলিয়ার মেয়ে কলকাতার বিখ্যাত সুন্দরী রেবেকা বিবির—কি বলবো? স্বামী নয়, বিয়ে হয়নি ওদের—রেবেকা বিবির প্রভু। তখনকার দিনে রেবেকা বিবি আর ফেং হুং-মিংই এই অঞ্চল চালাতো। ইংরেজের আইন, ইংরেজের পুলিশ এখানে ঢুকতো না। আর তাকে কী খাতির করতো ইংরেজেরা। সেও ছিলো দক্ষিণ-চীন সমুদ্রের এক দস্যু। তার মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো চীন সরকার। মালয়ে কোন একটা যুদ্ধের সময় ইংরেজদের সাহায্য করে সে তাদের খুব প্রিয়পাত্র হয়! এতো বড়ো একজন ক্রিমিন্যাল আর র‍্যাকেটিয়ার কলকাতায় জন্মায় নি। আপিং, কোকেন ইত্যাদির চোরা ব্যবসায়ে যে

রকম অজস্র টাকা রোজগার করে গেছে, তেমনি অজস্র টাকা দানও করে গেছে।"

"এই হুং-মিং আর রেবেকা বিবির মেয়ে হোলো জুলিয়ানা," দিলীপ আমার দিকে ফিরে বললো, "তবে সে নামে তাকে কেউ চেনে না। কলকাতার রসিক সমাজে তার নাম জুলেখাবাঈ।"

জুলেখাবাঈ! পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কলকাতায় সব চেয়ে নামকরা বাঈজী!

ওরকম ঠুংরি নাকি আজকাল আর কেউ গায় না। বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজা নবাবদের বাড়িতে তো বটেই, লাট বড়লাটের প্রাসাদেও নাকি তার মুজরার আমন্ত্রণ আসতো। পুরোনো দিনে তার রেকর্ডের বিক্রি ছিল খুব, আজ-কাল আর পাওয়া যায় না। নানা রকম কিংবদন্তী ছিলো তার সম্বন্ধে, সাধারণ লোক জানতো না সে কোন জাতের মেয়ে। কেউ বলতো সে কাশ্মীরী, কেউ বলতো সে ইহুদী, কেউ বলতো সে আর্মাণী। তারপর একদিন হঠাৎ সে চলে গেল কলকাতা ছেড়ে। কোথায় গেল কেউ জানলো না।

সেই জুলেখাবাঈ? দিলীপের দিকে তাকালাম। সে একটু হাসলো।

এতক্ষণ তীব্র বেগে আমার নূতন জুতো-জোড়াটা পালিশ করছিলো আহ-তং। সেটা শেষ করে বাক্সে মুড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে-ছেদে আমায় এনে দিলো।

দেখলাম তার মুখ হাসিতে ঝলমলো, কপাল ঘামে চিক-চিক করছে।

* ছয় *

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে একটি বইয়ের দোকানের একপাশে দাঁড়িয়ে একটি নতুন বই উল্টেপাল্টে দেখছিলাম এমন সময় কে একজন পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো, "হ্যালো রঞ্জন!"

ফিরে তাকিয়ে দেখি দেখি জয়প্রকাশ ত্রিবেদী, যার সঙ্গে দিলীপ আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো ওয়াঙদের ওখানে।

সে পরিষ্কার বাংলায় বললো, "তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে ছিলো। দিলীপের কাছে থেকে তোমার ঠিকানাটা নেওয়ার মতলবে ছিলাম, কিন্তু ওর পাত্তাই পাচ্ছি না।"

ফর্সা লম্বা চওড়া চেহারা, নিখুঁত স্যুট-টাইতে একেবারে সায়েবের মতো দেখতে, আচমকা তার মুখে বাংলা শুনে চমকে উঠলাম। তারপর মনে পড়লো, সেদিনও সে বলেছিলা তার মা বাঙালী।

আমি উত্তর দিলাম, "দিলীপ বলছিলো এর মধ্যে একদিন ওয়াঙ-দের ওখানে আবার আড্ডা বসবে আমাদের। উপলক্ষ্যটা বোধ হয় দিলীপের জন্মদিন। সেখানে নিশ্চয়ই দেখা হোতো।"

জয়প্রকাশ হাসলো। বললো, "দিলীপ আর আমি একসঙ্গে বিলেতে ছিলাম। ওখানে দেখতাম বছরে দু-বার তিনবার তার জন্মদিন হোতো। এখানেও কি সে অভ্যেস চালু রেখেছে নাকি?—"

শুনে আমি হেসে ফেললাম।

জয়প্রকাশ বলে গেল, "তবে সেখানেও আর দেখা হোতো না, কারণ আমি কাল চলে যাচ্ছি।"

শুনেছিলাম জয়প্রকাশ ত্রিবেদী এঞ্জিনীয়ার, দিল্লীতে এক ইংলিশ ফার্মে চাকরি করে। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়? দিল্লী?"

"না। অফিস থেকে আমায় ব্যাংককে পাঠাচ্ছে। ব্যাংকক হয়ে তারপর হংকং যেতে হবে।"

"ফিরবে কবে?"

"বছর তিনেকের আগে নয়—।"

জয়প্রকাশ এসে উঠেছিলো সদর-স্ট্রীটের এক হোটেলে। বললো, "চলো, আজ তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খাবে—।"

"না, আমার আরেকটি নেমন্তন্ন আছে," আমি উত্তর দিলাম।

"আচ্ছা, তাহলে পরের বার," বললো জয়প্রকাশ। "কিন্তু—এখন কি তোমার কোনো তাড়া আছে? যদি না থাকে তো এসো কোথাও বসে একটু বিয়ার খাওয়া যাক।"

দুজনে শেরাজেডে গিয়ে বসলাম। বিয়ারে প্রথম চুমুক দিয়ে জয়প্রকাশ বললো, "এদেশে বিয়ারের এত দাম, কিন্তু বিলেতে কী সস্তা। আমি তো জল খেতামই না। আমার তো মনে হয় গভর্ণমেণ্ট যদি বিয়ার সস্তা করে দেয় তাহলে কলকাতার জলের অভাব অনেক কমে যাবে, কারণ আমাদের মতো লোক তখন আর জল ব্যবহারই করবে না। আমার মতে আদর্শ জনকল্যাণ রাষ্ট্র কাকে বলে জানো? যে দেশে জলের কলের মতো প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে একটি বিয়ারের কলও থাকবে। কর্পোরেশান থেকে ফ্রী বিয়ার সাপ্লাই করবে।"

আমি হেসে বললাম, "বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটের গোলমাল হলে সে এখন যেমন জল বন্ধ করে দেয়, তেমনি তখন বিয়ারের কল বন্ধ করে দেবে। তখন কি হবে? জল বন্ধ করলে যদিও বা দু-একদিন সয়, বিয়ার বন্ধ করলে সইবে?"

জয়প্রকাশ আমাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করে উত্তর দিলো, "সে নিয়ে ভেবো না, তখন বাড়িওয়ালা বলে কিছু থাকবে না। তদ্দিনে বাড়িওয়ালা হবে গভর্ণমেণ্ট, তা নইলে প্রত্যেক ভাড়াটেই যে যার নিজের বাড়িওয়ালা হয়ে বসবে।"

বিয়ারের মধুর আবেশে এমনি করে খানিকক্ষণ আদর্শ জনকল্যাণ রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা হোলো, খানিকক্ষণ আদর্শ নারী সম্বন্ধে আলোচনা হোলো,— তারপর আস্তে আস্তে আলোচনা ভেসে এলো নানা দেশের নানারকম বোহেমিয়ান জীবন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুতে। ইউরোপ, আমেরিকা, সুদূর প্রাচ্যের নানা শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে জয়প্রকাশ ত্রিবেদী, নানারকম গল্প শোনালো সে।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি চীনে যাও নি ?"

"একবার গিয়েছিলাম। যুদ্ধের আগে। তখন আমার কুড়ি-একুশ বছর বয়েস।"

"যাই হোক," আমি চললাম, "এই চায়না-টাউন আরেকটি আশ্চর্য পৃথিবী। কত রকম লোক দেখা যায় এখানে !"

"সব রকমই কি দেখা যায় ?" জয়প্রকাশ তৃতীয় বোতলের অর্ডার দিয়ে বললো।

"তা দেখা যায় না। এই যেমন ধরো, গেরুয়া কাপড় পরা সাধু সন্ন্যেসীদের দেখা যায় না— ।"

শুনে জয়প্রকাশ হাসতে সুরু করলো।

"হাসছো কেন ?"

জয়প্রকাশ উত্তর দিলো, "গেরুয়া কাপড় পরা অন্তত একটি সাধু আমি দেখেছি।"

"কলকাতার চায়না-টাউনে ?" আমি চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলাম।

"না, কলকাতায় নয়। আমি যাকে দেখেছি, সে ছিলো শাংহাইতে।" বলতে বলতে উদাস হয়ে এলো জয়প্রকাশের চোখ। সে বলে গেল, "অনেক দিনের কথা। সে এক আশ্চর্য চরিত্র। ভালো সাধু, সত্যি সত্যি মহাপুরুষ, এরকম আমি কিছু কিছু দেখেছি, বদমাইশ সাধু যে দেখিনি তাও নয়, তবে শাংহাইতে যে সাধুজীকে দেখেছি, তাকে ভালো বা খারাপ কোনো পর্যায়েই

আমি ফেলতে পারি না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, সে আমাদের আর দশজনের মতোই সাধারণ সহজ, স্বাভাবিক মানুষ। শুনবে তার গল্প ?"

বয় এসে বোতল খুলে গেলাসে বিয়ার ঢেলে দিলো।

গত বছর, যখন সবে শীত পড়েছে,—জয়প্রকাশ সুরু করলো,—নিউদিল্লীতে কোনো এক মাননীয় মন্ত্রীর বাড়িতে এক পার্টিতে গিয়েছিলাম। তাঁর ভাইঝির বিয়ে। তারই সমারোহ-ভরা গার্ডেন পার্টি। অভিজাত জনতায় জমজমানো। দিল্লীর সমস্ত প্রেস-করেসপণ্ডেন্ট সেখানে জড়ো। প্রেস-ফটোগ্রাফারেরা টুকটুক ফটো তুলে বেড়াচ্ছে। সেখানে এসেছে বড়ো বড়ো পলিটিশিয়ান, মিনিস্টার, সেক্রেটারিয়েটের বড়ো কর্তারা, বিদেশী দূতাবাসের পদস্থ কূটনীতিবিদেরা আর বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা। বৃটিশ হাই-কমিশনের একজন পরিচিত ইংরেজের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছি, এমন সময় কে একজন পেছন থেকে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলো।

ফিরে দেখি—আরে ! সাধুজী ?

তিনি একটু হেসে বললেন, ও নাম আর নয়। আমি এখন······

—এই পর্যন্ত বলে জয়প্রকাশ থামলো। বললো, দেখ রঞ্জন, আসল নামগুলো সব চেপে যাচ্ছি। আর যাই হোক এদের ব্যক্তিগত জীবনের গল্প তো ! তাই প্রত্যেকটি চরিত্রেরই একটি নতুন নাম বানিয়ে বলছি। শোনো—

······তিনি একটু হেসে বললেন, "ও নাম আর নয়। আমি এখন রণদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।"

তাও তো বটে ! আমি ভাবলাম। ইনি তো একজন সুট-দুরস্ত মিস্টার চ্যাটার্জী, যাঁর বিদেশী বেশ ও পরিবেশের পরিবর্তে সেই সাবেক গেরুয়া ধুতি-কোর্তা যদি থাকতো তাহলে তাঁকে শাংহাই-এর সেই ভারতীয় সন্ন্যাসী বলে চিনে উঠতে আমার অতোটা সময় লাগতো না।

আমায় আরো অবাক হতে হলো এর পরের কথাটি শুনে।

তিনি বললেন, "আমার স্ত্রীও এসেছেন। দেখা করবে ওঁর সঙ্গে ?

তোমার সঙ্গে দেখা হোলো অনেক বছর পর। উনি খুব খুশী হবেন তোমায় দেখলে। দাঁড়াও, দেখি উনি কোথায় গেলেন। জাস্ট্ এ মিনিট……।"

উনি ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হতেই রয়টারের রনি দত্ত এসে জিজ্ঞেস করলে, "এর সঙ্গে জমালে কি করে?"

"আমার অনেকদিনের চেনা। আজ হঠাৎ দেখা হোলো। তুমি চেনো নাকি ওঁকে?"

"ওঁকে চিনি না? সেক্রেটারিয়েটের এত বড়ো একজন কর্তা ব্যক্তি। শীগ্‌গিরই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ওয়াশিংটন যাচ্ছেন। ওঁকে চিনবো না? আমি সরে পড়ি, ওই উনি এসে পড়লেন।"

ফিরে তাকিয়ে দেখি মিস্টার রায় তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে করে এদিকে আসছেন। সঙ্গে আরো দুজন কারা যেন।

তাকিয়ে দেখলাম। তেমন কিছু পরিবর্তন দেখলাম না রণদাপ্রসাদ চ্যাটার্জী আর মিসেস চ্যাটার্জীর দুনিয়াকে উপেক্ষা করা পদবিক্ষেপে। ওদের ঠিক এমনই দেখেছিলাম,—গত যুদ্ধের কিছু আগে, শাংহাইতে।

* * * * * *

যুদ্ধ তখনো সুরু হয়নি। সে বোধ হয় ১৯৩৮, আমি সবে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বিলেত যাবো-যাবো ভাবছি। সে সময় কাজের উপলক্ষ্যে তার বাবা চললেন শাংহাই। সঙ্গী পেলাম। অতিথি হলাম ফ্রেঞ্চ কনসেশান্-এ তাঁর এক ব্যবসায়ী-বন্ধুর বাড়ি।

সেখানে একদিন আলাপ হলো কোনো এক পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রের দূতাবাসের একজন জুনিয়ার সেক্রেটারির সঙ্গে। তার নাম—ম্—সে যাই হোক, আমরা তাকে পল্ বলে ডাকতাম। বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশ, যদিও অতোটা দেখায় না। অহর্নিশ হুইস্কি পান এবং শহরের বিদেশী কনসেশানগুলির তরুণীদের সঙ্গে ভাব করে বেড়ানোই তার প্রধান কাজ বলে মনে হোলো। আমি আর পল্ খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম দু-একদিনের মধ্যেই।

শাংহাইর হংকিউ অঞ্চলের একটু এদিকে ছিলো একটি বিদেশী খৃস্টান

মিশন। তার পেছনদিকে পপ্‌লারের ছায়ায় একটি আবছা সরু রাস্তা কিছুদূর নির্জন হয়ে এগিয়ে গিয়ে ক্রমশ জনতা আর দোকানপাট বাড়তে বাড়তে গিয়ে একেবারে বাজারের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। বাজারটা ডাইনে রেখে একটু এগিয়ে গেলেই একটা সাড়ে-বত্রিশভাজা পল্লী, যেখানে সবরকমের সব কিছুই পাওয়া যায়, যেগুলো সব সম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই চাইতে মানা। অনুস্বর-বাহুল্য-জর্জরিত কোলাহলে চীনে লণ্ঠনের আবছা আলো এসে মিশে যায় বিদেশী দুনিয়ার অজানা আবছায়াময়তায়। তীব্র ইলেট্রিক লাইট সে পথে জ্বলতো না। বালব্‌-গুলো চিরকালই ভাঙা—পাটকেল মেরে ভেঙে দেওয়া। যে সব জ্বলতো, সেগুলো সরু পথের দু-পাশে প্রহেলিকাময় বাড়িগুলোর ভিতরে গাঢ়রঙের শেডের আড়ালে।

পল্‌-এর কাছে শুনেছিলাম, দুনিয়া-জোড়া বেআইনী ব্যবসার রাজধানী হোলো এ পাড়াটি।

এই অঞ্চলে শহরের বিদেশীবর্গ পৃষ্টপোষিত একটি বার্‌ ছিলো—যার নাম—ম্‌—মনে করো যার নাম, দি গ্রীন ড্রাগন। একতলায় বার ও নাচের ফ্লোর, দোতলায় ঘণ্টার মেয়াদে ভাড়া দেওয়ার জন্যে রুম, আর পেছনদিকে অন্যান্য দু-একটি ব্যবসা, যেগুলো সর্বসাধারণের সঙ্গে বা অপরিচিত লোকের সঙ্গে চলে না, কিন্তু যার বিস্তৃতি এশিয়া জুড়ে, যার শাখা ছড়িয়ে আছে প্রত্যেকটি প্রধান বন্দরে। দি গ্রীন ড্রাগনের মালিক চাং চি-চাও মার্জিত রুচির লোক, আফিঙের খুচরো বিক্রিতে সে নেই, ওসব চলে না তার সুপরিচিত বার্‌-এ—যেখানে বেশির ভাগ ভদ্রলোকেরাই আসে। তার ব্যবসা পাইকারী,—সেকথা শাংহাইর অনেকে জানলেও কর্তৃপক্ষ জানে না, কারণ কর্তৃপক্ষের অনেকেই তার বাঁধা মক্কেল। এই মদের বার্‌-টি বহুকালের, কোনো এক আমেরিকান এসে এটি প্রথম খুলেছিলো। এখানেই ওয়েটার হয়ে প্রথম আসে চাং চি-চাও, সুদূর উত্তর থেকে সেই অনেককাল আগে, গণবিদ্রোহের প্রথম দিকে, সে দেশে যখন বিপুল দুর্ভিক্ষ। তার বৌ-মেয়েকে কোনো এক রাজপুরুষের বাড়িতে বেচে দিয়ে সে চলে এসেছিলো শাংহাই, শুধু তার একমাত্র বোন শিয়ান-

লান-কে নিয়ে। একে সে প্রাণে ধরে বেচতে পারে নি। সেই আমেরিকানের দি গ্রীন ড্রাগনে সে নিলো ওয়েটারের চাকরি, আর বছর দু-তিন পরে তার বোন শিয়ান-লানের শরীরের জ্যামিতি আরেকটু নিখুঁততর হতেই তাকে পাইয়ে দিলো সিগারেট-পশারিনীর চাকরি। এভাবে শাংহাইতে নতুন করে জীবন সুরু করলো উত্তর-চীনের ক্ষেতমজুর চি-চাও আর তার বোন শিয়ান-লান।

তারপর আস্তে আস্তে কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল ওয়েটার চি-চাও হোলো বার্‌-টেণ্ডার, তারপর ম্যানেজার, তারপর আরো বিশ্বাসভাজন ডান-হাত। তারপর একদিন দেখা গেল সেই আমেরিকান অন্তর্ধান করেছে, আর দি গ্রীন ড্রাগনের মালিক হয়ে বসেছে চাং চি-চাও।

"আর শিয়ান-লান?"

"শিয়ান-লান? তাকে আর সিগারেট বেচতে হোতো না অবশ্যি, কিন্তু গ্রীন ড্রাগনের অভিজাত অভ্যাগতদের কুশল-প্রশ্নে আপ্যায়িত করতে হোতো।"

একটু থেমে পল্‌ বললো, "শিয়ান-লানের জীবনে যবনিকা নেমেছে কিছুদিন আগে। চি-চাও-এর জীবন আজো তার বাঁধা পথে চলেছে।

মনে হোলো একটু যেন ভারী হয়ে এসেছে পল্‌-এর গলা। তবু কোনো বিশেষত্ব আরোপ করলাম না তাতে, কারণ কন্টিনেন্টের লোকেরা এমনিতেই খুব অভিনয়-দক্ষ। গল্পের আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্যে ওরা ঘন ঘন ভাবপ্রবণতায় ছলছলিয়ে উঠতে পারে।

দি গ্রীন ড্রাগনের এক কোণে একটি টেবিলে আমি আর পল্‌ একা। এ-পাশে ও-পাশে অনেকেই আসর জমিয়েছে। বিভিন্ন জাতের পুরুষ,— আমেরিকান, বৃটিশ, ফরাসী, চাইনীজ, ইন্দোনেশিয়ান। কোনো কোনো টেবিলে একজন দুজন করে তীব্র প্রসাধন প্রলেপিতা ইউরেশীয় নারী। কড়া সিগারেট আর এলকোহলের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণে ইংরেজী ভাষায় আন্তর্জাতিক আলাপ, কথাগুলো মাঝে মাঝে জড়িয়ে জড়িয়ে আসা। কথাগুলোর বেশির ভাগই অভিধানের বাইরে থেকে সংগ্রহ

করা। অনেকেই পল্-এর পরিচিত। কখনো কখনো একে ওকে নস্ত করছিলো সে। চাং চি-চাও একটি দামী সিল্কের গাউন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। তাকে ডেকে পল্ আলাপ করিয়ে দিলো আমার সঙ্গে। চৈনিক বিনয়ের পরিপূর্ণতায় কথায় কথায় বাও করলো চি-চাও।

পল্ কথা বলে যাচ্ছিলো আর কথাগুলো খানিকটা শুনে খানিকটা না শুনে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম এই জনতাকে। নতুন এমন কিছু নয়, সুদূর প্রাচ্যের যে কোনো প্রধান বন্দর বা ব্যবসাকেন্দ্রে এই জনতাকে খুঁজে পাওয়া যায়,—রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ব্যাটাভিয়া, সাইগন, ব্যাংকক, হংকং, ম্যানিলা, সব জায়গাতেই জীবনের এদিকটা একেবারে একই ছাঁচে ঢালা, পয়ার ছন্দের কবিতার মতো মিস্টি, অমিত্রাক্ষর গদ্যকবিতার মতো হাল্কা। তবু যেন সন্ত্রস্ত অনিশ্চয়তার ছায়া নেমেছে শাংহাই-এর জীবনে। মাঞ্চুরিয়ায় তখন যুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠেছে, সংঘর্ষ চলেছে এই মহাদেশের অন্যান্য প্রান্তে, আর ক্রমশ গুরুতর হয়ে আসছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। এ শুধু তারই প্রক্ষিপ্ত ছায়া। দূরে কোথায় পুলিসের হুইসল বাজলো,—এমন কিছু নতুন নয় এ অঞ্চলে। দি গ্রীন ড্রাগনের জনতা নির্বিকার।

এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়লো দরজার উপর আর চোখ দুটো স্থির হয়ে গোল হয়ে গেল। যা আমি দেখলাম তা কি আমি সত্যি সত্যিই দেখলাম, না দেখলাম না! মাথাটা ঝাঁকালাম। হুইস্কি কি আমায় বেসামাল করেছে? না তো। স্প্রিং-এর দরজা ঠেলে যিনি ভেতরে এসে ঢুকলেন তিনি একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী। দীর্ঘ কান্তি। সুপুরুষ চেহারা। উদ্ধত দৃষ্টি—একটা মুরুব্বিয়ানার স্নিগ্ধতা আছে তাতে। দু-চোখে ধূসর ছায়া নেমেছে—দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের নয়তো বা বিপুল দুশ্চিন্তার প্রক্ষিপ্ত পরিচিতি।

তিনি আমাদের দিকেই এগিয়ে এলেন। পল্ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করলো। তারপর আলাপ করিয়ে দিলে আমার সঙ্গে। তাঁর নামটা আর বলবো না, এই গল্পে তাঁকে সাধুজী বলেই অভিহিত করবো।

পল আমায় বললে, "ইনি আমেরিকা থেকে এসে এখন কয়েকদিনের জন্যে শাংহাইতে আছেন।"

সাধুজী হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমিও করলাম। আমায় কিছু বললেন না। একটি কন্টিনেন্ট্যাল ভাষায় পল্-এর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করে আরেকটি টেবিলে গিয়ে বসলেন।

আমি কোনো কথাই বুঝলাম না।

পল্ তখন আমায় বললে, "ও তোমায় দেখে খুব খুশী হয়নি, জয়প্রকাশ।"

"কেন," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পল্ হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

তারপর একসময় মুখ ফিরিয়ে চক্ষুস্থির করে আমি দেখি সাধুজী রাম্ আর সোডা মিশিয়ে প্রথম চুমুক দিয়েছেন গেলাসে। আমায় তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি ভুরু কুঞ্চিত করলেন। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

মিনিট পোনেরো পরে ফিরে তাকিয়ে দেখি তিনি আর সেখানে নেই।

পল্ ভুরু আন্দোলিত করে বুঝিয়ে দিয়ে সাধুজী ওপর তলায়। তারপর গম্ভীর হয়ে বললো, "জয়প্রকাশ, সাধুজীকে ভুল বুঝো না। তুমি যা ভাবছো, ঠিক তা নয়। আমি ওঁকে অনেকদিন ধরে জানি। ওরকম দৃঢ় চরিত্রের লোক খুব কমই আমি দেখেছি আজ পর্যন্ত।" একটু চুপ করে থেকে অস্ফুট সাড়ায় বললে, "তবে ইদানিং তিনি আরো দৃঢ়তর চরিত্রের লোকের পাল্লায় পড়েছেন।"

আবহাওয়া সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলো পল্। আমি একটি সিগার ধরালাম।

পল্ উঠে দাঁড়ালো। বললে, "চলো, তোমায় দেখিয়ে আনি।"

"কি দেখাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হাত দুটো উল্টিয়ে প্রসারিত করে পল্ বললো, প্রায় শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষায়, "জীবনটা একটা রঙ্গমঞ্চ। কতো বিচিত্র অভিনয় হয় এখানে, কতো বিভিন্ন পুরুষ আর নারী এখানে আসে, আবার চলে যায়। তাদের উপর মমতা কোরো না, শুধু দেখে যাও, আর প্রয়োজন হলে হাততালি দিও।

চলো, তোমায় তেমনই একটি নাটকের দৃশ্য দেখিয়ে আনি। শুধু একটি দৃশ্য। বাদবাকিটা আমার মুখেই শুনতে হবে। কারণ, তুমি চলে যাবে শীগ্‌গিরই। শেষ দৃশ্যটা দেখে চোখের জল ফেলবার সুযোগ তোমার নাও হতে পারে। তাই চলো, আগে থেকে তার আভাস দিইয়ে আনি।"

পল একটু নাটুকে ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালো।

বার-এর পেছন দিক থেকে একটি সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়, তারপর তেতলায়। সেটা চাং চি-চাওএর ঘর। সেখানেই থাকে সে। পল্‌-এর পেছনে পেছনে উঠে এলাম। সঙ্গে এলো চি-চাও। পল্‌ ওকে বললে, "এসো, মিস্টার ত্রিবেদীকে তোমার ভাগ্নীকে দেখিয়ে আনি। তোমার আপত্তি নেই তো মিস্টার চাং?"

"নিশ্চয়ই না," বললো চাং চি-চাও, "আমার সঙ্গেই চলুন।—আসুন," আমার দিকে ফিরে বললে।

উপরে উঠে দেখি একটি প্রশস্ত উপবেশন কক্ষ। দরজার সামনেই একটি প্রশস্ত ল্যাকরে-স্ক্রীন, চীনে ড্রাগন আর নানারকম ফুল লতা পাতার ডিজাইনে কালো গালার উপর সোনালী রঙের কাজ করা। সেটা পেরিয়ে গিয়ে দেখি কিছু চীনে, কিছু বিদেশী আসবাবে ঠাসাঠাসি ঘরখানি। আমাদের বসিয়ে চি-চাও ডাকলো, "লিলি, লিলি—," তারপর অনুস্বর বিসর্গ দিয়ে বললে বাদবাকিটুকু।

লিলি বেরিয়ে এলো। একটি আট বছরের মেয়ে, কালো স্ল্যাক্‌স্‌ আর লাল উলের জাম্পার পরা। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, চীনে মেয়ের চোখে-মুখে চৈনিকত্ব নেই। আয়ত চোখ, টানা ভুরু, গোলাপী-ফর্সা রং, ঢেউ খেলানো কালো চুল। সে এসে হাঁটু মুড়ে আমাদের ক্যর্টসি করলে।

"এই পুওর মেয়েটি," চাং চি-চাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমায় বললে, "আমার স্বর্গীয় বোন শিয়ান-লান্‌-এর একমাত্র সন্তান। এখন আমার সঙ্গেই আছে।"

"একে দেখে তো চীনে মেয়ে মনে হয় না," আমি বললাম।

"এর বাবা ভারতীয়। নাম, এ-কে বোস। এখানে এক হাসপাতালে ডাক্তার ছিলেন। মারা গেছেন কয়েক মাস আগে। এর মা-ও মারা গেছেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।" চাং আবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো।

ততক্ষণে লিলি পল্-এর কোলে উঠে ওর গলা জড়িয়ে ধরেছে। চেনা-শোনা অনেক দিনের। পল একটু আদর করলো লিলিকে। তার চোখ ছলছলো। সেন্টিমেণ্ট্যাল জাত এই কণ্টিনেণ্ট্যালেরা।

যে-ঘর থেকে লিলি বেরিয়ে এসেছিলো সে-ঘরের দরজায় ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে ছিলো আরেকজন। সে ডেকে বললে, "এদিকে এসো লিলি। আমি এক্ষুনি যাবো। এসো, তোমার নতুন বাইবেলটিতে তোমার নাম লিখে দি।"

মহিলার গলা। আমরা চোখ তুলে তাকালাম। পল তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলো। তিনি ঘরের ভিতর এগিয়ে এলেন।

পল্ বললো, "এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ আমার ভারতীয় বন্ধু জয়প্রকাশ ত্রিবেদী। এখানে বেড়াতে এসেছে কয়েকদিনের জন্যে।—আর ইনি হলেন……," বলে আমায় ওর নামটি বললো। শুনলাম উনি ওখানকার এক খৃস্টান মিশন-হাউসের অধ্যক্ষ এবং একজন বিখ্যাত মিশনারী।

তাঁর আসল নামটিও চাপা থাক। এ গল্পে তাঁকে আমরা মিস পার্কার বলে অভিহিত করবো।

মিস পার্কার আমার অভিবাদন ফিরিয়ে দিলেন। তাকিয়ে দেখলাম তাঁকে। নিরাড়ম্বর সাদা পোশাক, বরফের মতো শুভ্র হাত আর মুখ। বয়েস হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। বয়েস মনে হোলো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। একটা শান্ত সমাহিত, সৌম্যতা তাঁর মুখখানি ভরে আছে সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ পরিপূর্ণতায়। নিখুঁত হাতের গড়ন, দেখলেই বোঝা যায় খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে।

তিনি চলে গেলেন একটু পরেই। আমি আর পল্ থেকে গেলাম চাং-এর ড্রিংক-এর আমন্ত্রণে। আমি দু-একটা প্রশ্ন করতেই পল বললে, "এখন কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। পরে সব বলবো।"

মিনিট পনেরো পরে সাধুজীও এসে উপস্থিত। দু-চার কথা বলে লিলিকে ডেকে আদর করে একজন ভারতীয় সাধক মহাপুরুষের ছবি উপহার দিয়ে তিনিও চলে গেলেন অল্পক্ষণ পরেই।

আরেক রাউণ্ড শেষ করে আমি আর পল উঠে পড়লাম।

দোতলায় নেমে এসে সে বললে, "এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কী হবে? এসো, একটু জিরিয়ে নিয়ে শরীরটাকে টাটকা করে নেওয়া যাক।" কাছে একজন দাঁড়িয়ে ছিলো। তাকে ডেকে একটি রুম চাইলো আধঘণ্টার জন্যে।

সে পল্-এর দিকে তাকালো, আমার দিকে তাকালো, তারপর যেন একটু অবাক হোলো।

"শুধু রুম?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"একটু নিরিবিলি বসে ড্রিংক করতে চাই," উত্তর দিলো পল।

সে ব্যবস্থা করে দিলো। পল ওর কানে কানে কি যেন বললো। ঘাড় নাড়লো সে। তারপর আমাদের নিয়ে একটি ঘর দেখিয়ে দিলো।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো পল। ঘরগুলোর মাঝখানে-মাঝখানে কাঠের পার্টিশান। এ-ঘরের কথা ও-ঘরে শোনা যায় একটু চেষ্টা করলেই। পাশের ঘর থেকে অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে এলো ইংরেজী ভাষায়। পল ঠোঁটে আঙুল চেপে আমায় চুপ করে থাকবার ইসারা জানালো।

সে কান পাতলো পার্টিশানের গায়ে। আমিও শুনলাম। একটি ফাঁক চোখে পড়লো কাঠের তক্তার জোড়নের মাঝখানে। তাতে চোখ রেখে দেখি,—একি!

সাধুজীর বুকে মুখ রেখে সেই বিখ্যাত মিশনারী মহিলা মিস পার্কার চোখের জলে ভাসছে। আর সাধুজী তার পিঠের উপর দিয়ে দু হাত ভাঁজ করে পরে তাকে বুকে চেপে ধরে তার চুলে গাল রেখে খুব আস্তে আস্তে বলছে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা।

কোনো উত্তর দিচ্ছে না মিস পার্কার। তার শুধু চোখের জলের ফোয়ারা!

একটু পরে সাধুজী তাকে একটি মধুরতম অনুরোধ জানালো।

মুখটা একটু তুললো মিস পার্কার।

সাধুজীর মুখটা নামলো।

একটু পরে সাধুজীর বুকে মুখ লুকালো মিস পার্কার। তারপর ইংরেজী ভাষা সংস্কৃতে রূপান্তরিত হোলো। গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে সুরু করলেন সাধুজী—দুঃখেষু নিরুদ্বিগ্নমনা সুখেষু চ বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ঃক্রোধ…”

তারপর দিন দুপুরে লাঞ্চের নেমন্তন্ন ছিলো পল্-এর বাড়ি। আমার হাত থেকে টুপিটি নিয়ে ওর চীনে চাকরটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললে, “উনি স্টাডিতে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।”

টেবিলের উপর পা তুলে পল্ একটি কণ্টিনেণ্ট্যাল ভাষায় গান গাইছিলো। তার খুব প্রিয় গান, অনেকবার শুনেছি, মানেও সে বুঝিয়ে দিয়েছে আমায়। হুবহু বাংলায় অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায়,—আমায় একটি চুমু খাও, আমায় একটি চুমু খাও, আমি শুধু চোখ বুজে থাকবো, আমায় একটি দীর্ঘ, দীর্ঘ, দীর্ঘ চু—মু—খা—ও-ও-ও-ও।

পা দুলিয়ে চোখ বুঁজে এই গান গাইছিলো পল্। আমার জুতো শব্দ শুনে চোখ খুললো তারপর আমায় দেখে উঠে এলো। বললো, “লাঞ্চের আগে কি নেবে বলো, একটি ককটেল না ঠাণ্ডা বিয়ার? চলো ও-পাশের বারান্দায় গিয়ে বসি। ওদিকটা বেশ ঠাণ্ডা।”

বেতের চেয়ার মর্মরিয়ে কুশনের কোমলতায় দেহ সমর্পণ করে বিয়ারের নির্লিপ্ত তৃপ্তিতে মন ভাসিয়ে কথা সুরু হোলো।

পল বললে, “আজ একটা অদ্ভুত গল্প তোমায় শোনাবো। তোমার ভালো লাগবে, কারণ গল্পটা সত্যি।”

বারান্দার সামনে একটি মস্তো চিক টাঙানো। তার ভেতর দিয়ে আকাশটা আরো নীল দেখাচ্ছে। চিকের প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু পল্ আগের থেকেই ঠিক করে রেখেছে গল্প বলবে। তাই দিন-দুপুরে উন্মুক্ত

বারান্দায় আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্যে ঠিক অপরিহার্য। বাগানের সুদূর ওপাশে একটি ম্যাগনোলিয়ার চায়ার পাশে ধুচুনি মাথায় দিয়ে নীল পায়জামা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে একটি চীনে কুলি খালি গায়ে মাটি খুঁড়ছে। পল্ টাই-এর নট্ ঢিলে করে দিলো। তারপর একটি লম্বা টার্কিশ সিগারেট ঢোকালো হোল্ডারের মধ্যে। চুলটা সে ভালো করে আঁচড়ায় নি,—কারণ গল্প বলবে সে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় তার চুলটা বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো। গল্প শুনবো আমি। সুতরাং বিয়ারের গ্লাস ঠোঁট থেকে নামিয়ে আমার লাইটারটি এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। ও সুরু করলো।

চাং চি-চাওর বোন শিয়ান-লান, পল্ বললো, একটা অদ্ভুত বরাত নিয়ে জন্মেছিলো। কাল তোমায় ওর প্রথম জীবনের ভূমিকাটুকু বলেছি। তার পরের ধাপে ধাপে তার এগিয়ে চলা ঠিক উপন্যাসের মতো। তার জীবনের একমাত্র কাম্য ছিলো ভালো পরা, ভালো খাওয়া আর ভালো থাকা। পুরুষ মানুষ ওর কাছে ছিলো সিঁড়ির ধাপ। জীবনটা ছিলো তার উপর বিছানো স্টেয়ার-রানার। তার শোষণ প্রতিভা সবাই জানতো, ভীষণ ঘৃণা করতো তাকে, ভয় করতো, ভালোও বাসতো। অনেকেই বিয়ের আমন্ত্রণ জানালো তাকে। আর সে, ঠিক এ ধরনের মেয়েদের মতোই—এদের কাউকেই বিয়ে করলো না। বিয়ে করলো যাকে, তাকে সে বিয়ের আগে কোনোদিনই ভালোবাসতো না। সে হোলো এখানকার একটি হাসপাতালের গাইনিক-লজিস্ট ডাঃ অরুণ কুমার বোস।

বিয়ে করলো, কিন্তু অরুণ বোসের নির্লিপ্ত নিরাসক্তিতে ফাটল ধরাতে পারলো না। এদের গল্প তোমায় আরেকদিন বলবো। আমার আজকের গল্প শিয়ান-লান্ এর মেয়ে লিলির সম্বন্ধে। শুধু পটভূমিকার জন্যেই শিয়ান-লানএর কথা একটু বলে নিলাম।

বিয়ের পর শিয়ান-লান প্রথম কিছুদিন তার মক্ষিকাদের ছাড়লো। কিন্তু ডাঃ অরুণ বোসের অটল নিরাসক্তি ধ্বসিয়ে দিতে পারলো না। ডাক্তার বোস কেন যে শিয়ান-লানকে বিয়ে করেছিলো তার কোনো স্বাভাবিক

যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি আজও পাইনি, তবে তাদের আমি অনেকদিন ধরে জানতাম, অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা একসঙ্গে জুড়ে অনেক ভেবে ভেবে আমি একটা কাহিনী পেয়েছি যার মধ্যে যুক্তি না থাক সম্ভাব্যতা আছে। সেটা আরেকদিন শোনাবো।

একদিন শিয়ান-লান হতাশ হয়ে পড়লো। দেখলো যে অরুণ বোস একটুও আগ্রহান্বিত নয় তার সম্বন্ধে। এ ধরনের মেয়েদের হতাশায় একটা অদ্ভুত তুর্দমনীয় আবেগপ্রবণতা আছে। শিয়ান-লান আবার তার আগের জীবনে ফিরে গেল, কিন্তু এবার অন্য পথে। ছেলেরা মেয়েদের টাকা দেয় বা মেয়েদের জন্যে টাকা খরচা করে নিষ্করুণ জীবন থেকে খানিকটা আনন্দ কেড়ে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু মেয়েরাও ছেলেদের টাকা দিতে পারে অনুরূপ পরিবেশে, সে কথা শুনেছো কোনোদিন? যদি না শুনে থাকো, আমায় আরেকদিন মনে করিয়ে দিও, আমি দু-একটি গল্প তোমায় শোনাবো।

একটি বোলতা ঘুরে বেড়াচ্ছিলো ঝোলানো অর্কিডের চারাগুলির ভিতর। সেদিকে তাকিয়ে পল্ একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। বোলতাটি ধোঁয়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে আবার বেরিয়ে এলো, ফাইটার প্লেন যেমনি মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে আবার বেরিয়ে আসে।

পল আবার স্বরু করলো।—কি বলছিলাম? হঁ্যা। শিয়ান-লান। সে জুয়া খেলতে স্বরু করলো, ভীষণ মদ্যপান স্বরু করলো। নিজের উপর যতোরকম অত্যাচার চলতে পারে সবই স্বরু করলো। এরই মধ্যে একটি মেয়ে হয়েছিলো শিয়ান-লান এর, কিন্তু মেয়েটির দিকে সে একটুও নজর দিতো না। তার দেখাশোনা করতো একজন বুড়ি ঝি। শিয়ান-লান এর শরীর গেল, কিন্তু......

পল্ একটু থামলো। তারপর আবার স্বরু করলো—।

...কিন্তু আরো সুন্দর হয়ে উঠলো সে। একটা অদ্ভুত ফ্যাকাসে সুন্দর। অন্তরঙ্গ যে দু-একজন ছিলো ওরা বললে, এ তোমার আত্মহত্যার সামিল

শিয়ান-লান। তুমি এবার বিশ্রাম নাও কিছুদিন। শিয়ান-লান ওদের কথা শুনে ফ্যাকাসে হাসি হাসলো।

বছর পাঁচ সাত এমনি কেটে গেল। এর মধ্যে ডাক্তার বোসের খবর নিতো না কেউ, কারণ তাকে কোনো সামাজিক আসরে দেখা যেতো না। একদিন সে চাকরি থেকে পদত্যাগ করলো। শোনা যায় কর্তৃপক্ষ তাকে পদত্যাগ করতে চাপ দিয়েছিলো,—কিন্তু কেন, সে কেউ জানে না। প্রথম কিছুদিন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবার চেষ্টা করলো, তারপর দেখা গেল তাও সে করছে না। কেন করছে না, কেউ বুঝতে পারলো না। শাংহাইতে তার বেশ নাম ছিলো, ইচ্ছে করলে খুব ভালো প্র্যাকটিস জমাতে পারতো। কিন্তু তার যেন কোনো আগ্রহই নেই। —এর পর থেকে ডাঃ বোস একেবারে দেখা হওয়ার বাইরে চলে গেল। ও কি করে কেউ জানলো না, খোঁজও নিলো না। ওর বন্ধুবান্ধব বলে বিশেষ কেউ ছিলো না। তাই ডাঃ বোস অবজ্ঞাত হয়ে রইলো। একই বাড়িতে থাকতো সে আর তার বৌ শিয়ান-লান, কিন্তু দেখা হোতো না ওদের মধ্যে।

তারপর একদিন ডাঃ বোসকে দেখা গেল একটি ওপিয়াম ডেন্‌এ। হার্টফেল হওয়ার কেস্—ডাঃ বোসের নিজেরই হার্ট। বেশ কিছুদিন ধরে আপিং-ধূমপান ধরেছিলো সে। কেউ জানতে পারেনি।

দি গ্রীন ড্যাগনে তখন বসে হৈ হৈ করে মজলিস জমিয়েছিলো শিয়ান-লান। তার কাছে খবর আনলো চাং চি-চাও। খবর শুনে শিয়ান-লান ঠোঁট থেকে মদের গেলাসটি একটু নামালো,—উঠলো না, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেললো না। একটু আনমনা তাকিয়ে রইলো সেকেণ্ড দুই। ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে গেল।

তারপর বললে, "আমি কোথাও কোনো একটা ভুল করেছি।" তারপর গেলাসের সবটুকু মদ এক চুমুকে শেষ করে তাতে আবার ঢাললো, পরে আরো ঢাললো, অনবরত ঢেলে চললো।

সেই তার শেষ মদ খাওয়া। সেদিন রাত্রে সে বিছানা নিলো। তার

পরদিন আর উঠতে পারলো না। তিনদিন জ্বরে ভুগে কেশে কেশে জোর-করে-খাওয়ানো ওষুধ বমি করে ফেলে সে মারা গেল। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার আগে চি-চাও এসে জিজ্ঞেস করলো,—তোমার মেয়েটিকে আনবো? ওকে একবার দেখবে?

শিয়ান-লান চোখ খুলে বললো, "মেয়ে? আছে নাকি একটা?" তারপর চোখ বুঁজে বললো, "না, থাক, দরকার নেই।"

সেই যে চোখ বুঁজলো, আর খুললো না।

এসব ব্যাপার ঘটে গেছে, জয়প্রকাশ, ঠিক মাস ছয় আগে।

চাং চি-চাও কিছুদিন শিয়ান-লানএর মেয়ে লিলিকে খুব আদর যত্ন করলো। কিন্তু ক্রমশ সেই আদর কমে এলো যখন দেখা গেল শিয়ান-লানএর পয়সাকড়ি সবই শেষ, আর ডাঃ অরুণ বোস তো একটি পয়সাও রেখে যায় নি।

মেয়েদের সম্বন্ধে এদের একটা রক্ষণশীল বিতৃষ্ণা আছে, সে অনাথ হলে তো কথাই নেই। মেয়েদের ওরা কোনো গতিকে পরের হাতে পার করে দিতে পারলেই নিষ্কৃতি পায়। হাজার বছর আগে এদের মেয়েদের সম্বন্ধে যা ধ্যানধারণা ছিলো আজ এই উনিশ শো আটত্রিশেও তাই আছে। লিলিকে নিয়ে কি করা যায়, তা নিয়ে চাং চি-চাওএর ভাবনা হোলো। তার নিজেরই চারটে বৌ, আর জন কুড়ি রক্ষিতা। তার ভাবনা দূর করলো এই মিশনারী মহিলা মিস পার্কার। ওদের মিশনের একটি অনাথ আশ্রম আছে। চি-চাও মিশনে কিছু থোক টাকা চাঁদা দিয়ে দিলো, আর লিলিকেও দিয়ে দিতে চাইলো সেখানে। মিস পার্কার রাজী হলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে লিলিকে একটু বেশী রকম ভালোবেসে ফেললো। তাই তাকে অনাথ আশ্রমে আর রাখলো না, রাখলো নিজের কাছেই।

সব সমস্যারই স্বস্তির-নিশ্বাস-ফেলা নিষ্পত্তি হোলো তখনকার মতো। চিরকালের মতোই হোতো। কিন্তু…

কিন্তু এমন সময় দ্বিতীয় অঙ্কে এসে অবতীর্ণ হলেন আমাদের গল্পের

আরেকটি চরিত্র,—সেই তিনি, যাঁর অন্য নাম যাই হোক আমরা সাধুজী বলেই ডাকি।

সাধুজী বাংলাদেশের লোক, খুব পণ্ডিত আর বেশ নামও আছে। উনি ছিলেন সানফ্রান্সিসকোতে। কিছুদিনের অবসর নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন ভারতবর্ষে। দেশ থেকে হঠাৎ ডাঃ অরুণ বোসের ভায়ের চিঠি পেলেন হংকংএ। অরুণের বহুকাল কোনো খোঁজখবর নেই। অরুণ বোস সাধুজীর ছাত্রজীবনের বন্ধু। তিনি যদি শাংহাই যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করে কোনো খোঁজ নিতে পারেন অরুণ বোসের—।

সাধুজী চলে এলেন শাংহাই।...

এই পর্যন্ত বলে পল্ যখন সিগারেটে লম্বা-হয়ে-ওঠা ছাইটি সবে মাত্র ঝেরেছে ছাইদানে, ওর চাকর এসে একজনের নাম করে বললে যে উনি এসেছেন।

যাঁর নাম করলো তিনি একজন খৃস্টান পাদ্রী। তাঁরও নিমন্ত্রণ ছিলো দুপুরের লাঞ্চে। তিনি খাঁটি ইংরেজ, একটা রাশভারী নামও আছে, কিন্তু এ গল্পে তাঁকে আমরা শুধু সাধারণ রকম একটা রেভারেণ্ড গ্রীন নামেই জানবো। বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশ। সুস্থ, সবল, সুগঠিত, ভারী চেহারা। চিবুকে একটুখানি কালো চাপ দাড়ি। চোখে পুরু চশমা।

পল্-এর গল্প বলা স্থগিত রইলো।

লাঞ্চ সমাপ্ত হোলো মামুলী কথাবার্তায়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর আধো-উৎসাহিত বিতর্কে।

লাঞ্চের পর দেখলাম পল্ উদাস ভাবপ্রবণতায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সে আমায় থেকে যেতে বললো না।

ফেরার পথে আমি আর রেভারেণ্ড গ্রীন সঙ্গী হলাম।

রিকশয় আমি আর রেভারেণ্ড গ্রীন পাশাপাশি বসে। এ-কথা সে-কথার পর সে আমায় জিজ্ঞেস করলো, "মিস্টার ত্রিবেদী, ওই ইণ্ডিয়ান সাধুকে তুমি চেনো?"

"ঠিক চিনি না," আমি উত্তর দিলাম, "তবে একদিন দেখেছি। পরিচয়ও হয়েছে। কেন?"

অন্য কথা পাড়লো রেভারেণ্ড গ্রীন। বললে, "আমাদের একটি স্কুল আছে। সেটা দেখতে আসবে একদিন?"

আমি অমায়িক হবার চেষ্টা করলাম।

"তবে এখনই চলো," সে বললে।

রিকশ এসে মিশনের গেটের সামনে থামলো। সেখানে আরেকটি রিকশ দাঁড়িয়ে।

গেট পেরিয়ে সোজা পথ। দু-পাশে সবুজ লন। ছেলেরা খেলছে। এখানে সেখানে দু-একজন পাদ্রী।

খিলান দেওয়া নিচু ছাদ ঢাকা নিঃশব্দ পথে এগিয়ে চললাম চার্চের দিকে। টালির মেঝে রেভারেণ্ড গ্রীনের জুতোর হীল ঠকঠকিয়ে চললো। একটু কাশলো সে। অস্ফুট প্রতিধ্বনি ভেসে এলো সামনে থেকে। পথটা শেষ হতে বড়ো দরজাটির মুখে রেভারেণ্ড গ্রীন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। থামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মিস পার্কার। সঙ্গে আরেকটি চীনে মেয়ে, তাদের মিশনের কেউ হবে।

রেভারেণ্ড গ্রীন একটা হাত আমার দিকে বাড়ালো।

"মিস্টার ত্রিবেদীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে," গম্ভীর হাসি হেসে মিস পার্কার বললো। "সামাজিকতা থাক। আমি এখনি চলে যাবো। আমি একটি কথা তোমায় জিজ্ঞেস করতে এসেছি।"

রেভারেণ্ডের মুখ একটু ধূসর হোলো।

"তুমি পরশু সকালে সেই ইণ্ডিয়ান মাংকের সঙ্গে দেখা করেছো," মিস পার্কার জিজ্ঞেস করলো।

রেভারেণ্ড কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা হাত তুললো কৈফিয়তের ভঙ্গিতে।

মিস পার্কার বললো, "অস্বীকার তুমি করতে পারবে না। আমি জানি। তুমি ওকে যা বলেছো সেটা শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব। কোনো ভদ্রলোক তা পারতো না।"

রেভারেণ্ড এবার কথা বললো। বললে, "মহত্তর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে আমি যদি অপরাধ করে থাকি তার কৈফিয়ত আমি আমাদের সৃষ্টি-কর্তাকেই দেবো, তোমাকে নয়।"

আমি এবার চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এদের ব্যক্তিগত আলোচনায় আমার উপস্থিতি আমার কাছে অসোয়াস্তিজনক। আমি ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে সরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মিস পার্কার ডেকে বললে, "মিস্টার ত্রিবেদী, তোমায় আমার দরকার। তুমি যেয়ো না।" তারপর রেভারেণ্ড গ্রীনের দিকে ফিরে বললো, "তুমি আমাদের পথে দাঁড়িয়ো না। নইলে তুমি পদদলিত হতে পারো আমার পায়ের নীচে। সেটা তোমার পক্ষে খুব সম্মানজনক হবে না।"

"মাই চাইল্ড," বললে রেভারেণ্ড গ্রীন তার পাদ্রীজনোচিত গাম্ভীর্যে, "তুমি ঘোর পাপী।"

মিস পার্কার উত্তর দিলো, "আমার পাপটুকু, সে যদি সত্যিই পাপ হয়, শুধু ভুলের মাশুল। তার বোঝা এমন কিছু নয়। বিবেক আমার সাফ আছে। কিন্তু তোমার পাপ অন্তরের। বিধাতার কাছে মার্জনা পেলেও নিজের বিবেকের কাছে তুমি মুখ দেখাতে পারবে না।" একটু থেমে তারপর বললো, "এ কথাই তোমায় বলতে এসেছিলাম।"

ফাঁকা বারাণ্ডা গমগমিয়ে চলে গেল নামজাদা মিশনারী মিস পার্কার। আমি উপভোগ করলাম। কিন্তু সহজ ভাবে নয়।

রেভারেণ্ড গ্রীন আস্তে আস্তে বললে, "আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি, মেয়েটি ভুল পথই যদি বাছলো তো যে-পথে ভুল হলেও মিশনের বদনাম হোতো না, সে-পথ বাছলো না কেন। আমি সব সহ্য করতে পারি—কিন্তু চার্চের সুনাম নষ্ট হওয়া, তাও এই সুদূর প্রাচ্যে, উঃ, কী সাংঘাতিক, ইউরোপীয়ানদের উপর থেকে নেটিভদের সমস্ত শ্রদ্ধা চলে যাবে— !"

চার্চের ভেতর ঢুকে গেল রেভারেণ্ড গ্রীন।

আমার সামনে এসে দাঁড়ালো মিস পার্কারের সঙ্গিনী চীনে মেয়েটি। সে

ফিরে এসেছে। বললে, "মিস পার্কার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আসুন।"

কোনো কথা না বলে আমি ফিরে চললাম তার সঙ্গে। খানিকটা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি অলটারের সামনে হাত দুটো জুড়ে রেভারেণ্ড গ্রীন হারিয়ে গেছে ঈশ্বরপুত্রের কাছে ব্যাকুল মৌন প্রার্থনায়,—হয়তো চার্চের সুনাম রক্ষা করবার, সুদূর প্রাচ্যে ইউরোপীয় প্রেস্টিজ অক্ষুণ্ণ রাখবার আবেদনে।

মিস পার্কার রিকশয় চেপে বসলো। পাশে বসলো সেই চীনে মেয়েটি। পাশাপাশি হেঁটে চললাম আমি।

মিস পার্কার বললে, "আমি খুবই দুঃখিত, মিস্টার ত্রিবেদী, যে তোমায় কষ্ট দিলাম। আমি তোমায় নিয়ে এলাম কারণ আমি রেভারেণ্ড গ্রীনকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দিতে চাই।"

এর পর আর দিন পোনেরো ছিলাম শাংহাইতে। পল্-এর মারফতে একটি ছোটোখাটো মহলে পরিচিত হয়ে নানাবিধ সামাজিক নিমন্ত্রণ খেয়ে হৈ চৈ করে দিনগুলো কাটলো। এই ছোটো পরিধিতে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে সাধুজী,মিস পার্কার, রেভারেণ্ড গ্রীন এদের সম্বন্ধে আরো দু-চারটা কথা যে কানে এলো না তাও নয়। পল্-এর গল্পের বাদবাকিটা আর শোনা হোলো না। তবে আঁচ করলাম অনেকটা। সবাই বিশেষ ভাবেই উপভোগ করছিলো যে সংঘর্ষটা বাধলো সাধুজী আর মিস পার্কারের মধ্যে, একটি ছোট্টো মেয়ে লিলি বোসকে উপলক্ষ করে।

আমি আঁচ করেছিলাম ব্যাপারটা অনেকটা এরকম—।

সাধুজী ডাক্তার অরুণ বোসের মেয়েটিকে খুঁজে বার করে একটা স্বাভাবিক মমতায় তাকে দেশে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বাধা দিলো মিস পার্কার। সংসারের-মোহ-কাটানো মিশনারির জীবনে হঠাৎ সন্তান স্নেহের বাঁধনে জড়িয়ে-পড়া মায়া কুয়াশার মতো নামলো। তিনি বুঝলেন সাধুজী একে দেশে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে কেউ তাঁকে

আটকাতে পারবে না। সেই ভাবনায় তিনি দিশাহারা হয়ে পড়লেন। তিনি ব্যাকুল অনুরোধ জানালেন, কয়েকটা বছর লিলি তাঁর কাছে থাক, আরেকটু বড়ো হলে তখন যাবে।

মনে হলো যেন সাধুজী রাজী হয়ে যাবে।

এমন সময় রেভারেণ্ড গ্রীন হঠাৎ সাধুজীকে বলে বসলো এ-কথায় সে-কথায় যে মিস পার্কার লিলি বোসকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করবে এবং তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড়ো করে পরে মিশনের কাজে নিযুক্ত করবে এরকম একটা কিছু পরিকল্পনা করেছে। রেভারেণ্ড গ্রীন সাধুজীকে আরো বলেছিলেন, এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে অনাথ এই মেয়েটির পক্ষে। কী হবে তার বাপের দেশে অপরিচিত পৈত্রিক আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে? এসব বলে, হিন্দুধর্ম থেকে খৃস্টধর্ম যে কতো বেশী উদার উন্নত এবং ঈশ্বরের নিকটতর এসব বলে রেভারেণ্ড গ্রীন চটিয়ে দিলো সাধুজীকে। শুনে-টুনে সাধুজী আগুন। সব অনাচার সহ্য হতে পারে, কিন্তু হিন্দুর মেয়ে হবে খৃস্টান? তারপর মিশনারি? সেটা সাধুজীর সহ্য হোলো না। মনে যেটুকু দুর্বলতা ছিলো সেটা সিমেণ্ট করলেন তিনি। লিলি নিয়ে যেতে হবেই।

একথা শুনে মিস পার্কার জ্বলে উঠলো। যতো না চটলো সাধুজীর উপর, তার চেয়ে বেশী চটলো রেভারেণ্ড গ্রীনের উপর। চটলো, লিলির সম্বন্ধে মিস পার্কারের পরিকল্পনা রেভারেণ্ড গ্রীন বলে দিয়েছে শুধু সে-জন্যেই নয়, বেশী চটলো এ জন্যে যে লিলির সম্বন্ধে তার পরিকল্পনার আভাসটুকুও কোনোদিন কাউকে জানতে না দেওয়া সত্ত্বেও রেভারেণ্ড গ্রীন সেটি ধরে ফেলেছে বলে।

তারপর আমার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো দি গ্রীন ড্রাগনের দোতলায় আমায় স্তম্ভিত করে দেওয়া সেই দৃশ্যটির অন্তর্নিহিত কারণ।

একটা দুর্বলতা সিমেণ্ট করতে গিয়ে সাধুজীর মনের দেওয়ালে আরেকটি ফাটল বেরিয়ে পড়েছে।

শাংহাই ছেড়ে চলে আসবার দিন দুই আগে একটি বিখ্যাত ডিপার্টমেন্ট স্টোরএ রেভারেণ্ড গ্রীনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"আমি পরশু চলে যাচ্ছি," আমি বললাম, "একদিন তোমার ওখানে আসবো ভেবেছিলাম।"

রেভারেণ্ড গ্রীন আমায় নিয়ে গেল টী-কর্নারে। জানলার পাশে একটি টেবিলে আমি আর রেভারেণ্ড গ্রীন বসে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের দিনের আলোর সোনালী পর্দায় পথের জনতার চলচ্চিত্র। দূরে বৃটিশ কনস্যুলেটে ইউনিয়ান-জ্যাক পতপত করে উড়ছে। আরো দূরে জাহাজঘাটায় জাহাজের ফানেল থেকে বেরোনো ধোঁয়া আকাশে জড়ো হচ্ছে একটু একটু করে। হোয়াংপুর বুক থেকে স্টীম লঞ্চের তীক্ষ্ন সাইরেন শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বাঁধের পাশে প্রশস্ত স্ট্র্যাণ্ডে জনতান্বিত চাঞ্চল্য। অপ্রশস্ত সাঁকোটি গাড়িতে মানুষে ঠাসাঠাসি।

রেভারেণ্ড গ্রীন বললে, "এখানে আমিও বেশীদিন থাকবো না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন ?"

"ডিউটি," রেভারেণ্ড গ্রীন উত্তর দিলো। তারপর বললে, "আমাদের মতো চার্চের লোকের পক্ষে বেশীদিন কোথাও থাকতে নেই, জড়িয়ে পড়তে হয় তাহলে। তাছাড়া এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। কিছুদিনের মধ্যে বিদেশীদের এখানে থাকা নিরাপদ নাও হতে পারে।"

আমি চুপ করে রইলাম।

"সাধুজীর সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়েছে ?" রেভারেণ্ড গ্রীন জিজ্ঞেস করলেন।

আমি হাসলাম একটু।

"ত্রিবেদী, আমি জানি তুমি কেন হাসছো," বললো রেভারেণ্ড গ্রীন, "কিন্তু একথা কি কেউ কোনোদিন ভাবতে পারে যে একজন ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি আর তোমাদের ধর্মের এক সন্ন্যাসী একটি অনাথা মেয়ের মমতায় জড়িয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত কেউ তাকে ছাড়তে পারবে না বলে ভগবানকে ভুলে

গিয়ে পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায় ? পুওর মিস পার্কার ! ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করুন।”

আমি হাসলাম আরো একটু ভগবানের ভালোবাসা আর মানুষের ভালোবাসার মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে মানুষকে রেখে যে ভগবানকে ছাড়ে তার জন্যে আমার সহানুভূতি বেশী। ভগবান মানুষ নয়, ভালোবাসা না পেলে ভগবানের জীবনে ব্যর্থতা আসে না, নির্বিকার হয়ে থাকবার ক্ষমতা তাঁর আছে,—কিন্তু একজন মানুষ, সে হাজার হোক মানুষ তো, যাকে ভালোবাসে তাকে না পেলে তার ক্ষতি হয় খুব।

“আমায় বিশ্বাস করছো না,” রেভারেণ্ড গ্রীন বললে উত্তেজিত হয়ে। তারপর একটু ধরা-ধরা আবেগরুদ্ধ গলায় বললো, “ওরা কাল হংকং চলে গেছে। সেখানে ওরা অপরিচিত। তাই নিরিবিলিতে বিয়ে হয়ে যাবে সেখানে। মিস পার্কার মিশন ছেড়ে দিলো। সাধুজীও আর সাধুজী থাকবে না।”

আমি এবার একটু জোরেই হেসে ফেললাম। রেভারেণ্ড গ্রীন হঠাৎ চটে গেল। উঠে দাঁড়ালো। পা বাড়ালো। দুমদাম করে এগুলো দু'পা। হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো আবার।

জিজ্ঞেস করলো, “তুমি হাসছো কেন ?”

আমি উত্তর দিলাম, “তোমার ভগবান আর আমাদের ভগবান একটি মেয়েকে নিরাশ্রয় আর অনাথ হওয়ার জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলো। আমাদের সন্ন্যাসী আর তোমাদের মিশনারি বিধাতার বিধান পাল্টে দিলো।”

ফাদার গ্রীন একটু কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে রুক্ষভাবে বললো, “বেশ, শুনে যদি সুখী হও, মিস্টার জয়প্রকাশ ত্রিবেদী, তবে শোনো। ওরা দুজন চলে গেছে বিয়ে করে সংসার করবে বলে। ওদের সংসার করবার উপলক্ষ ছিলো লিলি—চাং চি-চাওএর বোন শিয়ান-লান আর সেই ইণ্ডিয়ান ডাক্তার এ-কে -বোসের মেয়ে। সেই লিলিকেই ওরা এখানে ফেলে চলে

গেছে। ওকে আর কোনো প্রয়োজন মনে হোলো না এদের। এদের জীবনে লিলির অবদানটুকু ফুরিয়েছে। সুতরাং ওর প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।"

রেভারেণ্ড গ্রীন চলে গেল। আমি হতবাক হয়ে রইলাম। তারপর সেই একলা টেবিলে বসে আমি ভীষণ হাসলাম, আশেপাশের অন্যান্য সবাইকে বিস্মিত করে।

দিন চারেক পর আমিও শাংহাই ছাড়লাম বাবার সঙ্গে। পল-এর সঙ্গে দেখা হোলো না। দূতাবাসের কি একটা কাজে সে তখন টোকিওতে।

রেভারেণ্ড গ্রীনের গল্প আমি অনেকের কাছেই করেছি,—বলে গেল জয়প্রকাশ ত্রিবেদী,—ওঁর নিষ্ঠা অনেককে মুগ্ধ করেছে । দু-চারজন বৃদ্ধা খৃস্টান মহিলার চোখে জলও দেখেছি। আমার সপ্রশংস ধারণা প্রথম ধ্বসিয়ে দিলো সিঙ্গাপুরের একজন অভিজাত পথিক-বিলাসিনী। বছর দুয়েক আগে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম অফিসের একটা কাজে। যে হোটেলে থাকতাম সেই হোটেলেই ছিলো সেই মেয়েটির আস্তানা। তার নাম,...মনে করা যাক তার নাম ভায়োলেট। আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় অবসরের তাগিদটা উপলক্ষ করে। পরে একটা সাময়িক বন্ধুত্বও হয়ে গেল।

একদিন দুপুর বেলা ভীষণ বৃষ্টি। ভায়োলেট আমায় ডেকে পাঠালো। আমি যেতেই বললে, "একা ভালো লাগছে না। ব্রিজ খেলবে নাকি বলো। আরো দুজনকে খুঁজে আনি তাহলে।"

আমি বললাম, "থাক, দরকার নেই, বৃষ্টির দিনে আমি ব্রিজ খেলি না।"

ভায়োলেট হাসলো। বললো, "বেশ, গল্প করা যাক তাহলে। জানলাটা খুলে দিই।"

জমাট বৃষ্টিতে চারদিক ঝাপসা। কি জানি কেন, হঠাৎ অনেকদিন আগেকার শাংহাই-এর কথা মনে পড়লো।

বললাম, "বয়ের জন্যে রিং করো, কিছু ড্রিংক্‌স্ নিয়ে আসুক।"

ভায়োলেট তার নিজের দেরাজটাই খুললো। বললো, "আজ এটা আমার পার্টি।"

একটা হুইস্কির বোতল বার করলো সে।

সেদিন রেভারেণ্ড গ্রীনের গল্প শুনিয়েছিলাম ভায়োলেটকে।

গল্প শেষ হতে ভায়োলেট আমার দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললো, "তুমি একটা ফুল। রেভারেণ্ড গ্রীন প্রেমে পড়েছিল সেই মিশনারি ভদ্রমহিলার সঙ্গে।"

আমি চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসলাম—"কি বললে?"

"ব্যাপারটা খুবই সোজা," ভায়োলেট উত্তর দিলো, "রেভারেণ্ড গ্রীন তার নিজের মন বুঝতে পারলো মিস পার্কার আর সাধুজীকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখবার পর। সাধুজীর উপর তার ভীষণ হিংসে হলো। সেজন্যেই গ্রীন তাকে বলতে গিয়েছিলো যে মিস পার্কার লিলিকে ক্রিশ্চিয়ান করতে চায়। ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম আর হিন্দুধর্ম কোনটা বড়ো এ-নিয়ে তর্ক করতে সে যায় নি। তফাৎ শুধু এটুকু—সাধুজী লোকচক্ষুর আড়ালে লুকোচুরি না করে সোজাসুজি বিয়ে করতে রাজী ছিলো, কিন্তু রেভারেণ্ড গ্রীন বিয়ের ব্যাপারে ধার দিয়েও যেতে রাজী ছিলো না।"

আমার চট করে রেভারেণ্ড গ্রীনের কথাগুলো মনে পড়লো। আমায় সে বলেছিলো: মেয়েটি ভুল পথই যদি বাছলো, যে পথে ভুল হলেও মিশনের বদনাম হোতো না, সে পথ বাছলো না কেন!

আমি বললাম, "তুমি আমায় অবাক করলে ভায়োলেট। আমায় কোনো মেয়ে একথা বলে নি।"

ভায়োলেট একটু আস্তে আস্তে বললো, "জয়প্রকাশ, তোমার চেনা-শোনা অন্য মেয়েদের থেকে আমার মতো মেয়েরা জীবনটাকে একটু বেশী দেখেছে।"

*   *   *   *

শেহেরাজেভের নিরালায় আমার মুখোমুখি বসে জয়প্রকাশ ত্রিবেদী বলে গেল,—নিউ দিল্লীতে সেই পার্টি দিয়ে গল্প সুরু করেছিলাম না? হ্যাঁ তাই।

নিউ দিল্লীতে সেদিন সেই শীতের সন্ধ্যায় আমার চোখের সামনে শাংহাইএর বছর দশবারো আগেকার সেই দিনগুলো ভেসে গেল একটার পর একটা।

মিস্টার চ্যাটার্জী মিসেস চ্যাটার্জীকে নিয়ে এগিয়ে এলেন। হঠাৎ চোখে পড়লো, ওঁদের পেছন পেছন আসছে আরো দুজন। একটি আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে আর আরেকজন দীর্ঘকান্তি সুদর্শন প্রৌঢ় বিদেশী।

"হ্যালো ত্রিবেদী!"—মিসেস চ্যাটার্জী আর সেই বিদেশী ভদ্রলোকটি পর-পর বললেন।

"হ্যালো মিস পা—ম্—মিসেস চ্যাটার্জী, অনেকদিন পর দেখা হোলো। খুব খুশি হলাম। কি রকম আছেন," আমি বললাম।

আমি ভুল করে মিসেস চ্যাটার্জীকে তাঁর পুরোনো দিনের নাম ধরে ডাকতে গিয়ে সামলে নিলাম সেটা লক্ষ্য করলো সবাই। সবাই মিলে হাসলাম খুব। কিন্তু আমি মনে মনে ভাবছিলাম, কে এই অন্য বিদেশী ভদ্রলোকটি, খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে যেন,—"আরে? পল—! আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি…"

একটা আন্তরিক করমর্দনের ঝড় রইলো।

পল মোটা হয়ে গেছে অনেক। চুল প্রায় সবই পেকে গেছে।

মিস্টার চ্যাটার্জী বললেন, পল্ এখন ইউ-এন-ও'তে চাকরি করে। কোনো একটা কাজে একদল বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দিল্লীতে এসেছে। তারপর রেঙ্গুন হয়ে ব্যাংকক যাবে।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর মিস্টার এবং মিসেস চ্যাটার্জী ওঁদের বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে আরেকটি জনতার মধ্যে চলে গেলেন সামাজিকতা রক্ষা করতে।

আমি পল্‌কে বললাম, "আমি কিন্তু অবাক হয়েছি এঁদের এই আশ্চর্য পরিবর্তনে। সানফ্রান্সিসকোর ভারতীয় সাধুজী আর শাংহাই-এর ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিকে নিউ দিল্লী সোসাইটির মিস্টার আর মিসেস চ্যাটার্জীর ভূমিকায় ভাবতেই পারছি না।"

পল্ আমায় একটি সিগারেট দিয়ে লাইটার ধরাবার চেষ্টা করতে করতে বললো, "অনেক অদ্ভুত কিছুই জীবনে হয়।"

আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলাম। অষ্টাদশী বিদেশী তরুণীটি পেছিয়ে পড়েছিলো। তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো একটি কালো সাটিনের ঈভনিং গাউনে। আমায় দু-একবার সেদিকে ফিরে তাকাতে দেখে পল্ একটু হাসলো। কিন্তু প্রত্যেক বিদেশী ভদ্রলোকের মতো তা নিয়ে কোনো মন্তব্য না করে বলে গেল, "এদেশে ফিরে সাধুজী তার সন্ন্যাসী হবার আগেকার নাম ব্যবহার করতে সুরু করলো। রণদাপ্রসাদ চ্যাটার্জী হয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করলো একটি কলেজে, তারপর খদ্দর ধরলো, চরকায় সুতো কাটলো, কংগ্রেসে যোগ দিলো, আগস্ট-বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করলো, মাঠে ময়দানে বক্তৃতা দিলো, জেল খাটলো, জেলে কোনো এক বিশিষ্ট নেতার বিশেষ প্রিয়পাত্র হোলো—তারপর ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর একদিন দেখা গেল চ্যাটার্জী নতুন জীবন সুরু করেছে নিউ দিল্লীতে এসে। এমন নতুন কিছু নয়, অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়, আমাদের পুরোনো বন্ধু সে, আমরা তার সাফল্যে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছি, আর," বলে গেল পল্, "আর চ্যাটার্জী খুব কর্মদক্ষ লোকতো বটেই।"

"হ্যাঁ, সে আমরা শাংহাতেই লক্ষ্য করেছি," আমি উত্তর দিলাম।

লনের একপ্রান্তে একটি ঝাউ গাছ। তার নিচে পৌঁছে আমরা একটু দাঁড়ালাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি, সেই কালো গাউন পরা মেয়েটি একটি ডালিয়ার চারা পর্যবেক্ষণ করছে।

তারপর আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম পল্‌কে, "আচ্ছা, সেই লিলি মেয়েটিকে ওরা শাংহাইতে ফেলে গিয়েছিলো বলে শুনেছিলাম। সে এখন কোথায়?"

পল্ দূরের জনতার দিকে একবার তাকালো, তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, "তুমি তো লিলির দিকে বারবার তাকিয়ে দেখছিলে। আমি ভাবলাম তুমি নিশ্চয়ই তাকে চিনতে পেরেছো।"

আমি অবাক। এত বড় হয়ে গেছে লিলি? কতো ছোটো দেখেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "সে তোমার সঙ্গে কি করে এলো?"

পল্ বললো, "ওরা যখন চলে যায় আমি তখন টোকিওতে। ফিরে এসে দেখি ওরা নেই, লিলি আছে চাং চি-চাও এর কাছে। সে তাকে নিয়ে কি করবে ভাবছে। তখন আমিই লিলিকে পুষ্যি নিলাম। আমার তো নিজের ছেলেমেয়ে নেই। এমন লিলিই আমার দত্তক কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী।"

জিজ্ঞেস করে ফেললাম, "পুষ্যি নিলে? কেন?"

পল্ উত্তর দিলো, একটু হাসলো। একটু উদাসও হয়ে গেল। বললো, "জীবনে অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই হয়। যাক, আমার হোটেলে কবে আসছো বলো। আমি তো বেশীদিন থাকবো না।"

জয়প্রকাশ-ত্রিবেদী থামলো।

বিল চুকিয়ে দিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি?"

"মিস্টার আর মিসেস চ্যাটার্জীর সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছিলো," জয়প্রকাশ বললো "ওরা এখন মেক্সিকোতে আছে। পল আর লিলির সঙ্গেও দু' একবার দেখা হয়েছে। ওরা আছে ব্যাংককে। এবার গেলে আবার দেখা হবে।"

আমি একটি ট্যাক্সি ডাকলাম।

জয়প্রকাশ হাত বাড়িয়ে বললো, "আচ্ছা রঞ্জন, এর মধ্যে তো আর দেখা হবে না। বছর তিনেক পরে যখন ফিরবো তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে।"

জয়প্রকাশ তার হোটেলে ফিরে গেল। আমি চলে এলাম বাড়ি।

ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

মাসখানেক পরে বম্বের একটি সোসাইটি-উইকলিতে নব-বিবাহিতদের ছবির পাতায় হঠাৎ দেখি জয়প্রকাশ আর একটি বিদেশী তরুণীর ছবি। ছবির নিচেনাম দেখে বুঝলাম এ হোলো সেই লিলি নামে মেয়েটি।

দিলীপ তখন বসে ছিলো আমারই ঘরে। ওকে ছবিটা দেখালাম। সে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলো, তারপর একটু হাসলো।

আমি বললাম, "বেশ ভালো জুড়ি হয়েছে। জয়প্রকাশের মা বাঙালী, আর এই লিলি মেয়েটির বাবা বাঙালী।"

দিলীপ হাসতে সুরু করলো।

আমি বললাম, "বাঃ, এতে হাসির কি আছে? লিলির বাবা ছিলেন শাংহাইর একজন বাঙালী ডাক্তার, অরুণ কুমার বোস।"

"জানি, জানি, তোর অনেক আগে জয়প্রকাশ লিলিদের গল্প আমার কাছেও করেছে।"

"তবে হাসছো কেন?"

"দেখ, আমি বাজী ধরে বলতে পারি, লিলিব মধ্যে একটুও বাঙালী রক্ত নেই।"

"সে কি!" আমি অবাক হলাম।

দিলীপ বললো, "পল্-এব সঙ্গে যখন জয়প্রকাশের দিল্লীতে আবার দেখা হয় গত বছর তখন আমিও দিল্লীতে ছিলাম। জয়প্রকাশেব বাড়িতে একদিন আমার সঙ্গে ওদের আলাপ হয়। আর আমায় তো চিনিস, যেখানে বিদেশী মদের গন্ধ পাই, সেখানেই জুটে যাই। পল্ তো অনন্যসাধারণ সুরা-রসিক লোক। ব্যস, জমে গেলাম তার সঙ্গে। ও আমায় সোজাসুজি সব বলেনি বটে, কিন্তু যা বলেছে তার থেকে ব্যাপারটা প্রায় মোটামুটি আঁচ করেছি।"

আমি শোনবার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করলাম।

দিলীপ বলে গেল, "লিলি আসলে পল্-এরই মেয়ে।"

"সে কি!" আমি অবাক।

"হ্যাঁ। ডাক্তার অরুণ বোসের সঙ্গে বিয়ে হবার অনেক আগের থেকেই শিয়ান-লানের সঙ্গে পল্-এর মাখামাখি ছিলো। ঠিক প্রেম ভালোবাসা কিছু নয়। বৌ-কে দেশে রেখে সুদূর বিদেশে চাকরি করতে গিয়ে শিয়ান-লানের মতো মেয়ের সঙ্গে ভাব হলে যে ধরণের মাখামাখি হয় ঠিক তাই।

একদিন শিয়ান-লান পল্‌কে এসে চেপে ধরলো, তাকে বিয়ে করতে হবে।

শুনে পল্‌-এর চক্ষু চড়ক গাছ!

কারণটা শুনে পল্‌ চোখে সরষের ফুল দেখতে লাগলো। কিন্তু কোনো উপায় নেই, দেশে তার বৌ আছে।

ডাক্তার অরুণ বোস ছিলো পল্‌-এর এক গেলাসের বন্ধু। পল্‌ শিয়ান-লানকে নিয়ে গেল তার কাছে। যদি সে কোনো উপায় করতে পারে।

এই ডাক্তার অরুণ বোস আগে এদেশে বেশ ভালো চাকরি করতো। খুব কোয়ালিফাইড লোক, বিলেতের বড়ো ডিগ্রি ছিলো তার। কি জানি হঠাৎ কি ট্র্যাজেডি এলো তার জীবনে, চাকরি-বাকরি ছেড়ে একেবার দেশ ছেড়ে চলে গেল,—চলে গেল সেই শাংহাই।

অরুণ বোস পল্‌-কে আশ্বাস দিলো যে শিয়ান-লান্‌ এর ব্যবস্থা সে একটা করবে। ফী বাবদ মোটা টাকাও নিলো পল্‌-এর কাছে থেকে। কিন্তু কিছুদিন পর সে টাকা ফেরত দিতে এলো। কী ব্যাপার? না,—শিয়ান-লান্‌কে সেই বিয়ে করে ফেলেছে হুট করে।

আর ওর সন্তান যেটি হবে, তার কি হবে? পল্‌-এর এই প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার বোস জানালো এর জন্যে যেন পল্‌ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়, সেই সন্তান ডাক্তার বোসের সন্তান বলেই সবাই জানবে।

কিন্তু যেই ভাবপ্রবণতার বশে ডাক্তার বোস শিয়ান-লন্‌কে বিয়ে করেছিলো বিয়ের পর সেটা আর রইলো না। বিশেষ করে লিলির জন্মের পর সে একেবারে নিরাসক্ত হয়ে পড়লো।

শিয়ান-লান ডাক্তার বোসকে সত্যি সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিলো, বোধ হয় এ জন্যেই যে তার জীবনে ডাক্তার বোস একমাত্র লোক যে কামনা-সক্ত হয়ে তাকে গ্রহণ করতে চায়নি, তাকে লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই গ্রহণ করেছে। কিছুদিন সে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীর ঘর করবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু পরে যখন বুঝলো যে ডাক্তার বোস শুধু তাকে

ঝোঁকের মাথায় করুণা করেই বিয়ে করেছে, এবং অন্যের সন্তানের জননী হওয়ার দরুণ তাকে বেশ একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখে, সে আর সহ্য করতে পারলো না, আবার ফিরে গেল তার আগেকার জীবনে, সেই জীবনে আরো বেশী করে তলিয়ে গেল।

হয়তো তার কিছুদিন পরে ডাক্তার বোস বুঝলো যে শিয়ান-লানকে সে মনে মনে ভালোবাসে খুবই। হয়তো সে একটা মিটমাট করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলো তার সঙ্গে। কিন্তু পারে নি।

তারপর হয়তো সব ব্যর্থ নায়কের মতো সেও অসংযত হয়ে গেছে, আফিং ধরেছে শেষ পর্যন্ত,—তারপর হার্টফেলে করে মারাও গেছে এক ওপিয়াম ডেন্-এ।

যা বলছি হয়তো ওসব কিছু ঠিক নয়, বেশির ভাগই আমার অনুমান মাত্র—দিলীপ বলে গেল! তবে লিলি যে ডাক্তার অরুণ বোসের মেয়ে নয়, সে পল্-এর মেয়ে সেকথা পল্ নিজেই একদিন ভরপেট হুইস্কির দিল-খোলা মন নিয়ে আমায় বলেছিলো। লিলিকে সে ভীষণ ভালোবাসতো, কিন্তু শিয়ান-লান মারা যাওয়ার পর সাধুজী এসে যখন তাকে এদেশে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে নিতে আসতে চাইলো, তার কিছুই করবার ছিলো না। সাধুজী আর মিস পার্কার যখন লিলিকে না নিয়েই চলে গেল তখন পল্ যে কী খুশি হয়েছিলো বলার নয়। শাংহাইতে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি পুষ্যি নিলো লিলিকে। শুনেছি এর দরুণ তাকে কিছু টাকা দিতে হয়েছে চাং চি-চাও-কে। ডাক্তার বোসের কলকাতার আত্মীয়স্বজনও আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি, এক অনাথ পরের মেয়েকে নিয়ে, যার মা এদেশের মেয়ে নয়, যাদের কেউ চোখে দেখেনি, কোন মধ্যবিত্ত মাথা ঘামায় বলো?

যাই হোক, সব ভালো যার শেষ ভালো, বলে গেল দিলীপ। সবাই তো সুখী হোলো শেষ পর্যন্ত, সাধুজী হোলো, মিস পার্কার হোলো, পল্ হোলো, লিলি হোলো, এখন জয়প্রকাশও হোলো,—এখন আমরা হলাম। লিলি তো পল্-এরই মেয়ে, সে পুষ্যিই হোক, অবৈধ হোক আর আইনসঙ্গত হোক, কী

আসে যায় তাতে? তোর পকেটে ক্যাশ আছে তো রঞ্জন? চল্, কোথাও সেলিব্রেট করে আসি। আমাদের বন্ধুর বিয়ে হোলো, ওদের স্বাস্থ্য পান না করলে তো আমি কিছুতেই আমার বিবেককে সান্ত্বনা দিতে পারবো না। চল্—।"

আমি হেসে বললাম, "দিলীপ দা, আজ ড্রাই-ডে, কোথাও মদ পাওয়া যাবে না।"

উপন্যাসের ব্যর্থ নায়কের মতো মুখ করে দিলীপ চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়লো।

* সাত *

মাস কয়েক পরের কথা,—

কলকাতায় তখন সবে বর্ষা নেমেছে।

বাড়িতে বসে আছি চুপচাপ, কোনো কাজ নেই, রাস্তার মোড়ে একহাঁটু জল। পথে লোক-চলাচল নেই। দুএকটি ট্যাক্সি কি রিকশ চলে যাচ্ছে কখনো-সখনো। রেডিও বাজছে পাশের বাড়িতে। আর শোনা যাচ্ছে মেয়েদের আড্ডার কলকোলাহল।

তেমনি এক বৃষ্টির দিন দুপুরবেলা হঠাৎ দেখি, একটি ট্যাক্সি এসে থামলো বাড়ির সামনে।

মিনিট দুই পরে চোখের সামনে আবির্ভূত হোলো দিলীপ-দা। বললে, "খুচরো টাকা আছে তোর কাছে? ট্যাক্সির ভাড়াটা মিটিয়ে দে তো।"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম দিলীপের দিকে।

সে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলো, "মনে ছিলো না যে পকেটে পয়সা নেই। ট্যাক্সিতে উঠে খেয়াল হোলো। ভাবলাম কোথায় যাই। তোর বাড়িটা পথে পড়লো বলে এখানেই এসে নামলাম।"

চাকরের হাত দিয়ে ভাড়াটা নিচে পাঠিয়ে দিলাম। ট্যাক্সি চলে গেল।

"আজ বেরোস নি?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"এই বৃষ্টিতে কোথায় বেরুবো?"

"আমি কিন্তু এমন বৃষ্টিতে বসে থাকতে পারি না," দিলীপ উত্তর দিলো।

আমি চুপ করে রইলাম। দিলীপ একটু অপেক্ষা করলো আমার কিছু বলার অপেক্ষায়। চুপ করে আছি দেখে একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় গিয়েছিলাম জানিস?"

আমি চোখ তুলে তাকালাম।

"রেবা চৌধুরী-র হস্টেলে।"

সুবিমল, মল্লিকা আর রেবার সঙ্গে দিলীপের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম মাসখানেক আগে। দিলীপ সুবিমলদের বাড়ি যেতো মাঝে মাঝে।

"ওরা দেখা করতে দিলো রেবার সঙ্গে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ভিজিটার্স লিস্টে নাম না থাকলে তো দেখা করতে দেয় না।"

"সে প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ, সে হস্টেলে ছিল না!"

"ও,—" বলে আমি মনে মনে একটু সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

দিলীপ বোধ হয় বুঝলো। হাসলো একটুখানি। বললো, "রেবাকে হস্টেলে না পেয়ে আমি গেলাম সুবিমল ভটচাযের বাড়ি। সেখানেই রেবার সঙ্গে দেখা হোলো। এতক্ষণ ওদের ওখানেই আড্ডা দিচ্ছিলাম, খেলামও সেখানেই। মল্লিকা খাসা রান্না করে।"

আমার মুখে কি ভাব ফুটে উঠেছিলো জানি না। দিলীপ ভালো করে তাকালো আমার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "তোর অতো ভাবনা কিসের? তোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এসেছি সেখানে। সুবিমল, রেবা, মল্লিকা, সবাইকেই বুঝিয়ে এসেছি তোর মতো ছেলে আর হয় না।"

আমি তবু কোনো উত্তর দিলাম না।

দিলীপই বোধ হয় এবার একটু অসোয়াস্তি বোধ করলো। আস্তে আস্তে বললো, "তুই বোধ হয় জানিস না, কেন আমি ওদের ওখানে গিয়েছিলাম।"

আমি চোখ তুলে তাকালাম।

দিলীপ বলে গেল, "আজ দুতিন দিন ধরে শুধু ভাবছি কি করে একজনকে ভোলা যায়। চেনা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে হৈ-চৈ করে কিছুই হোলো না। তার কথা বার বার আরো বেশী করে মনে পড়লো। অচেনা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে দেখি, তাদের তো অসহ্য মনে হচ্ছেই, আর মনে হচ্ছে যেন এ-ভাবে সব চেয়ে বেশী অপমান করছি তাকে, যাকে চেষ্টা করছি ভুলে যাওয়ার। সুতরাং এখন মনে হচ্ছে এমন একজন সামান্য-চেনা কারো সঙ্গে একটু বেশী চেনা করে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক, যাকে অনেক চেষ্টা করেও আমার কাছে অসামান্য করে তোলা যাবে না। কারণ, সে আরেক জনের

কাছে এরই মধ্যে অসামান্য হয়ে আছে।—একটু ভাবতেই তোর কথা মনে পড়লো। সুতরাং রেবার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।"

কী আবোল-তাবোল বকছে দিলীপ-দা! জিজ্ঞেস করলাম, "কি লাভ হবে এতে?"

"বিশেষ কিছুই না," দিলীপ-দা উত্তর দিলো, "শুধু একটি সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ।"

"মানে?"

"রেবা কাল আমায় একটি সিনেমা দেখাচ্ছে।"

"ও। তা'হলে," আমি বললাম, "তুমি, সুবিমল, মল্লিকা, রেবা সবাই মিলে কাল সিনেমায় যাচ্ছো?"

"সুবিমল আর মল্লিকা যাচ্ছে না," দিলীপ ম্লান হাসি হাসলো, "শুধু আমি আর রেবা যাচ্ছি।"

বাইরে ঝমঝম করে আরেক পশলা বৃষ্টি নামলো। দমকা হাওয়া জানলা-দরজায় ঘা দিয়ে গেল, তোলপাড় করে তুললো জানলার পর্দা। সামনের টেবিলে একটি বইয়ের পাতাগুলো বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো, আর এলোমেলো হয়ে গেল দিলীপ-দার মাথার চুলগুলো। সামনের বাড়ির ছাতের ওপারে কালো কালো মেঘ হুড়মুড় করে উঠলো।

"বেশ তো, দেখে এসো," আমি হেসে বললাম, "রেবাকে তো চেনো না, ওর পাশে বসে সিনেমা দেখার মতো যন্ত্রণা আর নেই। প্রত্যেকটি কথা ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, প্রত্যেকটি ঘটনা কেন হোলো, কি ভাবে হোলো, তার বিশদ ব্যাখ্যা করতে হবে, ও হেসে উঠলে কানে আঙুল চাপা দিতে হবে, ও চোখের জল ফেলতে সুরু করলে নিজের রুমাল এগিয়ে দিতে হবে। একদিন ঘুরে এসো ওর সঙ্গে। আর যেতে চাইবে না।"

দিলীপ একটু ম্লান হেসে চুপ করে রইলো।

তারপর বললে, "সে-ও ভালো। একদিন যাবো, দুদিন যাবো, তিন দিনের দিন আর যেতে চাইবো না, মনেও কোনো আক্ষেপ থাকবে না।

অনেক দিন আগে একবার একজনের সঙ্গে যে রকম হয়েছিলো সে রকমটি না হলেই হোলো।"

হঠাৎ যেন মনে হোলো দিলীপ-দার উপর অন্যায় করছি এত রুক্ষ হয়ে। খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "কার কথা বলছো? জেনী ওয়াং?"

দিলীপ চুপ করে রইলো।

মন্থর হয়ে এলো বাইরের বৃষ্টি। নিস্তেজ হয়ে এলো বাদলা হাওয়া। বারান্দার অর্কিডের পাতা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে টুপটুপ করে।

"আচ্ছা দিলীপ-দা, তুমি আমার কাছে ওদের অনেকের গল্পই করেছো, কিন্তু জেনীর গল্পতো করো নি কোনো দিন," আমি বললাম।

তখনো চুপ করে রইলো দিলীপ-দা'।

তারপর আবার যখন ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি সুরু হোলো আরেক পশলা আর গুরু-গুরু মেঘ ডেকে উঠলো আবার, দিলীপ বললো আস্তে আস্তে, "আজ জেনীর গল্প করবার মতোই দিন। শোন তা হলে।—কিন্তু তার আগে চা চাই। হুইস্কি হলে আরো ভালো হোতো, কিন্তু তোদের সব মধ্যবিত্ত ব্যাপার, ওসব তালে থাকিস না। এই বাঙালী জাতটার যে কবে উন্নতি হবে কে জানে! যাক, চা-ই সই। দু' কাপ চা দিতে বলে দে। আর কাউকে ডেকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দে। খুচরো নেই তোর কাছে? কেন, ওই যে ট্যাক্সির ভাড়া দিতে পাঁচটা টাকা দিলি তোর চাকরকে? ডাক তাকে, ডেকে তিন-চার প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক এনে দিতে বলে দে। তোদের এ-সব মধ্যবিত্ত পাড়ার পানওয়ালাদের কাছে তো টিন পাওয়া যাবে না!"

দু' কাপ চা এলো। তারপর তিন প্যাকেট গোল্ড ফ্লেকও এলো।

বাইরে ঝির-ঝির বৃষ্টি—কিন্তু বাদলা হাওয়ার সে রকম দাপট আর নেই। এ-বাড়ি ও-বাড়ির জানলায় জানলায় কি রকম যেন একটু করুণ তার সাড়া।

রিকশ ঠুং-ঠুং করে গেল রাস্তা দিয়ে। স্তিমিত হয়ে এলো পাশের বাড়ির রেডিও। ও-বাড়ির মেয়েদের হাসির সাড়াও আর পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই আড্ডা সেরে এবার হেঁসেলে গিয়ে ঢুকেছে বোধ হয় চায়ের ব্যবস্থা করতে।

দিলীপ একটি সিগারেট ধরালো। জিজ্ঞেস করলো, "শুনবি ?"

আমি চুপচাপ একটি সিগারেট ধরালাম।

"রেবার সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম বলে কিছু মনে করিস নি তো ?" দিলীপ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো।

উত্তরে একটু হেসে আমিও একমুখ ধোঁয়া ছাড়লাম।

দিলীপ চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর বললো, "আচ্ছা, শোন তা'হলে। আজ না বললে হয়তো আর কোনোদিন বলা হয়ে উঠবে না।"

* * * *

আহ্-কিম্'এর লণ্ড্রি বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের এক পাশে। ছোট্টো সাজানো-গুছানো দোকান, কাউন্টারের পেছনে কাচের আলমারিতে নানারকম স্যুট-গাউন টাঙানো। কাউন্টারের পেছনে একটি চীনে মেয়ে বসে।

একটি ময়লা গরম স্যুট বগলে নিয়ে একদিন সেখানে উঠে এলো দিলীপ। স্যুট ড্রাই-ক্লীন করতে দিলো, দর নিয়ে নিষ্ফল তর্ক করলো, রসিদে নিজের নাম-ঠিকানা সই করলো, তারপর রসিদ নিয়ে চলে গেল।

কিছুদিন পর গিয়ে সেই স্যুট ফেরত নিয়ে এলো। তারপর একদিন একটি সিল্কের হাওয়াইআন শার্ট ধুতে দিলো। পরের বার নিয়ে গেল একটি রেয়নের স্যুট।

সেটি দিয়ে, রসিদ নিয়ে, ঘণ্টাখানেক এখানে সেখানে কাটিয়ে হঠাৎ খেয়াল হোলো যে তার সিগারেট-লাইটারটি ভুলে সেই স্যুটের পকেটে ফেলে এসেছে।

দামী লাইটার। একজনের কাছে উপহার পাওয়া।

তাই তক্ষুণি ছুটলো সেই লণ্ড্রিতে, যদি স্যুটটা এখনো কারখানায় চলে না গিয়ে থাকে, তা' হলে লাইটারটি ফেরত পাবে এই প্রত্যাশায়।

ঢুকতেই সেই চীনে মেয়েটি তাকে দেখে একটু হাসলো। সেইটুকু হাসিতেই বুঁজে এলো তার চোখ দু'টো।

দিলীপ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সে লাইটারটি বার করে দিলো।

সে মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে পথে বেরিয়ে এলো। প্যাকেট বার করে একটি সিগারেট ঠোঁটের কোণে সন্নিবিষ্ট করলো। তারপর লাইটারটি ধরালো।

চকমকি থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে সলতেটি ধরে উঠতেই দিলীপ একটু অবাক হয়ে আগুনের শিখার দিকে তাকালো। কী যেন ভাবলো। তারপর চলে গেল।

দিন পাঁচ-ছয় পরে দিলীপ লণ্ড্রিতে ফিরে এলো তার রেয়নের স্যুট ডেলিভারি নিতে। কিন্তু রসিদ ফিরিয়ে স্যুট ডেলিভারি নিয়েই সে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলো।

"ইয়েস্, এনিথিং এল্স্?" জিজ্ঞেস করলো সেই মেয়েটি।

"হ্যাঁ, বলছি," দিলীপ বললো, "আমি যখন লাইটারটি কোটের পকেটে রেখেছিলাম তখন তা'তে তেল ছিলো না। যখন আমি লাইরটি তোমার কাছ থেকে পেলাম তখন দেখি, ওটাতে তেল ভরে দেওয়া হয়েছে।"

মেয়েটি একটু হাসলো। হেসে বললো, "তাতে কি হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু না," দিলীপ উত্তর দিলো, "শুধু জানতে চেয়েছিলাম যে জিনিসটা জ্বলে না, সেটি জ্বলবার ব্যবস্থা করে দেওয়াই কি তোমার কাজ?"

মেয়েটি হেসে ফেললো। আনমনেই কি রকম যেন নিচু হয়ে গেল তার মুখ। আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "কি আমার কাজ সেটা আজো ঠিক জানি না। তবে কি আমার কাজ নয় সেটা বলতে পারি।"

"বেশ, তাই বলো, শুনি," দিলীপ বললো।

"লণ্ড্রিতে কাজ করা আমার পেশা নয়," মেয়েটি উত্তর দিলো, "আমি চৌরঙ্গির একটি দোকানে সেলস্-এসিস্ট্যাণ্ট ছিলাম। এই দোকানে কাজ করে আমার বোন। ওর এখন অসুখ। আর আমারও হাতে কাজ নেই। তাই যে ক'দিন সে আসতে না পারে সেই কদিন আমি এখানে বসছি।"

"দোকানের মালিককে যে দেখিনি একদিনও ?"

"এ সময়টা সে থাকে না।"

একটু চুপ করে থেকে দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বন্ধুরা তোমায় কি বলে ডাকে ?"

"জেনী," মেয়েটি হাসলো, "আমার নাম জেনী ওয়াং।"

"তোমার বোন সেরে উঠতে আর ক'দিন বাকী ?"

জেনী তার নরম চোখ দুটো রাখলো দিলীপের উপর। আস্তে আস্তে বললো, "আমার মালিকের আসবার সময় হয়েছে।"

"তাই নাকি ? আচ্ছা, বাই বাই," বলে দিলীপ কেটে পড়লো।

দিন কয়েক পর দিলীপ আবার গিয়ে উপস্থিত হোলো—এবার তার নিজের স্যুট নিয়ে নয়, কারণ, অতো স্যুট ছিলো না। এবার সে নিয়ে গেল তার এক বন্ধুর স্যুট।

জেনী রসিদ লিখতে লিখতে হেসে ফেললো। বললো, "এভাবে নিজের পয়সায় পরের স্যুট কাচিয়ে দিতে সুরু করলে দুদিনে দেউলে হয়ে যাবে। পয়সা যদি ওড়াতে চাও তো অনেক রাস্তা আছে।"

দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, "ওটা যে আমার স্যুট নয় তুমি কি করে জানলে ?"

"আমার একজোড়া চোখ আছে মিস্টার," উত্তর দিলো মেয়েটি।

"আমার বন্ধুরা আমায় দিলীপ বলে ডাকে," দিলীপ বললো।

"লণ্ড্রি-গার্লস তাদের কাস্টমারদের দিলীপ বলে ডাকে না।"

দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বোন এখানে বসতে আরম্ভ করবে কবে থেকে ?"

"কাল থেকে," হেসে উত্তর দিলো মেয়েটি, "আজ এখানে আমার শেষ দিন !"

"দ্যাট্‌স্ ফাইন, তুমি অফ-ডিউটি কখন থেকে ?"

"চারটে থেকে। তখন মালিক নিজে এসে বসবে।"

"ফাইন। শোনো," দিলীপ বললো, "দেখ, আজকে ছ'টার শোতে আমি

আমি লাইট হাউসের দুটো টিকিট করেছি। একটি আমার কাছে আছে। আরেকটি আমি ভুল করে ওই কোটের পকেটে রেখেছি।"

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি আশা করো? পরের হপ্তায় যখন স্যুটটা নিতে আসবে তখন টিকিটখানি ফিরিয়ে দেবো?"

"না," দিলীপ উত্তর দিলো, "আমি আশা করি লণ্ড্রি-গার্ল তার অস্থায়ী চাকরির শেষ দিন কাস্টমারের জিনিষ ফিরিয়ে না দিয়ে নিজেই ব্যবহার করবে।" বলে দিলীপ আর উত্তরের জন্যে দাঁড়ালো না।

গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে এলো লণ্ড্রি থেকে। একবারও পেছন ফিরে তাকালো না। সোজা চলে গেল তার নিজের কাজে।

সন্ধ্যের পর লাইট হাউসে ঢুকে দিলীপ দেখে, ঠিক পাশের সীটে বসে আছে জেনী ওয়াং।

সেদিন সিনেমায় দিলীপের পাশে বসে এটা-কি ওটা-কি জিজ্ঞেস করলো না, ঘটনা ও সংলাপ বুঝিয়ে দিতে বললো না, হুল ফাটিয়ে হাসলো না বা নায়ক-নায়িকার দুঃখ দেখে চোখে রুমাল চাপা দিলো না রেবা চৌধুরীর মতো। শুধু চুপচাপ বসে সিনেমা দেখলো।

সিনেমা শেষ হতে জেনীদের পেলে দিলীপেরা যা বলে, দিলীপ তাই বললো। বললো, "চলো কোথাও বসে খেয়ে নিই।"

জেনী সেদিন রাজী হোলো না। বললো, "আজ নয়। আরেক দিন।"

"এর পর দেখা হবে কোথায়?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

জেনী বললো, "পরশু তিনটের সময় এখানেই। সেদিন সিনেমা আমি দেখাবো।"

জেনীকে ট্রামে তুলে দেওয়ার আগে শুধু একবার দিলীপ বললো, "জেনী, এখন তুমি লণ্ড্রি-গার্ল নও, আমিও কাস্টমার নই, সুতরাং এখন থেকে আমায় দিলীপ বলে ডাকতে পারো।"

"আচ্ছা," বলে হেসে জেনী ট্রামে উঠে পড়লো।

দিন দুয়েক পর আবার জেনীর সঙ্গে সিনেমায় দেখা হোলো। জেনী সেদিন কিছু বললো না।

তিন-চার দিন পর দিলীপ আবার গেল সেই লণ্ড্রিতে। বোধ হয় ভেবেছিলো এবার জেনীর বোনকে একবার দেখবে। কিন্তু গিয়ে দেখলো, কাউন্টারের পেছনে জেনীই বসে আছে।

কি ব্যাপার?

না, লণ্ড্রির মালিক আহ্-কিম জেনীর বোন মিনিকে বলেছে,—তোমার শরীর এখনো ঠিক সেরে ওঠেনি, তুমি একমাস বিশ্রাম নাও। মাইনেও পুরোই পাবে। আর জেনীর হাতেও তো চাকরি নেই। এই এক মাস সে-ও কাজ করুক এখানে। তারপর দেখা যাবে।

"খুব উদার মালিক দেখছি," দিলীপ বললো।

"হ্যাঁ, ও আমায় খুব ভালোবাসে।" জেনী হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

"তাই নাকি," বলে দিলীপ চোখ তুলে জেনীর দিকে তাকালো।

বোধ হয় ফ্যাকাশে পাংশু হয়ে গিয়েছিলো দিলীপের মুখ, তাই জেনী মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলো।

দিলীপ একটু তাকিয়ে দেখলো জেনীকে, তারপর কোনো কথা না বলে পেছন ফিরে দরজার দিকে হেঁটে চললো।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা পড়তেই জেনীর ডাক শুনলো পেছন থেকে, "যেও না দিলীপ, শোনো।"

"কি," দিলীপ মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলো।

"এখানে এসো।"

দিলীপ ফিরে গেল কাউন্টারের কাছে।

"আহ্-কিম আমায় কেন ভালবাসে সেটা শুনে যাও," জেনী বললো।

"শুনে কি হবে?" শুকনো গলায় দিলীপ বললো।

"শোনোই না। আহ্-কিমের সঙ্গে আমার বোন মিনির বিয়ে হবে।

আমি মিনির দিদি। তাই আহ্‌-কিম আমাকে ভালোবাসে। কেমন ভালো আহ্‌-কিম—তাই না," বলে জেনী মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

হঠাৎ জেনী লক্ষ্য করলো যে, দিলীপ তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। জেনীর এতক্ষণে খেয়াল হোলো যে তার নিজের চোখ ছ'টি ঝাপসা।

জেনী মুখ নিচু করলো তাড়াতাড়ি।

দিলীপ আস্তে আস্তে বললো, "জেনী, তোমায় একটা কথা বলবো ভাবছি।"

"আজ নয় দিলীপ! অন্য কোনো একদিন—।"

"না, এক্ষুণি।"

"এখানে নয় দিলীপ! এটা দোকান। অন্য কোথাও—"

"না, এখানেই।"

"মালিক এখনই এসে পড়বে দিলীপ!"

"মালিক তো আহ্‌-কিম? সে যে-মেয়েকে বিয়ে করবে, সেই মেয়ের দিদিকে তার দোকানের কাস্টমার কি বলবে না বলবে ইজ নান্ অফ হিজ বিজনেস্।"

"ওর কাস্টমারেরা যদি দোকানের ভিতর এরকম পাগলামি করতে সুরু করে তাহলে ছ'দিনেই ব্যবসা উঠে যাবে।"

"ও যাকে বিয়ে করছে তার যদি ততগুলো দিদি থাকে যতোগুলো কাস্টমার আছে—তার দোকানের সেল তাহলে দুদিনে হু-হু করে বেড়ে গিয়ে ব্যবসা ফেঁপে যাবে।"

"তুমি ব্যবসার কি বোঝো দিলীপ! এখন পর্যন্ত নিজের ব্যবসা দাঁড় করাতে পারলে না।"

"এবার আমায় চার মাস সময় দাও জেনী! দেখবে, কি রকম দাঁড়িয়ে গেছে আমার ব্যবসা।"

"চার মাস কেন?"

"চার-টা আমার লাকি নাম্বার।"

"আমার নাকি মাথায় কিছু পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন।"

"দেখ, জেনী, এসব আজে-বাজে কথা বলে আমার আসল বক্তব্য থেকে আমায় বিভ্রান্ত করছো।"

"বেশ তো, কি বলছিলে বলো।"

তখন দিলীপ একটু ভাবলো। ভেবে মুখ লাল করে একটি ব্যক্তিগত খবর জানালো। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করলো জেনীকে। জেনীও একটু কান লাল করে উত্তর দিলো—হ্যাঁ।

তারপর দিলীপ একটি সঙ্কল্প ঘোষণা করলো।

জেনী আস্তে আস্তে বললো, "সেটা এখন নয়। আরো কিছুদিন যাক। তোমার রোজগার বাড়ুক। আমিও একটি চাকরি খুঁজে-পেতে নিই।"

"তখন হবে তো," খুব উৎফুল্ল হয়ে দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

জেনী ঘাড় নাড়লো হাসিমুখে। দিলীপ খুব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

কেটে গেল আরো কিছুদিন। সন্ধ্যাগুলো জেনীর সঙ্গে কাটাতে কাটাতে কলকাতাকে স্বর্গ মনে হোলো দিলীপের।

দিলীপ একদিন জেনীকে বলেছিলো, "জানো, আমার মা ইংরেজ।"

"উনি কি মারা গেছেন?" জেনী জিজ্ঞেস করেছিলো।

"কেন বলো তো?" দিলীপ অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো জেনীর দিকে।

"তোমায় দেখে মনে হয়," জেনী উত্তর দিয়েছিলো, "তোমার মা নেই। তবে আমার ভুলও হতে পারে।"

দিলীপ একটু চুপ করে থেকে বলেছিলো, "না, তুমি ঠিকই বলেছো। আমার মা নেই।"

"উনি যখন মারা যান তুমি খুব ছোটো ছিলে বুঝি?" দিলীপের পিঠে হাত রেখে জেনী জিজ্ঞেস করেছিলো।

দিলীপ একটু চুপ করে রইলো। তারপর ভারী গলায় আস্তে আস্তে বললো, "আমি যখন বেশ ছোটো, তখন মায়ের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি। বাবা আর বিয়ে করেন নি। আমি আয়ার হাতে মানুষ হয়েছি।"

জেনী সেদিন আর কিছু বলতে পারেনি, শুধু চোখ ছলছলিয়ে দিলীপের হাতখানি চেপে রেখেছিলো নিজের নরম মুঠোর মধ্যে।

আর সেদিনই যতোটুকু দ্বিধা ছিলো জেনী ওয়াঙের মনে, সবটুকুই কেটে গেল। হোক না ওরা দুজনে দুটো আলাদা জাত—দিলীপের তো জেনীকে দরকার তার জীবনে। সুতরাং কী আসে-যায়!

জেনী খবরটা প্রথম ভাঙলো তার বোন মিনির কাছে।

মিনি অনেকক্ষণ জেনীর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "দেখ, সে বিদেশী। যা করবে খুব ভেবে-চিন্তে করবে।"

"আমি যা স্থির করেছি, অনেক ভেবে-চিন্তেই স্থির করেছি," জেনী উত্তর দিলো।

ওরা কথা বলে কম, তর্ক করে না, যা বলবার দু-চার কথায় বলে, যা বুঝবার দু-চার কথায় বুঝে নেয়।

মিনি বুঝে নিলো, জেনী দিলীপকে ভালোবাসে, এবং তাকেই বিয়ে করবে। এর আর এদিক-ওদিক হবার নয়।

তখন মিনি তার দিদিকে জড়িয়ে ধরে বললো, "তুমি যদি সুখী হও, আমিও খুব সুখী হবো।"

তারপর বললো, "জানো, আহ্-কিমকে যখন বিয়ে করবো স্থির করলাম, তখন তোমার কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। এর মধ্যে আমারও বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, অথচ তোমার চোখে লাগলো না কোনো ছেলেকে। আমি আহ্-কিমদের বাড়ি চলে গেলে তুমি একা থাকবে কি করে? অনেক রাত্তিরে তোমার কথা ভেবে কেঁদেছি, তবে লজ্জায় তোমায়

বলিনি। আজ যে আমার কী ভালো লাগছে, সে বলে বোঝাতে পারবো না।"

শুনে জেনী একটু হাসলো।

তারপর মিনি জিজ্ঞেস করলো, "বুড়ো কর্তা শুনলেও কিছু মনে করবে না। সুং-চাংও না হয় মাথা ঘামাবে না, কিন্তু চিয়েন-চাং?"

চিয়েন-চাংকে নিয়ে একটু অসুবিধে ছিলো।

বুড়ো ওয়াং জীবনে অনেক দেখেছে, অনেক জেনেছে, যে কোনো কিছুই অত্যন্ত সহজ ভেবে নেওয়াই তার অভ্যেস।

শুনে বললে, "এ আর নতুন কথা কি? আমাদের দেশে কতো জাত এসেছে, আমাদের মেয়ে বিয়ে করে আমাদের মধ্যে মিশে গেছে। এমন কি ওই ইহুদীরা, যারা অন্যান্য দেশে নিজেদের পৃথক সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে কয়েক শতাব্দী ধরে, আমাদের দেশে তাদেরও আমরা হজম করে ফেলেছি। এখানেও তাই হয়েছে, কতো কিনটাল মিশে গেছে আমাদের মধ্যে, আমাদের মেয়েরা চলে গেছে ফিরিঙ্গীদের মধ্যে। আস্তে আস্তে বাঙালীদের মধ্যেও যাবে। যে দেশে যা, তাই হয়ে থাকতে হবে বই কি। বাঙালীর যদি তেমন মুরোদ থাকে হজম করে ফেলুক আমাদের, যদি নিজেদের উপর বিশ্বাস না থাকে, আলাদা সম্প্রদায় হয়ে থাকুক। আমাদের কোনো ক্ষতি নেই।"

জেনী সেদিন খুশি হয়ে বাপকে একটি নতুন রান্না রেঁধে খাওয়ালো।

জেনীর ভাই সুং-চাংও এমন কিছু বিরূপতা প্রকাশ করলো না। যদিও তার মনের প্রসার বুড়ো ওয়াঙের মতো নয়, তবু ঠিক সেই সময় সে প্রেম করছিলো এক ফিরিঙ্গী ললনার সঙ্গে। সুতরাং বিয়ের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার সে বিরোধী। অন্তত নীতিগত ভাবে।—কারণ জেনী ওয়াঙের পছন্দ করা ছেলেটি বাঙালী শুনে তার ভালো লাগেনি। বললে,—কী এ-সব বাঙালীরা, বড্ড বেশী কথা বলে, সরষের তেলে রান্না করে, তরকারীতে মিষ্টি দেয়, ইত্যাদি।

কিন্তু যখন শুনলে দিলীপের মা ইংরেজ, তখন সে আর আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পেলো না। যাই হোক, দিলীপ হাফ্-ইংরেজ তো— যেমনি হাফ-ইংরেজ স্নং-চাংএর প্রণয়িনী রোজী।

রোজীর রং ময়লা, তবু তার পূর্বপুরুষ ইংরেজ, সে নাচতে জানে, ভালো ইংরেজি বলতে জানে। কোথায় লাগে তার কাছে চায়না-টাউনের মধ্যবিত্ত চীনে মেয়েরা, যারা শুধু কাঠের খড়ম পরে খুট-খুট করে চলতে জানে, গালাগাল দিয়ে ঝগড়া করতে জানে, যাদের গায়ে রান্নাঘরের গন্ধ। হ্যাঁ, দু-চারজন যায় বটে কনভেণ্টে, এবং ওরা অন্যান্য চীনে মেয়েদের চাইতে একটু বেশী স্মার্ট, কিন্তু এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের কাছে লাগে না। ইদানীং কেউ তো কনভেণ্টেও মেয়ে পাঠাতে চাইছে না। চীনেদের নিজেদের স্কুল হয়েছে। ছেলেরা মেয়েরা সবাই আজকাল সেখানে যায়। সবই শেখে, শুধু যেটুকু থাকলে ফিরিঙ্গী মেয়েদের মতো আকর্ষণময় হয়ে ওঠা যায়, সেটুকু শেখে না।

সুতরাং বুড়ো ওয়াং তার বিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেও পারে নি। সে ফিরেই তাকায়নি নিজেদের সমাজের মেয়েদের দিকে। তার বন্ধু বান্ধব বান্ধবী সবই ফিরিঙ্গী, নয় ইহুদী নয় আর্মানী আর কিছু ফিরিঙ্গী বনে-যাওয়া ভারতীয়। স্নং-চাং-এর পোষাকের ছাঁট সাম্প্রতিকতম আমেরিকান—প্যাণ্ট কোমরের অনেক নীচে, সরু মুখটা গোড়ালি থেকে তিন ইঞ্চি উপরে। কোটে একটি মোটে বোতাম, কাঁধ অতিকায় রকম চওড়া, কোমর অত্যন্ত ঢোলা। চুলের সামনেটা এ্যালবার্ট। পায়ে রংদার মোজা, গলায় জমকালো টাই, মুখে কাও-বয় ইংরেজি।

সুতরাং দিলীপের ধমনীতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ইংরেজ-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে জেনে স্নং-চাং চট করে দিলীপকে পছন্দ করে বসলো। বললো, "একদিন এনে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। সে আমাদের ডিনার স্ট্যাণ্ড করুক, হুইস্কি স্ট্যাণ্ড করুক, তার পর দেখা যাবে তাকে আমরা পছন্দ করি কি করি না।"

এত সহজে সে মিনি ওয়াঙের ভাবী স্বামী আহ্-কিমকেও অনুমোদন করেনি। কারণ আহ্-কিমের ইংরেজি খুব পরিষ্কার নয়, সে জামা-কাপড়ে খুব কেতাদুরস্ত নয়, তার চেহারা খুব স্মার্ট নয়, সে একজন সাধারণ দোকানদার—আর তার দাদা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের একজন সাধারণ জুতোওয়ালা, নিজের হাতে কাস্টমারদের পায়ে জুতো পরিয়ে দেয়, দোকানের ভিতর হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে থাকে। আহ্-কিম্এর বৌদিকে তো দেখা গেছে বছর বছর সন্তান প্রসব করতে আর রান্নাঘরে বসে শূয়োরের চর্বিতে তরকারি রাঁধতে।

বুড়োরা বোঝে না। বললে চটে গিয়ে বলে, এদের কথা শোনো! সন্তান মেয়েরা প্রসব করবে না তো কে করবে? বছর বছর না করবে তো কি শতাব্দীতে একটি করে করবে? আমাদের মায়েরা করেনি? আমাদের ঠাকুরমায়েরা করেনি? ওরা কি আমাদের চাইতে কোনো অংশে খারাপ ছিলো?

সুতরাং মিনির বর হিসেবে আহ্-কিমকে বুড়ো ওয়াং আর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা পছন্দ করে ফেললেও সুং-চাং কোনো দিন তাকে অনুমোদন করতে পারেনি।

বরং এবার যখন দেখলো, জেনী ওয়াং এমন একজনকে পছন্দ করেছে যার শরীরে আছে ইংরেজ-রক্ত, তখন জেনীকে অনেক বেশী বুদ্ধিমান মনে হোলো মিনির চাইতে।

সুং-চাং সোজাসুজি বললে, "হুইস্কি জল মিশিয়েই খাও, আর সোডা মিশিয়েই খাও, হুইস্কি সে হুইস্কি।"

কিন্তু বড়ো ভাই চিয়েন-চাং চুপ করে রইলো।

"তুমি কিছু বলছো না যে দাই-কো," মিনি জিজ্ঞেস করলো।

জানলার আলশেতে পাইপ ঠুক-ঠুক করে ছাইটা ঝেড়ে ফেলে তন্দ্রালস উত্তর দিলো চিয়েন চাং, "ইণ্ডিয়ান, এঃ? তা মন্দ নয়, তবে ইণ্ডিয়ানদের চেনো না। তার রক্তে ইংরেজ-রক্তই থাক আর জাপানী রক্তই থাক

ইণ্ডিয়ানরা চিরকালই ইণ্ডিয়ান।—তবে শুধু ইণ্ডিয়ান বলেই আমি আপত্তি করার কোনো কারণ দেখি না, যেহেতু ওরা প্রায় আমাদের মতোই সভ্য জাত, শুধু আমাদের মতো রান্না জানে না।—আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের মধ্যেই যখন ভালো ছেলে আছে, তখন আর এই অচেনা ইণ্ডিয়ানকে কেন?"

"আমাদের মধ্যেই ভালো ছেলে? তুমি কার কথা বলছো?" জিজ্ঞেস করলো বুড়ো ওয়াং।

"কেন? ফেং চেং-শিয়াং? সে কি যোগ্য নয়?" বললো চিয়েন-চাং।

* আট *

ফেং চেং-শিয়াংএর সঙ্গে ওয়াংদের আলাপ খুব বেশী দিনের নয়।

বছর খানেক আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা চিয়েন-চাং হঠাৎ এনে হাজির করেছিলো চেং-শিয়াংকে।

জেনী তখন রান্নাঘরে। মিনি সবে মাত্র ফিরে এসেছে লণ্ড্রির দোকান থেকে। বুড়ো ওয়াং একটি দীর্ঘ দিবানিদ্রা শেষ করে উঠেছে কিছুক্ষণ আগে।

ওয়াংদের পরিবার এমনি খুব সাদাসিধে। অবস্থা স্বচ্ছল হলেও নিজেদের চলাফেরা আদব-কায়দায় সাধারণ চীনা পরিবারের সমস্ত প্রথাই বজায় রেখেছে। সম্প্রতি ছেলে-মেয়েরা ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শিখলেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কোনো ফিরিঙ্গীয়ানা ঢোকেনি তাদের বাড়িতে।

কিন্তু বড়ো ছেলে চিয়েন-চাং বদলাতে স্থুরু করেছিলো সম্প্রতি। দেখা গেল হলিউডের ছবি দেখতে দেখতে তার ইংরেজী কথাবার্তা একটু আমেরিকান ঢঙের হয়ে যাচ্ছে, তার চীনে কথার মধ্যে অনেক আমেরিকান বুকনি, গলায় জমকালো টাই, কিংবা গায়ে উগ্র রঙীন হাওয়াইআন শার্ট।

"এসব বর্বরদের দেশে বসবাস করার কোনো মানেই হয় না," সে বলতে স্থুরু করলো, "দেশ বলতে আমেরিকা। ওদের দেশে কী ফ্রীডম!"

"সেখানে গিয়ে থাকলেই পারো," জেনী একদিন হেসে বলেছিলো।

"স্থযোগ পেলেই চলে যাবো," উত্তর দিয়েছিলো চিয়েন-চাং, "হয়তো স্থযোগ পেয়েও যাবো শীগ্‌গিরই।"

জেনী অবাক হয়েছিলো। সে বলেছিলো হাল্কা ভাবে এবং তাতে চিয়েন-চাং এতটা গুরুত্ব আরোপ করবে ভাবতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিলো, "সত্যি সত্যি?"

চিয়েন-চাং-এর হাসি দেখে বুড়ো ওয়াংও একটু চিন্তিত হয়েছিলো। জিজ্ঞেস করেছিলো, "স্থযোগ পাবে মানে? স্থযোগের চেষ্টা করছো নাকি?"

ছেলে উত্তর দিলো, "চেষ্টা তো করছি বেশ কিছুদিন থেকে। এখন যোগাযোগ একটু হয়েছে। আমার এক বন্ধুর একজন আমেরিকান বন্ধু আছে। সে এখানে কনস্যুলেটে চাকরি করে। তার বাবার মস্তো বড়ো ফার্ম নিউ ইয়র্কে। সে তার বাবাকে লিখেছে, আমার একটা ব্যবস্থা যদি করতে পারে। ওর বাবার চিঠি পেলেই পাসপোর্টের জন্যে এপ্লাই করবো। ভিসা পেতে কোনো অসুবিধেই হবে না।"

বুড়ো ওয়াং কোনো উত্তর দেয়নি।

মিনি শুধু হেসে বলেছিলো, "ওখানে গিয়ে একটি হলিউডের স্টার বিয়ে করতে ভুলো না।"

"করবোই তো," বলেছিলো চিয়েন-চাং, "আমাদের এখানকার মেয়েদের চাইতে ওরা অনেক ভালো। তোমরা না জানো কথা বলতে, না জানো চলাফেরা করতে, না জানো মিশতে। আর ওদের মেয়েদের দেখ! কী সহজ ভাবে নেয় জীবনটাকে। তোমরা জানো রান্না করতে, ছেলেমেয়ের মা হতে। আর কিছু জানো না।"

"রান্না করতে, ছেলেমেয়ের মা হতে যে জানে," বুড়ো ওয়াং আস্তে আস্তে উত্তর দিয়েছিলো, "সে মেয়ে সবই জানে।" সে কথার উত্তর না দিয়ে চিয়েন চাং বলেছিলো, "জীবনে কিছু করতে চাও তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো, বাইরে চলে যাও, যে দেশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে সেখানে যাও।"

"আমাদের দেশও তো বড়ো হচ্ছে, সেখানে গেলেই হয়," মিনি বলেছিলো।

চীনে তখন গৃহযুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হয়েছে, কায়েম হয়েছে নতুন সাম্যবাদ।

চিয়েন-চাং হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো, "বড়ো হচ্ছে! সেই ধারণা নিয়েই থাকো।"

জেনী, মিনি আর বুড়ো ওয়াং মর্মাহত হোলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

শুধু ছোটো ভাই সুং-চাং বললো, "তোমরা যে যেখানে যাবে যাও,

আমি কলকাতা ছেড়ে নড়ছি না। আমার এখানেই বেশ ভালো লাগে।"

জেনী মিনি একটু হাসলো, কারণ সুং-চাংএর সঙ্গে সম্প্রতি ভাব হয়েছে ওয়েলেসলির এক ফিরিঙ্গী মেয়ের সঙ্গে। সুতরাং কলকাতা শহরকে তার ইদানীং স্বর্গ বলেই মনে হচ্ছে।

চিয়েন-চাং বললো, "আমার বন্ধুকে একদিন এখানে নিয়ে আসবো। আলাপ করিয়ে দেবো সবার সঙ্গে।"

"সেই আমেরিকান?" বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো।

"না, এ আমাদেরই লোক। এর নাম ফেং চেং-শিয়াং।"

"ফেং? কোন ফেং? ট্যাংরার?"

"না, না, এখানকার লোক সে নয়! সে আগে থাকতো নানকিংএ। ব্যাঙ্ক অফ চায়নায় বড়ো চাকরি করতো। যুদ্ধের পর ও-দেশ ছেড়ে ফরমোসায় চলে আসে। সেখান থেকে এখন কলকাতায় চলে এসেছে। এখানে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করে।"

শুনে জেনী মিনি একটু গম্ভীর হোলো।

"ওদের অনেক পয়সা," চিয়েন-চাং বলে চললো, "ওর স্বর্গীয় বাবা এককালে ব্যাঙ্ক অফ চায়নার ডিরেক্টর ছিলো। ওরা ক্যাণ্টনের ফেং।"

"ক্যাণ্টনের ফেং!" বুড়ো ওয়াং আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। দেশে না গেলেও, দেশের অনেক খবর সে রাখে। ক্যাণ্টনের ফেং-রা খুব অভিজাত বংশ।

"সে এখানে কি করতে এসেছে?" বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো।

"বললাম তো, ব্যবসা করতে এসেছে।"

"ব্যবসা ফরমোসায় বসে করলেই পারতো।"

"ওর ইচ্ছে হয়েছে, কলকাতায় এসেছে। তোমাদের অতো মাথাব্যথা কেন?" বিরক্ত হয়ে বললো চিয়েন-চাং।

"ওর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হোলো কি করে?"

"ওর অফিসে একটা কোটেশান চাইতে গিয়েছিলাম। সেখানে ভাব

হোলো। সে আমায় লাকে ডাকলো। সেখানে বন্ধুত্ব হোলো। তারপর ওর বাড়িতেও গেছি। ওর একটি বোন আছে। নাম টিং-লিং। খুব শিক্ষিত, কালচারড্, একমপ্লিশড! সুন্দর দেখতে!"

"ও, এই ব্যাপার!" জেনী আর মিনি হাসলো।

কিন্তু বুড়ো ওয়াং আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, "চিয়েন-চাং, আমরা ওয়াং, খুব সাধারণ লোক। ওরা ফেং। ফেংদের সঙ্গে ওয়াংদের বন্ধুত্ব হয় না। আমি তো কোনোদিনই শুনিনি, দেখিওনি।"

"বেশ তো, এবার দেখবে,' চিয়েন-চাং উত্তর দিলো।

"আগে যা হয়নি, এখন কি তা হবে?"

"ওল্ড বয়, এটা ডিমক্রেসির যুগ, আর ফেং চেং-শিয়াং পাক্কা ডিমক্র্যাট। ডিমক্রেসি ওর রক্তে রক্তে এমন ভাবে মিশে গেছে যে কম্যুনিস্টদের দেশে সে কিছুতেই থাকতে রাজী হোলো না। ও বলে, ও বছরখানেক পরে আমেরিকা চলে যাবে। ও আর ওর বোন টিং-লিং তো আমেরিকায় বড়ো হয়েছে। টিং-লিং কিছুদিনের জন্যে এখানে এসেছে। আবার চলে যাবে।"

জেনী আর মিনি আবার মুখ টিপে হাসলো।

বুড়ো ওয়াং আস্তে আস্তে বললো, দেখ চিয়েন-চাং, তোমার এসব কথাবার্তা আমার ভালো লাগছে না। আমরা এদেশে থেকেছি, বড়ো হয়েছি, এখানে ঘর করেছি, খুব দরকার না পড়লে ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া আমি ভালো মনে করি না। দেশের অবস্থা এখন খুব গোলমেলে, তোমাকে সেখানেও যেতে বলছি না। তবে আমেরিকাও আমাদের নিজের দেশ নয়, তাই এখানে খাবার সংস্থান থাকলে এসব ছেড়ে সেখানে যাও, তাও আমি চাই না। যদি যেতে হয় সুং-চাং যাবে। তুমি বড়ো ছেলে। তুমি বাড়িতে থাকবে। তোমাকে তোমার বোনেদের বিয়ে দিতে হবে। আমি বুড়ো হয়েছি। আমার দেখাশোনা করতে হবে। আর তোমাকে বিয়েও করতে হবে। ওয়াং বংশ টিকিয়ে রাখতে হবে। পূর্ব-পুরুষদের আত্মাদের পরিতুষ্ট রাখতে হবে—।"

"বিয়ে?" চিয়েন-চাং হেসে উঠলো, "এখন? অসম্ভব! আমার পছন্দ হবে এরকম মেয়ে এদেশে নেই। হ্যাঁ, একটা দুটো যে দেখা যায় না, তা নয়, তবে ওরা ঠিক এদেশের বাসিন্দা নয়— ।"

জেনী আর মিনি হেসে ফেললো।

বুড়ো ওয়াং গম্ভীর হয়ে বলে গেল, "দেখ, তুমি যদি টিং-লিংএর কথা ভেবে থাকো তো আমি বলবো তুমি একটি আহাম্মক। ফেং-রা কোনো দিন ওয়াং-দের বিয়ে করে না। তার উপর টিং-লিং আমেরিকায় বড়ো হওয়া মেয়ে। তবে সে যদি সত্যি সত্যি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়, তা'হলে আমি বলবো সেটা ভালো কাজ হবে না। তা'তে তুমি অসুখী হবে, আমি অসুখী হবো, তোমার ভাই-বোনেরা অসুখী হবে।"

"কেন?" লাল হয়ে জিজ্ঞেস করলো চিয়েন-চাং।

বুড়ো ওয়াং উত্তর দিলো, "টিং-লিং তোমার বোনেদের মতো রান্না করতে পারবে না, ওদের মতো খাটতে পারবে না, কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। তার উপর শুনেছি, এসব বিদেশ-বনে-যাওয়া মেয়েরা বেশী ছেলে-মেয়ে হওয়া পছন্দ করে না। সেটা ওয়াং বংশের পক্ষে খুব বাঞ্ছনীয় নয়। পূর্বপুরুষের আত্মারা তাতে অসন্তুষ্ট হবেন — ।"

চিয়েন-চাং হাসতে লাগলো বুড়ো ওয়াং-এর কথা শুনে। বললো, "তোমরা তোমাদের পুরোনো ধারণা নিয়েই আছো। সময়টা যে বদলে যাচ্ছে, তোমাদের সে খেয়াল নেই?"

"সময়টা যে বদলে যাচ্ছে সে খেয়াল আমার খুবই আছে, কিন্তু কতগুলো জিনিস যে বদলায় না, চিরকাল যা চলে আসছে, ভবিষ্যতেও তাই চলতে থাকবে, সে খেয়াল নেই তোমার মতো অর্বাচীনের।"

"যেমন?" ভুরু কুঁচকালো চিয়েন-চাং।

"তুমি কি বলতে চাও," বুড়ো ওয়াং জিজ্ঞেস করলো, "সময় বদলে যাচ্ছে বলে মেয়েরা আর রান্না করবে না? তুমি কি বলতে চাও মেয়েরা আর ছেলে-মেয়ের মা হবে না?"

"বুড়োদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা," উত্তর দিলো চিয়েন-চাং, "আমাদের কথা তোমরা বুঝবে না, তোমাদের কথা আমরা বুঝবো না।"

বুড়ো ওয়াং আর কোনো কথা বললো না। আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

মিনি বললো, "কেন তর্ক করে বাবার মনে কষ্ট দাও? চুপচাপ শুনে গেলেই পারো।"

"উনি যদি নিজে ইচ্ছে করেই কষ্ট পান, আমি কি করতে পারি বলো?"

জেনী জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা দাই-কো, একটা কথা বলবে?"

"কি কথা?"

"তুমি কি টিং-লিং-এর প্রেমে পড়েছো?"

"না, ঠিক তা' নয়," চিয়েন-চাং উত্তর দিলো, "আমরা এমনি বন্ধু, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

"বেশ তো। কিন্তু, তুমি যদি কোনোদিন ওকে বিয়ে করতে চাও, সে কি রাজী হবে?"

চিয়েন-চাং একটু মাথা চুলকালো, তারপর বললো, "দেখ, ও যদি রাজী হয়ও বা, আমি রাজী হবো না। তার আগে আমার অনেক টাকা দরকার। আর সে টাকা এদেশে হবে না। তাই ঠিক করেছি আমেরিকা যাবো। ওরাও যাবে। আর আমেরিকা হোলো ডিমক্রেসি। আমার বাবা কি, আর ওর বাবা কে, ওসব প্রশ্ন ওদেশে ওঠে না। আমার টাকা থাকলেই হোলো। তা হলেই আর বিয়ে করায় কোনো অসুবিধে হবে না।"

"ও," মিনি আস্তে আস্তে বললো, "সে তাহলে তোমায় টাকার জন্যে বিয়ে করবে!"

"তোমাদের মন অত্যন্ত ছোটো," চিয়েন-চাং চটে গিয়ে উত্তর দিলো, "সে কথা কে বলেছে? আমি কতকগুলো প্র্যাকটিক্যাল সুবিধে-অসুবিধের কথা বললাম মাত্র।"

"থাক, থাক, আর চটাচটি করতে হবে না," জেনী মাঝখানে পড়ে বললো।

"ওদের কাউকে তো তোমরা চোখেও দেখনি," বললো চিয়েন-চাং, "আগে ওদের নিয়ে আসি আমাদের বাড়ি, তারপর যা হোক একটা কিছু ধারণা করে নিও।"

"টিং-লিংকেও নিয়ে আসবে?" মিনি জিজ্ঞেস করলো।

"না, টিং-লিংকে নয়। আগে চেং-শিয়াংকে নিয়ে আসি। একটু যাওয়া আসা অন্তরঙ্গতা সুরু হোক। তারপর টিং-লিংও আসবে।"

"কবে আনবে?"

"আনবো ইতিমধ্যে একদিন।"

"আগে থেকে বলে রেখো কিন্তু—।"

কিন্তু আগে থেকে কিছু বলে রাখলো না ওয়াং চিয়েন-চাং।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা এনে হাজির করলো ফেং চেং-শিয়াংকে।

মিনি তখন সবে কাজ থেকে ফিরেছে, হাত-মুখও ধোয়নি, মুখটা তার ঘামে চিক-চিক করছে।

জেনী রান্নাঘরে ব্যস্ত। তার কোমরে জড়ানো এপ্রনটি আধ-ময়লা।

বুড়ো ওয়াং জানলার ধারে বসে বাইরের পৃথিবীকে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করছে।

এমন সময় চিয়েন-চাং এলো। সঙ্গে এলো চেং-শিয়াং।

প্রথম আলাপ করিয়ে দেওয়া হোলো বুড়ো ওয়াংএর সঙ্গে।

কিন্তু চীন দেশ ছেড়ে এসে কো-তাও করতে ভুলে গেছে ফেং চেং-শিয়াং। সে একটু নত করে বললো, "গ্ল্যাড টু মীট ইউ।"

বুড়ো ওয়াং প্রশান্ত ভাবে উত্তর দিলো তার অতিথিকে, "তুমি এসেছো বলে আমিও খুব খুশী হয়েছি। ফেং-বংশের এক যোগ্য ব্যক্তির আগমনে

ওয়াং পরিবারের এই ক্ষুদ্র গৃহখানি ধন্য হোলো। ওই চেয়ারখানি বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে। তুমি সেখানে বসে আমাকে কৃতার্থ করো।"

বিশুদ্ধ চৈনিক আপ্যায়নে ফেং চেং-শিয়াং একটু যেন অপ্রস্তুত হোলো। একটু 'বাও' করে চুপচাপ নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে পড়লো।

"তোমার ভাই-বোনদের ডাকো," চিয়েন-চাংকে বললো বুড়ো ওয়াং, "ওরা এসে আমাদের সম্মানিত অতিথির পরিচর্যা করুক।"

বাপের অতিরিক্ত সৌজন্যে চিয়েন-চাংএর শরীর জ্বলে গেল। কিন্তু কোনো বিরক্তি প্রকাশ না করে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে জেনীকে ডেকে বললো, "জেনী, মিস্টার ফেং এসেছেন—।"

জেনী তেমনিই বেরিয়ে এলো, এমন কি কোমরের এপ্রনখানিও না ছেড়েই। জেনীর পেছনে পেছনে এলো মিনি, তার সেই চিকচিকে মুখ নিয়ে।

অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এলো স্নং-চাং।

চিয়েন-চাং চেং-শিয়াংএর সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিলো। চেং-শিয়াং তার স্বভাবসুলভ পাশ্চাত্য সৌজন্য প্রকাশ করলো।

মিনির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো সে। শীর্ণ দেহের উপর কর্মক্লান্ত দিনান্তের ম্লান মুখখানি তার ভালো লাগলো না। সে চোখ ফিরিয়ে তাকালো জেনীর দিকে।

জেনীর দেহের গঠন খুব মজবুত, সুঠাম। উনুনের আঁচে লাল মুখখানি বেশ ঢলঢলে, ফরসা। তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখলো চেং-শিয়াং।

জেনী তাকিয়ে দেখলো চেং-শিয়াংএর চোখের দিকে। দেখলো—সেই চোখ, যে চোখ নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চীনের অভিজাত জমিদারেরা তাকিয়েছে কর্মচঞ্চল সুঠাম কৃষক যুবতীর দিকে।

জেনী একটু হাসলো। ছুরির ধার মিশিয়ে দিলো সেই হাসিতে।

শুধু জেনী বুঝলো আর চেং-শিয়াং বুঝলো। আর কেউ লক্ষ্য করলো না।

এক মুহূর্তের জন্যে লাল হয়ে উঠলো চেং-শিয়াংএর কান। সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে খুব সহজ ভাবে বললো, "চিয়েন-চাং আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হলাম। আশা করি আমরাও খুব বন্ধু হবো।"

"হ্যাঁ, আশা আমরাও করি," জেনীও উত্তর দিলো খুব সহজ ভাবে।

"এখন একটু চা খাওয়া যাক," বললো চিয়েন-চাং।

"হ্যাঁ, চা এখনই এসে যাবে," জেনী বললো।

"শুধু চা, আর কিছু নয়," বলে উঠলো, চেং-শিয়াং, "আমার অন্য প্রস্তাব আছে।"

সবাই তাকালো তার দিকে।

"আজ চিয়েং-চাং আর তার ভাই-বোনেরা আমার অতিথি। আমরা আজ ডিনার খাবো বাইরে কোথাও।"

* নয় *

সেদিন থেকে ফেং চেং-শিয়াং-এর গতিবিধি সুরু হোলো ওয়াংদের বাড়িতে। সুং-চাং-এর সঙ্গেও খুব সখ্যতা হয়ে গেল। মিনিরও মনে হোলো লোকটা মন্দ নয়। শুধু জেনী পছন্দ করলো না তার এই আসা যাওয়া। তবে মুখে সে কিছুই বললো না। বরং খুবই ভদ্র ব্যবহার করতো চেং-শিয়াং-এর সঙ্গে।

কিছুদিন পর একদিন টিং-লিংকেও নিয়ে এলো চেং-শিয়াং। প্রথমটা তার পোশাক প্রসাধন ধরণ-ধারণ ভালো না লাগলেও তার মিষ্টি ব্যবহারে বুড়ো ওয়াংও যেন গলতে সুরু করলো একটু একটু করে।

বললো, "যতোই আমেরিকায় থাকুক, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হোক, চীনা মেয়ে চীনা মেয়েই থাকবে। আমাদের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি এত প্রাচীন যে, এদের এসব নতুন ভাবধারা উপর উপরই থেকে যায়, মনের গভীরে ঢুকতে পারে না।"

জেনী মিনি ভাবলো, টিং-লিং নাই বা হোলো আমাদের মতন, আমাদের দাই-কো যদি তাকে বিয়ে করে সুখী হয়, আমরা মানা করতে যাবো কেন? তা' ছাড়া দাই-কো আমেরিকা যখন যাবেই ঠিক করেছে, সেখানে গিয়ে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করার চাইতে টিং-লিংকে বিয়ে করা অনেক ভালো। আর যাই হোক, ওয়াংদের রক্তে বিদেশী রক্তের ভেজাল থাকবে না।

জেনী, মিনি আর টিং-লিং তেমনটা অন্তরঙ্গ হতে পারলো না অতো যাওয়া আসা সত্ত্বেও, তবে একটা সহজ সদ্ভাব গড়ে উঠলো তাদের মধ্যে।

চেং-শিয়াংকেও দেখা গেল, খুব ভদ্র ব্যবহারই করছে জেনীর সঙ্গে। তার সেই অস্বাভাবিক কামনা-দহন চাউনি সে ওই প্রথম দিনেই দিয়েছিলো, —তার পুনরাবৃত্তি আর কোনোদিনই হয় নি।

সুতরাং এরাও যেতে সুরু করলো টিং-লিং চেং-শিয়াংদের সাহেব পাড়ার

ফ্ল্যাটে। চেং-শিয়াং কয়েক বার পার্টি দিয়েছিলো তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে আরেক ধরণের দ্রুতলয় সমাজ-জীবনের পরিচয় লাভ করেছিলো জেনী আর মিনি। তা' ছাড়া দুই পরিবারের ভাই-বোনেরা মিলে মাঝে মাঝে বাইরে বেরোতো, এখানে ওখানে সেখানে।

একবার মিনি নিয়ে এসেছিলো আহ্-কিমকে, চিয়েন চাংএর আপত্তি সত্ত্বেও।

আহ্-কিম্‌কে দেখে ভুরু কুঞ্চিত করলো চেং-শিয়াং।

"ও কে ?" চেং-শিয়াং জিজ্ঞেস করলো চিয়েন-চাংকে।

"আমার বোন যেখানে চাকরি করে, সেই ফার্মের মালিক," বললো চিয়েন চাং, তার পর একটু হেসে জুড়ে দিলো, "এবং ভাবী স্বামী।"

শুনে চুপ করে রইলো চেং-শিয়াং।

"এই লোকটি কে" ? আহ্-কিম জিজ্ঞেস করেছিলো মিনিকে।

"ওই যে টিং-লিং মেয়েটি, যাকে বিয়ে করবে আমাদের দাই-কো, তার বড়ো ভাই।"

শুনে আর কোনো কথা বললো না আহ্-কিম।

তারপর সারাটা ক্ষণ আহ্-কিম আর চেং-শিয়াং কেউ কারো দিকে তাকালোও না, কথাও বললো না।

সবাই চলে যাওয়ার পর চিয়েন-চাং মিনিকে বললো, "আমি আগেই বলেছিলাম আহ্-কিমকে ডেকো না। ওকে চেং-শিয়াংএর ভালো লাগবে না। এখন দেখলে তো ?"

"কেন ? কি হয়েছে ?" জিজ্ঞেস করলো সুং-চাং।

"সবাই জানে আহ্-কিম্ মাও-সে-তুংএর সমর্থক আর চেং-শিয়াং দেশ ছেড়ে ফরমোসায় চলে এসেছিলো। এরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

"এটা কলকাতা," উত্তর দিলো মিনি, "এবং বাড়িটা আমাদের।"

"যাই হোক, যেদিন এখানে ফেং-রা আসবে সেদিন আহ্-কিমকে ডেকো না।"

সেদিন থেকে মিনিও মেলামেশা বন্ধ করলো চেং-শিয়াংএর সঙ্গে। ও একা এলে আসতোই না ওর সামনে। শুধু টিং-লিং এলে, বেরিয়ে এসে একটু গল্প করতো তার সঙ্গে, পারিবারিক সৌজন্য বজায় রাখবার জন্যে।

জেনীও ফেংদের সঙ্গে বেরোনো বন্ধ করেছিলো। তবে চেং-শিয়াং এলে এমনি বসে গল্প করতো, চা খাওয়াতো, ভাবতো, যাই হোক, টিং-লিংকে দাই-কো বিয়ে করবে, স্থতরাং এটুকু না করলে কি করে চলে! আহ্-কিমকে মিনি বিয়ে করবে, তাই সে চেং-শিয়াংকে না হয় এড়িয়ে চলে। ওদের রাজনীতি নিয়ে ওরা থাকুক। আমার কি? সবাই যে যার মতন স্থখী হলেই আমি খুশি।

চেং-শিয়াং সাধারণত চিয়েন-চাংএর সঙ্গে আসতো, কিংবা যে সময় চিয়েন-চাং বাড়ি থাকতো শুধু সে সময়ই আসতো।

একদিন এলো যখন চিয়েন-চাং বাড়ি নেই, স্থং-চাও নেই, মিনিও ফেরেনি তার লণ্ড্রি থেকে, বুড়ো ওয়াং ভেতরে ঘুমাচ্ছে। জেনী একটু অবাক হোলো।

জেনীর বিস্ময় চেং-শিয়াং অনুধাবন করলো।

বললো, "জেনী, আজ শুধু তোমার কাছে আসবো বলেই এ-রকম সময় এসেছি।"

"শুধু আমার কাছে? কেন?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"একটা কথা ছিলো তোমার সঙ্গে।"

"আমার সঙ্গে? কি কথা?"

চেং-শিয়াং তার সোনায় বাঁধানো দাঁতে একটুখানি হাসির ঝিলিক খেলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "জেনী, আমায় বিয়ে করবে?"

ফেং চেং-শিয়াং যখন তার সোনায়-বাঁধানো দাঁতে একটুখানি হাসির ঝিলিক খেলিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—"জেনী, আমায় বিয়ে করবে?" জেনী সোজাস্থজি করবে-না বলতে বলতেও বললো না।

জেনী ভাবলো, চেং-শিয়াংকে যদি সে নিজেই নাকচ করে দেয় তাহলে বড়ো ভাই চিয়েন চাং-এর সঙ্গে একটা কলহ অনিবার্য—কারণ প্রথমত চেং-শিয়াং-এর কাছ থেকে কিছু অর্ডার পায় চিয়েন চাং, দ্বিতীয়ত চেং-শিয়াং-এর বোনটি টিং লিং-এর সঙ্গে তার কিছু ভবিষ্যতের স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। তাই নিজের থেকে কোনো কথা বলতে চাইলো না সে।

শুধু বললো. "চেং-শিয়াং, আমরা পশ্চিম দেশের মেয়েদের মতো নই যে, নিজেদের বিয়ে নিজেরা ঠিক করবো। আমাদের পরিবার খুব রক্ষণশীল। তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করো। তিনি যা বলবেন তাই হবে!"

চেং-শিয়াং যখন বুড়ো ওয়াং-এর কাছে গিয়ে বললো, বুড়ো ওয়াং-এর মনে তার তিরিশ বছর আগেকার চায়না টাউনের গুণ্ডাসর্দারের প্রবৃত্তিগুলো হঠাৎ জেগে উঠলো। কিন্তু তিরিশ বছর আগেকার ওয়াং আর এই ওয়াং-এ অনেক তফাৎ। কাঠের চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে হাতের মালা ঘুরিয়ে চললো বুড়ো ওয়াং।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, "চেং-শিয়াং ক্যাণ্টনের ফেং বংশের একজন যোগ্য সন্তানের কাছে থেকে এই প্রস্তাব পেয়ে ফুকিয়েনের ওয়াং বংশ ধন্য ও সম্মানি হোলো। ওয়াং বংশের মেয়ের ফেং বংশের ছেলের পায়ের নখের ধুলো হবার যোগতাও নেই।"

"আমি যদি যোগ্য মনে করি,—" বলে উঠলো অধৈর্য চেং-শিয়াং।

"আমায় বলতে দাও," বুড়ো ওয়াং বাধা দিয়ে বললো, "আমি কি বলছিলাম জানো? আমি বলছিলাম ফেং বংশের লোকেরা খুব উদার। তাই তুমি জেনীকে দেখে করুণাপ্লুত হয়ে এই প্রস্তাব করেছো। হয়তো পরে এই আকস্মিক করুণার জন্যে তোমার অনুশোচনা হতে পারে। সুতরাং বৃথা চঞ্চল না হয়ে তুমি ভালো করে ভেবে দেখ।"

"আমি ভালো করেই ভেবে দেখেছি," চেং শিয়াং উত্তর দিলো।

"এত তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই", বললো বুড়ো ওয়াং, "এক বছর পরেও যদি তোমার মনে হয় তুমি জেনীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চাও,

তখন আমায় এসে বলো। আমি তখন জেনীর ভবিষ্যৎ সুখের জন্যে তার বাবা হিসেবে যা করা কর্তব্য মনে করবো, তাই করবো।"

"কিন্তু—"

"আমি যা বলেছি, এর বেশী কিছু এখন আর বলতে চাই না," বুড়ো ওয়াং শেষ করলো। "তবে তুমি আমার ছেলের বন্ধু। সুতরাং ছেলের বন্ধুর মতো এ বাড়িতে যাওয়া-আসা করবে। ছেলের বন্ধুর মতোই সবার সঙ্গে মিশবে। সবার সঙ্গে দেখা হবে, কথাবার্তা হবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন," বলে চক্ষু নিমীলিত করলো বুড়ো ওয়াং।

ফেং চেং-শিয়াকে উঠে পড়তে হোলো।

আড়াল থেকে জেনী আর মিনি এদের কথাবার্তা সবই শুনতে পেয়েছিলো।

জেনী খুশি হয়েছিলো খুব। আর মিনি তো হেসে খুন। "ওল্ড ম্যান ভীষণ চালাক", মিনি হেসে বলেছিলো। জেনী হেসে মিনির হাতে চিমটি কাটলো।

মিনি হাসতে হাসতে বললো, "এবার একদিন তোমার বাঙালী বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।"

জেনী যেদিন দিলীপকে প্রথম এ বাড়িতে নিয়ে এলো সেদিন বাড়িতে বাইরের লোক কেউ ছিলো না। মিনি খুব খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি চায়ের ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

দিলীপের মুখে নির্ভুল ইংরেজি শুনে সুং-চাং খুব বিমুগ্ধ। তার উপর যখন শুনলো সে খুব ভালো ওয়লজ্ আর জিটারবাগ জানে তখন তার উপর সুং-চাং এর শ্রদ্ধার আর সীমা রইলো না।

বললো, "তুমি তো অন্য বাঙালী ছেলেদের মতো নও! তুমি কোন কোন জায়গায় যাও নাচের রাত্রিতে? তোমায় দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না!"

দিলীপ উত্তর দিলো, "আমি কিন্তু তোমায় দেখেছি। পরশু দিনও তুমি

গোল্ডেন স্লিপারে ছিলে। আমার যতদূর মনে পড়ে তুমি রোজীর সঙ্গে নাচছিলে।"

"রোজীকে তুমি চেনো?" সুং চাং জিজ্ঞেস করলো।

"রোজীকে ঠিক চিনি না, তবে রোজীর বড়ো বোন অল্‌গাকে খুব ভালো করে চিনি।"

দিলীপ চলবে,—সুং চাং নিশ্চিত হোলো। তার প্রণয়িনী রোজীর দিদি অল্‌গা তাকে চেনে, ব্যস্‌, এর বেশী পরিচয় আর দরকার নেই।

কিন্তু চিয়েন-চাং অতো সহজ ভাবে নিতে পারলো না দিলীপকে। খুব মামুলী সৌজন্যে দু-চারটা কথাবার্তা ছাড়া বিশেষ কিছুই বলছিলো না সে। তা দিলীপকে দেখে এমন কিছু অর্থবান বলেও তার মনে হোলো না। এবং অর্থবান নয়, এরকম বিদেশীর উপর তার আগ্রহ খুবই কম।

সেই দু-চারটা কথাবার্তার ফাঁকে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কিসের ব্যবসা করো?"

"যা সামনে আসে, যার থেকে দুটো পয়সা হয়, তাই করি," দিলীপ উত্তর দিলো, "কোনো বিশেষ লাইন আমার নেই।"

"এখন কিসের ব্যবসা করছো?" জিজ্ঞেসে করলো চিয়েন-চাং।

"স্ক্র্যাপ।"

"স্ক্র্যাপ?" চিয়েন-চাং ভুরু কুঞ্চিত করলো, "স্ক্র্যাপ বেচবার চেষ্টা করেছো বুঝি? বাজারে তো এখন ক্রেতা বেশী নেই।"

দিলীপ একটু হেসে উত্তর দিলো, "না, বেশী নেই! তবে তাদের মধ্যে আমি একজন। আমার হাতে একটি পার্টি আছে, ওরা কিনছে। আমার সন্ধানে যা ছিলো তা ওদের দিয়েছি। তবে তাতে কুলোয়নি। আমার আরো কিছু লাগবে।"

"তাই নাকি!" লাফিয়ে উঠলো চিয়েন-চাং। তার হাতে একটি পার্টি আছে যে স্ক্র্যাপ বেচবার চেষ্টা করছে। এমন সুযোগ নাক উঁচু করে অবহেলা করলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, সে ভাবলো।

মিনিট পোনেরোর মধ্যে সে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে গল্প করতে লাগলো দিলীপের সঙ্গে। মিনিট পঁচিশের মধ্যে তাকে প্রিন্সেস্‌এ মদ্যপান করবার আমন্ত্রণ জানালো। তার পর দিন দিলীপের অফিসে গিয়ে দেখা করলো। ব্যবসার কথাবার্তা পাড়লো।

তিন দিনের মধ্যে লেন-দেন চুকে গেল। কিছু অর্থ রোজগার করলো চিয়েন-চাং। আর লক্ষ্য করলো যে বাজারে দিলীপের অসংখ্য যোগাযোগ। তবে যে পরিমাণে ধূর্ততা থাকলে এই যোগাযোগগুলো কাজে লাগানো যায়, দিলীপের সেটা নেই বলেই সে খুব বেশী কিছু করতে পারছে না।

এ লোককে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না, স্থির করলো চিয়েন-চাং।

জেনীর ব্যাপার জেনী বুঝবে, চেং-শিয়াং বুঝবে, সে ভাবলো, আর যেহেতু চেং-শিয়াং অত্যন্ত ধনবান লোক, তার স্বজাতি, সুতরাং জেনী যে শেষ পর্যন্ত দিলীপের মোহ কাটিয়ে চেং-শিয়াং এর উপরে মনোনিবেশ করবে তাতে চিয়েন-চাং এর কোনো সন্দেহ ছিলো না। যদি চেং-শিয়াং জেনীর মন জয় করতে না পারে, সে চেং-শিয়াংএর দোষ। চিয়েন-চাং তাকে বাড়িতে এনে জেনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, ভাব করবার সুযোগ করে দিয়েছে, এর এর বেশী আর কী করতে পারে? জেনী যদি দিলীপকে পছন্দ করে, চিয়েন-চাং তাতে বাধা দেওয়ার কে?

সুতরাং জেনীদের বাড়িতে দিলীপের নিয়মিত আসা-যাওয়া সুরু হোলো আর সেখানে আলাপ হলো হাশিম সুলেমান, জয়প্রকাশ ত্রিবেদী, মা থিন চ্যি, ম্যাবেল রবিনসন, হেনরি লরেন্স প্রভৃতি চিয়েন-চাং জেনী মিনিদের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে।

* দশ *

মাঝখানে কয়েক দিন জেনীদের বাড়িতে যায়নি চেং-শিয়াং। একদিন সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে দেখলো ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মিনি আর আহ্-কিম। ফুটপাথের পাশে সে গাড়ি থামালো, ইচ্ছে তার জেনীর খবর একবার মিনিকে জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু মিনি কোনো কথা বললো না, শুধু একটু নড্ করে হেঁটে চলে গেল।

চেং শিয়াং লক্ষ্য করলো যে মিনি আর আহ্-কিম দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে একটা অর্থসূচক হাসি হাসলো। সেই হাসি চেং-শিয়াংএর ভালো লাগলো না।

মিনি যে তাকে এড়িয়ে চলে সেটা সে যে লক্ষ্য করেনি তা নয়, তবে আগে এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে। তার লক্ষ্য জেনী। জেনীর বোন মিনি বাড়িতে তার সামনে বেরোলো না সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে তার মনে হয় নি কোনোদিন।

কিন্তু আহ্-কিম্এর সামনে মিনির এই তাচ্ছিল্য তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। সে জানে আহ্-কিম্ মাওৎ-সে-তুঙের সমর্থক, আহ্-কিম্ কলকাতার এক প্রগতিশীল চীনা যুবক সমিতির সেক্রেটারি, যেই সমিতির কার্যকলাপ বানচাল করে দেওয়ার জন্যে জাতীয়তাবাদী অর্থবান চীনাদের টাকা অজস্র খরচা করা হচ্ছে।

সুতরাং আহ্-কিমের সামনে মিনির এই ব্যবহারে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলো। দাঁতে দাঁত ঘষে সে ভাবলো, আচ্ছা, এর শোধ আমি নেবো। এমন শিক্ষা দেবো মিনিকে !

কয়েক দিন গাড়ি নিয়ে সে আহ্-কিমের লণ্ড্রির কিছু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো। কিন্তু একা পাওয়া যায় না মিনিকে। সে প্রত্যেকদিনই বেরোয়

আহ্-কিম্এর সঙ্গে। আহ্-কিম্ তাকে প্রায়ই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। দিন সাত-আট পরে একদিন দেখলো মিনি কাজের শেষে একাই বেরোচ্ছে।

খুব কাজের চাপ ছিলো সেদিন, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে মিনি দোকান থেকে বেরোলো—আর আহ্-কিম বেরোনোর ফুরসতই পেলো না।

ক্লান্ত পদক্ষেপে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ফুটপাথ ধরে পথ চলছিলো মিনি ওয়াং। এমন সময় ফুটপাথের পাশে চেং-শিয়াংএর গাড়ি এসে ব্রেক কষলো।

গাড়ির ভেতর থেকে চেং-শিয়াং ডেকে বললো "গাড়ির ভেতর এসো। তোমাদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছি।"

সেদিন মিনি খুব ক্লান্ত। চেং-শিয়াংকে যতোই অপছন্দ করুক সে, তাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবার ইচ্ছে হোলো না।

এটুকু পথ, মিনিট পাঁচেক লাগবে, কী আর ক্ষতি তাতে—মিনি ভাবলো।

একটু ভদ্রতার হাসি হেসে সে গাড়িতে চেং-শিয়াংএর পাশে এসে বসলো। চেং-শিয়াং গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো এসপ্লানেডের দিকে। মিনি একটু অবাক হয়ে চোখ তুলে চেং-শিয়াংএর দিকে তাকালো।

"লিওসে স্ট্রীটের একটা দোকানে সামান্য একটা কাজ আছে," চেং-শিয়াং বললো, "সেটা চট করে সেরে নি। দু' মিনিট লাগবে। তোমার সময় নষ্ট হবে না। হেঁটে যেতে তোমার যতক্ষণ লাগতো, তার আগে আমরা বাড়ি পৌঁছে যাবো।"

মিনি আস্তে আস্তে বললো, "লিওসে স্ট্রীটে যাওয়ার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। আমায় এখানে নামিয়ে দিলেই ভালো হয়।"

চেং-শিয়াং হাসলো, বললো, "আমাকে ভয় কিসের মিনি! আমি তোমার ভাবী ভগ্নীপতি। তোমায় লিওসে স্ট্রীটে না নিয়ে যদি রেড রোডের এক পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কিছুক্ষণ বসে গল্প করি, তাতে কোনো দোষ হয় না, কেউ কিছু বলবেও না।"

শুনে মিনি চুপ করে রইলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলো নিজের মনে।

সেই হাসি অবলোকন করে চেং-শিয়াং পুলকিত হোলো। স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে তার নিজের জ্ঞান এবং যে-কোনো মেয়েকে আকর্ষণ করবার মতো নিজের শক্তি ও ব্যক্তিত্বের উপর তার আস্থা বেড়ে গেল।

খুব খুশি হয়ে বললো, "মিনি, তুমি একটি স্পোর্ট। তোমার দিদির চাইতে অনেক বেশী।"

এসপ্লানেডের মোড়ে লাল আলো।

চেং-শিয়াং গাড়ি থামালো। ডান দিক থেকে একটি ট্যাক্সি এসে তার সামনে আড় ভাবে দাঁড়ালো।

খুব বিরক্ত হয়ে সেদিকে তাকালো চেং-শিয়াং। শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের উপর তার ভীষণ রাগ। কিন্তু গাড়ির আরোহীদের দিকে তাকাতে তার রাগ জল হয়ে গেল। দুটি পক্কবিম্বাধরা পাঞ্জাবী মেয়ে সেখানে বসে।

তারপর মনের খুশিতে মিনির দিকে ফিরে কি যেন একটা বলতে গিয়ে দেখে, সীট খালি। মিনি নেই। দরজা খোলা।

ওদিকে তাকিয়ে দেখে, রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে উঠে হন-হন করে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের দিকে ফিরে যাচ্ছে মিনি ওয়াং।

লাল আলো হলদে হোলো, তারপর সবুজ হোলো।

পেছন থেকে অন্য গাড়িগুলো অধৈর্য হয়ে হর্ন দিচ্ছে।

নিরুপায় চেং-শিয়াং তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ঝুঁকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো চৌরঙ্গির দিকে।

তার আরো রাগ হোলো মিনির উপর। ভাবলো, নাঃ, মিনিকে যতোটা ভালোমানুষ ভেবেছিলাম, ততোটা নয়।

তার পরদিন সে আবার গাড়ি নিয়ে গেল আহ-কিম্‌এর লণ্ড্রির সামনে। সেদিন মিনিকে পেলো না। সে গিয়ে পৌছানোর আগেই মিনি চলে গেছে। তার পরদিন আবার গেল।

সেদিনও মিনিকে ধরা হোলো না। কারণ সে আর আহ্-কিম্ একসঙ্গেই বেরোলো দোকান থেকে।

চেং-শিয়াং সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার ছেলে নয়। সে আবার গেল পরদিন। সেদিন সুযোগ পেলো। দেখলো মিনি আহ্-কিম্-এর দোকান থেকে একলা বেরিয়ে আসছে।

মিনি খানিকটা এগিয়ে যেতেই চেং-শিয়াং গাড়িটা নিয়ে গিয়ে ফুটপাথের পাশে দাঁড় করালো।

তারপর ডাকলো "মিনি— !"

মিনি ওয়াং তার ডাকে সাড়া দেবে কিনা সে সম্বন্ধে একটু সন্দেহ ছিলো চেং-শিয়াংএর মনে।

কিন্তু অবাক হোলো যখন দেখলো, মিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখে ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর আস্তে আস্তে তার গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো।

চেং-শিয়াং অবাক হোলো, খুশিও হোলো। বললো, "সেদিন তুমি আমায় না বলে গাড়ি থেকে নেমে গেলে মিনি! আমি খুব দুঃখিত হয়েছিলাম।"

মিনি কোনো উত্তর দিলো না।

"কোথায় যাচ্ছো? বাড়ি? এসো, গাড়ির ভেতর উঠে এসো। তোমায় পৌঁছে দিই।"

মিনির উত্তর এলো না। কিন্তু পেছন থেকে কাঁধের উপর টোকা পড়লো।

ফিরে তাকিয়ে চেং-শিয়াং দেখে, আহ্-কিম্ এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ির অন্য পাশে।

আহ্-কিম্ বললো, "বন্ধু, দিদির সঙ্গে বিয়ের কথা তুলবার পর বোনকে জোর করে গাড়িতে তুলে রেড রোডে হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করাটা খুব সমর্থনযোগ্য নয়, দিনের পর দিন তার অপেক্ষায় দোকানের কাছে গাড়ি এনে দাঁড় করানোও ভালো কথা নয়। তুমি বুদ্ধিমান লোক। আশা করি এ

প্রচেষ্টা ছেড়ে দেবে। যদি ছেড়ে না দাও নানারকম অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটতে পারে। আমাকে তো চেনো! —এবার যেতে পারো।"

চেং-শিয়াং ভাবলো, গাড়ি থেকে নেমে একটা ঘুষি বসিয়ে দিই আহ্-কিমের চোয়ালে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়লো, কাছেই ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে আছে আরো চার-পাঁচজন চীনেম্যান। তাদের সে চেনে। আহ্-কিমের দলের লোক তারা। তাদের ঘাঁটানো খুব নিরাপদ নয়।

চেং-শিয়াং আর কোনো কথা না বলে গাড়িতে স্টার্ট দিলো। মিনি ওয়াং আহ্-কিমের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আহ্-কিম হাসলো মিনির দিকে তাকিয়ে।

চেং-শিয়াং গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো। খানিকটা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলো আহ্-কিম আর মিনি হাত ধরাধরি করে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

মিনির উপর রাগ ভুলে গেল সে।

সমস্ত আক্রোশ এখন গিয়ে পড়লো আহ্-কিমের উপর। একটা রাজনৈতিক উষ্মা তার অনেকদিন থেকেই ছিলো। সেটা এখন ব্যক্তিগত জিঘাংসায় পরিণত হোলো। মনে মনে একটা সাংঘাতিক সংকল্প করলো সে।

তারপর বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের ট্রাফিকের ভিড়ে মিশে গেল।

এর পর জেনীদের বাড়ি যেতে বেশ খানিকটা নৈতিক সাহস সঞ্চয় করতে হোলো কেং চেং-শিয়াংকে। ব্যাপারটা ওদের বাড়িতে জানাজানি হবে, সেই সম্ভাবনা তাকে বিচলিত করলো।

অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন টিং-লিংকে সঙ্গে নিয়েই ওয়াংদের বাড়ি এসে উপস্থিত হোলো চেং-শিয়াং। টিং-লিংকে আনলো এই ভেবে যে, সে সঙ্গে থাকলে ওয়াঙেরা তার উপর যতো বিরক্তই হোক না কেন, সেটা আরেকজন

মহিলার সামনে প্রকাশ করবে না। তাছাড়া চিয়েন চাং রীতিমতো উল্লসিতই হবে।

ওয়াংদের বাড়ি উপস্থিত হয়ে সুং-চাং চিয়েন-চাংএর কাছে খুব সাদর অভ্যর্থনাই পেলো ফেং চেং-শিয়াং। ওরা বার বার জিজ্ঞেস করলো, এদ্দিন তার দেখা নেই কেন?

নানা কাজে ব্যস্ত ছিলো সে—জানালো চেং-শিয়াং।

জেনী খুব হৃদ্যতার সঙ্গে গল্প করতে লাগলো টিং-লিংএর সঙ্গে।

চেং-শিয়াং খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো মিনিও এসে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। খুব সহজ ভাবে কথাবার্তা বলছে, এমন কি তার সঙ্গেও, যেন কোনো দিনই কিছু হয়নি।

একটু নিশ্চিন্ত হোলো চেং-শিয়াং। মিনি নিশ্চয়ই কাউকে কিছু বলে নি।

এমন সময় এসে উপস্থিত হোলো দিলীপ। আর সঙ্গে সঙ্গে চেং-শিয়াং একটি ভাবান্তর লক্ষ্য করলো জেনীর মুখে, যেটা অনুধাবন করা তার মতো বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়।

যথারীতি তার সঙ্গে আর টিং-লিংএর সঙ্গে দিলীপের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এমনি লোকটাকে চেং-শিয়াংএর খারাপ লাগলো না, কিন্তু যতোবার মনে পড়লো দিলীপকে দেখা মাত্রই জেনীর চোখ-মুখ ঝলমলো হয়ে ওঠা, ততোবারই একটা সন্দেহের হুল বিঁধতে লাগলো তার মনে।

এক ফাঁকে চিয়েন-চাংকে জিজ্ঞেস করলো, "লোকটা কে?"

চিয়েন-চাং খুব সতর্কতার সঙ্গে সহজ ভাবে উত্তর দিলো, "ক্যানিং স্ট্রীটে ব্যবসা করে।"

"তোমার বন্ধু?"

"বন্ধু নয়, চেনা।"

"নিশ্চয়ই খুব ভালো রকম চেনা, তা নইলে বিদেশী লোক, তোমাদের বাড়িতে এত যাওয়া-আসা!"

"খুব যাওয়া-আসা নেই," চিয়েন-চাং উত্তর দিলো, "মাঝে মাঝে আসে, এই পর্যন্ত। এলে কি করবো, তাড়িয়ে তো দিতে পারি না। এটা ওদের দেশ। তবে হী ইজ এ নাইস ফেলো।"

চিয়েন-চাংকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না চেং-শিয়াং।

একটু পরে সুযোগ পেতে ওর ভাই সুং-চাংকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "সুং-চাং, এই দিলীপ লোকটা কে?"

সুং-চাং অতো সজাগ নয় চিয়েন-চাংএর মতো।

বললে, "দিলীপ? সে জেনীর বন্ধু। চমৎকার লোক, খুব ভালো ওয়ল্‌জ জানে।"

"ওকে এখানে কে এনেছে? চিয়েন-চাং?"

"না, চিয়েন-চাং ওকে একটুও পছন্দ করে না," সুং-চাং উত্তর দিলো, "ওকে জেনী এনেছে।"

ব্যস। ফেং চেং-শিয়াং জেনে গেল যা জানবার।

জেনী এনেছে? জেনী? জেনী তাহলে দিলীপের সঙ্গেই ভাব করছে।—এবার একটু একটু করে উত্তপ্ত হতে স্থরু করলো চেং-শিয়াং। —জেনী? জেনী ওয়াং? একটি চীনে মেয়ে? তার সঙ্গে ভাব একজন বাঙালী ছেলের সঙ্গে? কেন? কলকাতার চীনে সমাজে ছেলে নেই?

কিন্তু বেশী ভাবপ্রবণ চেং-শিয়াং নয়। অত্যন্ত পরিকল্পনাপ্রবণ তার মন। জেনীর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে সে দিলীপের সম্বন্ধে ভাবতে স্থরু করলো।—নিশ্চয়ই সে খুব বড়ো ঘর বা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে নয়, চেং-শিয়াং ভাবলো। তাই যদি হোতো, সে কোনো বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে ফেলতো এদ্দিনে। চীনে মেয়ের উপর সে যখন আকৃষ্ট হতে পেরেছে তখন সে নিশ্চয়ই সে-ধরণের বখাটে ফিরিঙ্গী-মন বাঙালী ছেলে যারা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, চীনা, গোয়ানীজ এদের মধ্যে বন্ধু খুঁজে বেড়ায়। না, এর ব্যবস্থা করা খুব শক্ত হবে না, স্থির করলো চেং-শিয়াং।

খুব হাসিমুখে আবার ওদের মধ্যে গিয়ে বসলো সে। মন খুলে নানা রকম গল্প ফাঁদলো সবার সঙ্গে, বিশেষ করে দিলীপের সঙ্গে। দিলীপের মুখ দেখে মনে হোলো তারও বেশ লাগছে চেং-শিয়াংকে। টিং-লিংও খুব সহজ হয়ে গেল দিলীপের সঙ্গে। দিলীপ এমনি বেশ রসিক লোক। নানারকম চুটকি গল্প বলতে ওস্তাদ। তার মুখে নানা রকম সব গল্প শুনে প্রচুর হাসলো সবাই,—যতো না হাসবার, তার চাইতে বেশী হাসলো ফেং চেং-শিয়াং আর তার বোন টিং-লিং।

কিছুক্ষণ পর টিং-লিং বললো, এবার তাকে যেতে হবে। ফেং চেং-শিয়াং উঠে দাঁড়ালো। তারপর দিলীপকে বললো, "তুমিও যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে? তোমায় তাহলে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি।"

"না, ধন্যবাদ, আমি আরো কিছুক্ষণ আছি," দিলীপ উত্তর দিলো।

তখন ফেং চেং-শিয়াং বললো, "কাল সন্ধ্যেবেলা কি করছো? যদি কোনো কাজ না থাকে তো আমাদের বাড়ি এসো। একসঙ্গে বসে একটু ড্রিঙ্ক করা যাবে।"

দিলীপ সানন্দে রাজী হোলো। এ ধরনের আমন্ত্রণ সে কখনো প্রত্যাখ্যান করে না। কিন্তু বিষণ্ণ হোলো জেনীর মুখ। আর আতঙ্ক জাগলো চিয়েন-চাংএর চোখে, যখন শুনলো টিং-লিং বলছে, "দিলীপ, আমি কিন্তু বসে থাকবো তোমার জন্যে।"

* এগারো *

তার পরদিন দিলীপ গেল চেং-শিয়াংএর ফ্ল্যাটে।

গিয়ে দেখলো চেং-শিয়াং নেই। কি একটা যেন কাজে বাইরে গেছে। আসতে একটু দেরি হবে, দিলীপকে বসতে বলে গেছে।

বাড়িতে টিং-লিং একা, সে মিষ্টি হেসে দিলীপকে ভিতরে নিয়ে বসালো।

হাতির দাঁতের কাজ করা একটি সিগারেট-বাক্স খুলে তার সামনে ধরে জিজ্ঞেস করলো, "তোমায় কি দিতে পারি? হুইস্কি-সোডা না বিয়ার?

"হুইস্কি। ধন্যবাদ," দিলীপ একটি সিগারেট তুলে নিয়ে বললো।

বেয়ারা এলো ট্রে-তে করে হুইস্কি আর সোডার বোতল নিয়ে।

হুইস্কির বোতলের মুখে সাইফন আঁটা। বেয়ারা একটি ছোটো টেবিলে গেলাস রেখে এক পেগ হুইস্কি ঢেলে তাতে সোডা মিশিয়ে দিলো।

একটি ছোট্টো গেলাসে একটুখানি ওয়াইন নিলো টিং-লিং। তারপর সেও একটি সিগারেট ধরালো।

অত্যন্ত জমকালো ভাবে সাজানো তাদের বসবার ঘর। দেওয়ালে একটি চীনে স্ক্রোল আর চিয়াং কাই-শেকের একটি ছবি ছাড়া চৈনিকত্বের কোনো ছাপ নেই। বাদবাকী সব কিছু একেবারে পাশ্চাত্ত্য।

টিং-লিং পরেও আছে একটি স্কার্ট।

ওয়াইনের গেলাস তুলে সে বললো, "টু আওআর নিউলি মেড্ ফ্রেণ্ডশিপ্—"

দিলীপও একটু হেসে তার গেলাসটি তুললো।

তারপর কিছুক্ষণ আবহাওয়া আলোচনা। বড্ড গরম এখন। এ সময়টা দার্জিলিং শিলংই ভালো। বৃষ্টি নামলে ভালো হয়। তবে বেশী বৃষ্টি হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। কলকাতার রাস্তায় বড্ড জল জমে—ইত্যাদি।

আবহাওয়া আলোচনা শেষ হতে দিলীপ ঘড়িতে দেখলো আধঘণ্টা কেটে গেছে।

"চেং-শিয়াং কখন ফিরবে," সে জিজ্ঞেস করলো।

"বলে তো গেছে শিগ্‌গিরই ফিরবে," এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিলো টিং-লিং, "তোমার নিশ্চয়ই খুব তাড়া নেই।"

"কিচ্ছু না। তবে চেং-শিয়াং থাকলে আরো জমতো। ওকে আমার বেশ লাগে।"

"শুধু আমি থাকাতে একটুও জমছে না বলতে চাও," বলে একটু হাসলো টিং-লিং।

"না, না, তা' নয়," বলে দিলীপ একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করলো, "মহিলার সান্নিধ্যে একলা থাকলে আমি নিজেকে একটু বোকা-বোকা অনুভব করি।"

টিং-লিং স্থির দৃষ্টিতে একটুখানি তাকালো দিলীপের দিকে।

তারপর বললো, "এটা নিশ্চয়ই জানো যে চেং-শিয়াং তোমায় বোকা বানাবার জন্যেই আমার কাছে একলা রেখে গেছে!"

দিলীপ অবাক হোলো।

"মানে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

টিং-লিং চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ।

অসোয়াস্তি অনুভব করলো দিলীপ।

বললো, "আচ্ছা, মেট্রোয় নতুন ছবিটা দেখেছো?"

টিং-লিং হেসে ফেললো। বললো, "যাক, আর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে হবে না। তোমায় বলতে আপত্তি নেই,—তোমায় প্রথম দিন দেখেই চিনে নিয়েছি। তুমি বড্ডো সাদাসিধে। আচ্ছা একটা কথা আমায় বলবে? তুমি জেনীকে ভালোবাসো?"

"একথা জিজ্ঞেস করছোই বা কেন, আর আমিও বা উত্তর দেবো কেন?" দিলীপ বললো।

"দেখ, উত্তর না দিলেও যে আমি কিছু জানবো না তা তো নয়। সেদিন

তোমাকে আর জেনীকে দেখে বুঝে নিয়েছি, আর তোমাদের সম্বন্ধে দু'চারটে কথা কানেও এসেছে। আমার কিছু আসে যায় না, তবে আমায় যদি বন্ধুর মতো নাও আমি তোমার কিছু উপকার করতে পারি,—আর কিছু উপকার আমি আশাও করতে পারি তোমার কাছ থেকে।"

"কি রকম ?"

"আমি আর চিয়েন-চাং দুজনে দুজনকে খুব ভালোবাসি, সে কথা নিশ্চয়ই জানো না।"

"চিয়েন-চাং যে তোমার জন্যে পাগল সে-কথা জেনী আমায় বলেছে," দিলীপ উত্তর দিলো, "তবে তুমি যে চিয়েন-চাংকে ভালোবাসো সেটা জানতাম না।"

"চিয়েন-চাংএর জন্যে আমি আরো অনেক বেশী পাগল," টিং-লিং হাসতে হাসতে খুব হাল্কা কিন্তু খুব মৃদু গলায় বললো।

"চিয়েন-চাংএর জন্যে !"

সে কথার উত্তর দিলো না টিং-লিং। আস্তে আস্তে বললো, "আমি চীনের মেয়ে। সুতরাং ভালোবাসতে পারি আর বিয়ে করতে পারি আমার নিজের দেশের ছেলেকেই। আমি কতোদিন ধরে আশা করে ছিলাম এমন একটি ছেলের যে একেবারে দেশের মাটির মানুষ, আমার ভায়ের মতো বিদেশী ফুল নয়। হয়তো তেমন ছেলের খোঁজ পেতাম দেশে গেলে, কিন্তু আমার তো সেখানে যাওয়ার উপায় নেই। আমার ভায়ের জন্যে আমার সে পথ বন্ধ। কিন্তু এদেশে এসেই হঠাৎ পেয়ে গেলাম চিয়েন-চাংকে।"

"কিন্তু চিয়েন-চাং কি তোমাদের দেশের মাটির মানুষ ?"

"ওর বাইরের চালচলন দেখে ওকে তুমি ভুল বুঝো না। ও একেবারে খাঁটি দেশের ছেলে। ওর যেটুকু বিদেশীয়ানা সেটা আসলে তার বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পালানোর যে কামনা তার একটা প্রকাশ মাত্র। এই পরিবেশ তার ভালো লাগছে না। সে চীনে ফিরে যাবে না। সে আমেরিকা সম্বন্ধে নানারকম গল্প শুনেছে,—সেটা সুখের দেশ, সেটা অমুক-

তমুক, এই সব। সুতরাং স্থির করেছে সে সেখানেই যাবে। তাই তার এই সাহেবীয়ানা।"

"চীনে চলে গেলেই পারে।" দিলীপ বললো।

"সেটা সম্ভব নয়।"

"কেন?"

টিং-লিং এ প্রশ্নের উত্তর দিলো না। বললো, "কাউকে বোলো না দিলীপ, তোমায় খুব বিশ্বাস করে বলছি,—আমি খুব চেষ্টা করছি যদি দেশে ফিরে যাওয়া যায়। আর যদি তার ব্যবস্থা করে উঠতে পারি তবে চিয়েন-চাংকেও নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে।"

"আমায় এসব কথা কেন বলছো," দিলীপ আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"চেং-শিয়াং তোমায় এখানে কেন এনেছে জানো?" বললো টিং-লিং।

দিলীপ ঘাড় নাড়লো।

"চেং-শিয়াঙের দুর্বলতা আছে জেনীর জন্যে," টিং-লিং বলে গেল, "ভালোবাসা বলবো না, কারণ সে কাউকে ভালোবাসতে পারে না, ভালোবাসা কাকে বলে জানেও না। কারো জন্যে তার দুর্বলতা এলে সে পাগল হয়ে যায় তার জন্যে। তারপর তাকে পেলে পরে তার সমস্ত মোহ কেটে যায়। কিন্তু তার জীবনে জেনী হচ্ছে প্রথম মেয়ে যে তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার ধারণা জেনী তার তোয়াক্কা করে না তুমি আছো বলে। তাই সে তোমায় ভাব করিয়ে দিচ্ছে আমার সঙ্গে।"

দিলীপ অবাক হয়ে টিং-লিংএর দিকে তাকালো।

"এসব তার কাছে নতুন নয়," টিং-লিং বলে চললো, "তার নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে আমার চেহারা ও সৌন্দর্যের সাহায্য সে অনেকবার নিয়েছে। চিয়েন-চাংকেও সে আমার কাছে এনে আলাপ করিয়ে দিয়েছে কোনো একটি বিশেষ মতলবে। কিন্তু আমিও যে চিয়েন-চাংকে ভালোবাসলাম একথা চেং-শিয়াং জানলো না। জানলে পরে চিয়েন-চাংএর ক্ষতি হবে। তাই আমি চেং-শিয়াংকে জানতে দিই নি, এমন কি চিয়েন-চাংকেও নয়।

আমি শুধু এই ভান করে বেড়াচ্ছি যে চিয়েন-চাংকে আমি খেলিয়ে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা দিলীপ, কী দুর্ভোগ বলো তো! লোকে তো শুনি খেলিয়ে বেড়ানোর জন্যে ভালোবাসার ভান করে। আমায় করতে হচ্ছে ঠিক উল্টো।"

দিলীপ হাসলো।

"তোমায় আমার দরকার," টিং-লিং বললো, "চিয়েন-চাংএর ভালোর জন্যে,—যাতে সে কোনো বিপদে না পড়ে—তাকে আমি মাঝে মাঝে দু'-চারটি কথা জানিয়ে দিতে চাই, যেটা আমার নিজের জানানো সম্ভব নয়। অথচ কাউকে পাচ্ছিলাম না যাকে ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারি। তোমায় যখন চেং-শিয়াংই এখানে নিয়ে এসেছে, আর চাইছে যে কিছুদিন তোমার সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ থাক, তখন মনে হোলো ঠিক যে-সুযোগ চাইছিলাম, সেটা পেয়ে গেলাম।"

"কি সুযোগ?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"দেখ, তোমায় বিশ্বাস করে বলছি," বললো টিং-লিং, "আহ্-কিম আর মিনির সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ হওয়া দরকার। সেটা তোমার মারফতেই হবে। চেং-শিয়াং তোমায় আমার কাছে নিয়ে এসেছে তার একটা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে। সুতরাং তুমি যদি আমার কাছে আসো, আমি যদি একটু অন্তরঙ্গ হই তোমার সঙ্গে, কেউ কোনোরকম সন্দেহ করবে না।"

"জেনী করবে।"

"জেনীকে সব খুলে বলতে পারো, সে কাউকে বলবে না," টিং-লিং উত্তর দিলো।

"চিয়েন-চাং সন্দেহ করবে।"

"চিয়েন-চাং শুধু ভাববে যে তুমি আমার সম্বন্ধে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছো," টিং-লিং হেসে বললো। "তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আমি তাকে ঠিক সামলে নেবো। উপস্থিত তোমায় একটি কাজ করতে হবে। করবে তো?"

"বলো—।"

"আগামী মঙ্গলবার বিকেলবেলা তুমি যেমন করেই হোক চিয়েন-চাংকে

তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখবে। রেস্তরাঁয় হোক, বার-এ হোক, যেখানেই হোক তুমি ওকে আটকে রাখবে রাত সাড়ে আটটা কি নটা পর্যন্ত।"

"কেন?"

টিং-লিং একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "সেদিন চায়না-টাউনে দু-দল চীনের মধ্যে মারামারি হতে পারে। আমি চাই না যে চিয়েন-চাং সেই গোলমালের মধ্যে থাকে।"

"মারামারি হবে! কেন?"

"ওসব আমাদের রাজনৈতিক ব্যাপার। তোমার জেনে কোনো লাভ নেই।"

"একটু যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে ব্যাপারটা!" দিলীপ বললো।

টিং-লিং উত্তব দেওয়ার আগেই দরজায় বেল বাজলো।

"চেং-শিয়াং এসে গেছে," ব্যস্ত গলায় বললো টিং-লিং, "এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়। অন্য কথা বলা যাক। কি বলা যায়?—হ্যাঁ, পার্ল বাকের বই পড়েছো?"

আবার বেল বাজলো দরজায়।

"আমি গিয়ে খুলে দিই," দিলীপ উঠতে গেল।

"না, না, বেয়ারা যাবে।—বলো, পার্ল বাকের কি কি বই পড়েছো?"

"প্রায় সবই পড়েছি। গুড আর্থ, ড্রাগন সীড, মাদার, পিওনী—"

দরজা খুলে দেওয়ার আওয়াজ এলো।

"গুড আর্থ সিনেমায় দেখেছো?"

"হ্যাঁ, দু-তিনবার দেখেছি।"

"পল মুনি অদ্ভুত অভিনয় করেছে, না? সেই পঙ্গপাল আসার দৃশ্যটি কী অদ্ভুত সুন্দর—।"

একজোড়া জুতো মশমশ করতে করতে ঘরে ঢুকলো।

"তুমি?" বলে উঠলো টিং-লিং।

দিলীপ মুখ ফিরিয়ে দেখলো।

টিং-লিংএর ভাই চেং-শিয়াং নয়, এসেছে চিয়েন-চাং।

"চেং-শিয়াং কোথায় ?" চিয়েন-চাং জিজ্ঞেস করলো।

"সে তো বাড়ি নেই," উত্তর দিলো টিং-লিং।

চিয়েন-চাংএর মুখ অন্ধকার হোলো। সে একবার দিলীপের দিকে তাকালো, একবার টিং-লিংএর দিকে তাকালো।

"ওর ফিরতে দেরী হবে," গম্ভীর গলায় বললো টিং-লিং।

চিয়েন-চাং কোনো উত্তর দিলো না।

"তুমি কাল সকালে এসো। চেং-শিয়াংকে থাকতে বলবো," বললো টিং-লিং।

"ভাবছি একটু অপেক্ষা করবো চেং-শিয়াঙের জন্যে," চিয়েন-চাং বললো।

"অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই চিয়েন-চাং," টিং-লিং উত্তর দিলো, "ওর ফিরতে অনেক দেরি হবে।"

চিয়েন-চাং আবার দু'জনের দিকে পরপর তাকালো।

তারপর বললো, "ও, আচ্ছা—।" বলে বেরিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে দিলো টিং-লিংএর বেয়ারা।

দিলীপ কোনো কথা না বলে বসে রইলো চুপ করে।

সে-ঘরের জানলা রাস্তার উপরেই। টিং-লিং খুব ম্লান হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো কাছে। তাকিয়ে রইলো পথের দিকে, যে পথ দিয়ে চলে গেল চিয়েন-চাং। পথের বাঁকে সে অদৃশ্য হতে টিং-লিং ফিরে এলো তার চেয়ারে, তারপর আস্তে আস্তে বললো, "বেচারা চিয়েন-চাং! আমার উপর রাগ করে চলে গেল। আমি তাকে বসতেও বললাম না।" একটু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলো টিং-লিং।

"বললেই পারতে," শোনা গেল দিলীপের মুখ থেকে।

"না। চেং-শিয়াং রাগ করতো। সে চায় তুমি এখানে কিছুক্ষণ একলা থাকো। কে জানে হয়তো চিয়েন-চাংকে সেই আসতে বলেছিলো, যাতে সে এসে তোমায় আর আমায় একলা দেখে।"

"কেন ?"

"এও বোঝো না? খবরটা যাতে জেনীর কানে ওঠে।"

"ও—," দিলীপ এবার বুঝলো।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ চেং-শিয়াঙেরও দেখা নেই।

একটা বাদুড় ঘরে ঢুকে দু-তিন পাক খেয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। সামনের বাড়ি থেকে পিয়ানোর স্বর ভেসে এলো। চানাচুরওয়ালা হেঁকে গেল রাস্তা দিয়ে।

টিং-লিং আস্তে আস্তে বললো, "চিয়েন-চাংএর ঘুম হবে না আজ রাত্তিরে। এত চঞ্চল সে! একটু বোঝে না।"

চুপ করে রইলো একটুখানি।

তারপর আবার বলে গেল, "আমায় দেখে সবার মনে হয় আমি কী সুখী। এরকম সুন্দর চেহারা, এরকম স্বাচ্ছন্দ্য, এরকম উন্নত জীবনযাত্রার মান।—কেউ যদি আমার মনের খবর জানতো!"

দিলীপ কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠতে যাচ্ছিলো। কিন্তু টিং-লিং ছাড়লো না। বললো, "এক্ষুনি যাবে কেন? আরো একটু বোসো। আরেকটা হুইস্কি নেবে?"

হুইস্কির নামে দিলীপ আবার বসে পড়লো।

টিং-লিং বললো, "আচ্ছা, হুইস্কি নয়, তোমায় একটা নতুন জিনিস খাওয়াচ্ছি। ডেপথ্-চার্জ। খেয়েছো কোনোদিন?"

"ডেপথ্ চার্জ!" দিলীপের চোখ কপালে উঠলো। "যুদ্ধের সময় বিপক্ষদলের সাবমেরিন ধ্বংস করবার জন্যে যুদ্ধজাহাজ থেকে ডেপথ্-চার্জ ছাড়া হোতো শুনেছি। কিন্তু এ যে কোনো পানীয়ের নাম হতে পারে তা-তো জানি না!"

টিং-লিং হাসলো।

বেয়ারা এলো ট্রেতে করে পানীয়ের সরঞ্জাম নিয়ে। হুইস্কির বোতল,

বিয়ারের বোতল, বরফ, একটি বড়ো গেলাস, আরেকটি ওষুধের গেলাসের মতো ছোট্টো গেলাস।

টিং-লিং ছোট্টো গেলাসটিতে হুইস্কি ভরে বড়ো গেলাসটির ভেতর রাখলো, তার চারপাশে ঠেসে দিলো বরফের টুকরো। তারপর বড়ো গেলাসটির মধ্যে বিয়ার ঢেলে দিলো। ফেনায় ফুলে উঠলো গেলাসের উপরটা।

"এর নাম ডেপথ্-চার্জ ?" দিলীপ একটু হেসে গেলাসটি তুলে নিলো। ছ'চার চুমুক খেয়ে বললো, "এ তো শুধু বিয়ারের স্বাদ পাচ্ছি।"

টিং-লিং হাসলো, কোনো উত্তর দিলো না। উঠে গিয়ে বাড়িয়ে দিলো ফ্যানের স্পীড, তারপর বাড়িয়ে দিলো রেডিওর আওয়াজ।

কিছুক্ষণ পর দিলীপ বললো, "বাঃ, এবার একটু একটু করে হুইস্কির আমেজ লাগছে।" আবেশে তার চোখ বুজে এলো। বললো আস্তে আস্তে. "আহা! ডেপথ-চার্জ ? হ্যাঁ, ডেপথ্-চার্জই বটে।—তারপর, বলো কি বলছিলে।"

দিলীপ টিং-লিংএর কাছ থেকে তার ছেলেবেলার অনেক গল্প শুনেছিলো সেদিন।

টিং-লিংএর বাবা ছিলেন যুদ্ধের আগে চীনের একটি বিখ্যাত ব্যাঙ্কের পরিচালক। খুব পুরোনো বংশ তাদের। চীন সম্রাটদের আমল থেকেই জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে তাদের পরিবারের যোগাযোগ।

টিং-লিংএর মা আমেরিকান। জাপান যখন চীন আক্রমণ করলো টিং-লিং তখন বেশ ছোটো। মোটে বছর নয়েক বয়েস। চেং-শিয়াংও ছোটো। আর ছুজনেই তখন আমেরিকায়, মায়ের সঙ্গে। সে বছর শীতকালে তাদের নানকিং ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাপ চিঠি লিখে জানালো যে এখন ফেরার দরকার নেই। পরে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

ওরা তখন নিউ ইয়র্কে। ওখানকার চায়না-টাউনের চীনে সমাজের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। ওরা স্কুলে পড়ে। তাদের বন্ধুবান্ধব সব

আমেরিকান। ওর মামার বাড়ির তরফের আত্মীয়স্বজন সব আমেরিকান। চীনে পরিবার দু-চারটে যাদের সঙ্গে আনাগোনা তারাও অভিজাত সমাজের— নিউ ইয়র্কের চীনে কনসাল জেনারেল, ইউনিভার্সিটির একজন চীনে অধ্যাপক, শাংহাই থেকে বেড়াতে আসা কয়েকজন চীনে কোটিপতি,—এই সব। চীনা, জাপানী, ইংরেজ, আমেরিকান, এসব পার্থক্য সে তখন বুঝতো না। যাদের সঙ্গে মিশতো তারা সবাই এত ভালো যে, কোনোরকম পার্থক্য বুঝবার অবকাশও তখন হয়নি।

তারপর একদিন পার্থক্য বুঝলো।

মায়ের সঙ্গে বেরিয়েছিলো সেদিন। বড়ো রাস্তার পাশে একটি দোকানের সামনে গাড়ি রেখে মা ঢুকলো একটি দোকানে। টিং-লিং গাড়িতে বসে রইলো।

এমন সময় দেখে, একটি চীনে ছেলে পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এদিকে হেঁটে আসছে। হাতে তার কতকগুলো কাগজের রঙিন ফানুস। নিউ-ইয়র্কের চায়না টাউন সে-রাস্তার কাছেই। হয়তো ছেলেটির বাবার দোকান গলির ভেতরে কোথাও। এসব ফানুস বাড়ির মেয়েরা তৈরী করে। হয়তো বাড়ি থেকে দোকানে মাল নিয়ে যাচ্ছে ছেলেটি।

তাকে দেখে টিং-লিংএর বড্ডো ভালো লাগলো। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো সে।

এমন সময় রাস্তার অন্যদিক থেকে আসছিলো কয়েকটি আমেরিকান ছেলে। কাছাকাছি আসতে একজন চীনে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললো, "হি, চিংক্— !"

চীনে ছেলেটি দাঁড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, "আমায় বলছো?"

"হ্যাঁ, তোমায় বলছি। তুমি চিংক্—মারামারি করবে?"

ফানুসগুলো একপাশে নামিয়ে রাখলো চীনে ছেলেটি। কিন্তু কিছু বলবার আগেই তার মুখে একটি ঘুসি বসিয়ে দিলো একটি আমেরিকান ছেলে। চীনে ছেলেটির ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু সেও ছাড়বার ছেলে নয়।— তবে যতো না দিলো সে, খেলো তার চেয়ে অনেক বেশী।

পথচারি কয়েকজন এসে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিলো তাদের। আমেরিকান ছেলেগুলো চলে গেল তাদের পথে। চীনে ছেলেটি ঠোঁটে রুমাল চেপে ধরে অন্য হাতে ফানুসগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

গাড়িতে বসে রুদ্ধ-নিশ্বাসে তাই দেখলো টিং-লিং।

তার মা ফিরে এলো। গাড়িতে ঢুকে গাড়ি চালিয়ে দিলো বাড়ির দিকে।

টিং-লিং তখনো চুপচাপ।

মা সেটি লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো, "কি হোলো ডার্লিং ?"

তখন টিং-লিং আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "মামি, চিংক্ মানে কি ?"

ওর মা একটু অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে, বললো, "একথা তুমি কোত্থেকে শিখলে ?"

"একটু আগে শুনলাম একটি আমেরিকান ছেলে একটি চীনে ছেলেকে চিংক্ ডাকছে।"

"ও—। ওটা ভালো কথা নয়। কয়েকজন স্টুপিড লোক আছে যারা চীনদেশের লোকদের চিংক্ বলে। তবে তুমি যাদের মুখে শুনেছো ওরা নিশ্চয়ই ওই চীনে ছেলেটির স্কুলের বন্ধু।"

"আমি জানি না," টিং-লিং বললো, "আমি শুধু দেখলাম যে চীনে ছেলেটি চলে যাওয়ার সময় ওর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে।"

"ও ডিয়ার ডিয়ার," বললো চীনে মেয়ে টিং-লিংএর আমেরিকান জননী, "ওরা কি এত সিলি যে মারামারি করলো নিজেদের মধ্যে ? ওই আমেরিকান ছেলেগুলো নিশ্চয়ই খুব স্টুপিড। ওরা যে কিছু মনে করে বলেছে তা নয়, যারা খারাপ ছেলে ওরা পথে ঘাটে যার তার সঙ্গে মারামারি করে বেড়ায়। আমেরিকান ছেলে দেখলে হয়তো তাকে অন্য খারাপ গালাগাল দিয়ে তার সঙ্গেও মারামারি করতো। এ নিয়ে তুমি আপ্‌সেট্ হোয়ো না ডার্লিং।"

টিং-লিং কোনো উত্তর দিলো না।

ওর মা বলে গেল, "আমেরিকানরা চীনেদের কতো ভালোবাসে জানো ? আমাদের দেশে যুদ্ধ বেধেছে আর এখানকার লোকেরা আমাদের দেশের

লোকেদের জন্যে কতো কি পাঠাচ্ছে—কতো জামাকাপড়, কতো খাবার, কতো টাকা। আমি যে সোয়েটার বুনছি দেখেছো, সেটাও চাইনীজ রেড-ক্রসের জন্যে। কিছুদিনের মধ্যেই এখানে একটা প্রসেশান বার করা হবে টাকা তুলবার জন্যে। তুমি আমি আমরা সবাই যাবো। তখন দেখবে আমাদের দেশের কতো ছেলেমেয়ে আছে এই শহরে।”

টিং-লিং চুপ করে শুনে গেল মায়ের কথাগুলো।

বাড়ি ফিরে টিং-লিং চেং-শিয়াংকে বলেছিলো পথের ঘটনার কথা।

চেং-শিয়াং তখন সবে স্কুল থেকে বেস্-বল্ খেলে ফিরছে। হাতের মাস্ল্ ফুলিয়ে অন্য হাত দিয়ে সেটি টিপে অনুভব করে বললো, “সেই ছেলেটি নিশ্চয়ই খুব ভীতু। তাই ওরা ওর পেছনে লেগেছিলো। আমায় কেউ বলতে আসুক, মজা টের পাইয়ে দেবো। আর ওরা সব আজে-বাজে ছেলে। আমার বন্ধুরা অন্যরকম। পীট, স্টীভ্, আয়ান, এরা কোনোদিন ওরকম বলবে না।

টিং-লিং আস্তে আস্তে বললো, “আমাদের দেশের একটি ছেলেকে ওরা যে রাস্তায় ধরে মারলো সে আমার ভালো লাগেনি।”

“ডোণ্ট বি সিলি,” চেং-শিয়াং উত্তর দিলো, “ওরা তো কেউ ওকে ধরে মারেনি, সে আর ওদের একজন মারামারি করেছে। ফেয়ার ফাইট্। কিছু বলবার নেই।”

চেং-শিয়াং এই কথাগুলো বলে চলে গিয়েছিলো হাতমুখ ধুতে।

টিং-লিং চুপচাপ বসে ছিলো অন্ধকার বারান্দায়।

তার বার বার মনে হচ্ছিলো এখানে চারদিকে আকাশচুম্বী বাড়িগুলো ঘিরে এত নিয়ন-সাইনের আলো, ওধারের প্রশস্ত এ্যাভিনিউতে দুরন্ত ট্র্যাফিক —আর এখন শাংহাইতে, ক্যাণ্টনে, ফু-চাওতে, চা-পেইতে, কিয়াং-ওয়ানে আর এখানে সেখানে অন্যান্য শহরে গাঁয়ে বোমা ফেলছে জাপানীরা, আর তার মতো ছোটো ছোটো মেয়েরা মায়ের কোল ঘেঁষে কুঁকড়ে বসে আছে।

দিন তিন চার পর একদিন দেখলো ওর মা খুব ব্যস্ত। সকাল থেকে

এখানে সেখানে ফোন করছে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে টিং-লিংকে বললো, "সাজগোজ করে নাও, এখন বেরোতে হবে।"

সেদিন "ডবল্-টেন্"—অর্থাৎ অক্টোবর মাসের দশ তারিখ, চীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিবস, চীনের জাতীয় উৎসবের দিন। একটি মস্তো বড়ো শোভাযাত্রা বেরোবে নিউ-ইয়র্কের চায়না-টাউন থেকে।

টিং-লিং বললো, "মামি, একটা কথা বলবো ভাবছিলাম। চলো আমরা ড্যাডির কাছে ফিরে যাই।"

টিং-লিংএর মা একটু ম্লান হেসে ওর চিবুক নেড়ে বললো, "সে হয় না ডার্লিং। ড্যাডি এখন চুংকিংএ আছে। সেখানে গেলে আমাদেরও অসুবিধে হবে, ওঁরও অসুবিধে হবে। ওখানে তো তোমার জন্যে স্কুল নেই। তোমার ড্যাডি লিখেছে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে, তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হবে তখন তোমার ড্যাডি এখানে বেড়াতে আসবে। এখান থেকে আমরা সুইটজারল্যাণ্ডে যাবো, তারপর দেশে ফিরে যাবো। আর এখানে আমাদের কতো কাজ। দেশের জন্যে কতো টাকা তুলতে হবে। আমরা তো আজ সেজন্যেই বেরোচ্ছি।"

নিউ-ইয়র্কের চীনে-পাড়ায় জাতীয় যুদ্ধ সাহায্য সংস্থার কেন্দ্রীয় দপ্তর। শহরের প্রায় সমস্ত চীনে অধিবাসীই সেখানে জড়ো, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, লণ্ড্রিম্যান, রেস্তরাঁর কর্মী, দোকানদার, স্কুল-টিচার, সব্বাই। শুধু দেখা গেল না শহরের সম্ভ্রান্ত অভিজাত চীনেদের—দু-এক জনকে ছাড়া। মায়ের সঙ্গে টিং-লিং গেল সেখানে। চেং-শিয়াংকেও যেতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু সেদিন ওর এক বন্ধুর গাঁয়ের বাড়িতে পার্টি। সে গেল না।

সেখানে যেতে আরেকটি বড়ো মেয়ে টিং-লিংএর হাত ধরে তাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে অনেক মেয়ে,—ছোটো, বড়ো, মাঝারি। সবাই একটি করে চাঁদা সংগ্রহ করবার টিনের বাক্স আর এক-মুঠো পিন-আঁটা কাগজের ফ্ল্যাগ নিচ্ছে।

"তুমি ফ্ল্যাগ বেচতে পারবে না?" জিজ্ঞেস করলো সেই মেয়েটি।

খুব গর্বের সঙ্গে টিং-লিং বললো, "নিশ্চয়ই পারবো।"

কিছুক্ষণ পরে আরেকজন এসে সবাইকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। টিং-লিং বিমুগ্ধ হয়ে দেখলো এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। সবার সামনে চীনে মেয়েরা, পুরুষেরা তাদের পেছনে। শোভাযাত্রার মাঝখানে-মাঝখানে দীর্ঘ ব্যানার। তাতে নানারকম স্লোগান চীনে আর ইংরেজী ভাষায় লেখা। পুরোভাগে শ্বেত-তারকা শোভিত লাল আর নীল মস্তো বড়ো জাতীয় পতাকা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন স্ত্রীলোক আর পুরুষ, তাদের পেছনে ব্যাণ্ড। মাঝখানে একদল চীনে বয়-স্কাউট, তাদের পেছনে চীনে গার্ল গাইড। তারপর চীনে-বাঁশী আর কাঁসর নিয়ে একদল। তাদের পেছন পেছন নানা রকম মুখোস পরা সং-এর দল, তারপর সিংহ-নৃত্যের দল।

পথের দুপাশে অসম্ভব ভিড়, রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোর জানলায় জানলায় অসংখ্য মাথা। হাততালি দিচ্ছে সবাই। আর নানা বয়েসের ছেলেরা মেয়েরা পথচারীদের কাছে কাগজের ফ্ল্যাগ বিক্রি করে বেড়াচ্ছে। কাগজের রিপোর্টারেরা ঘোরাঘুরি করছে চারদিকে। ফ্ল্যাশ বালব ঝলসিয়ে ফোটো তুলছে প্রেস-ফটোগ্রাফারেরা।

ফ্ল্যাগ আর কালেকশান-বক্স্ হাতে নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলো বাচ্চা মেয়ে টিং-লিংও।

মামি কোথায়, মামি ?—একবার ভাবলো সে।

দেখলো তার আমেরিকান মা নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদের মধ্যে, আর প্রেস-রিপোর্টারদের ডেকে ডেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে এটা ওটা সেটা।

মায়ের জন্যে খুব গর্ব হোলো টিংলিংএর। হোক না তার মা আমেরিকান, এখন তো সে ফেং পরিবারের বৌ। আর শুধু তার মা কেন, নিউ ইয়র্কের অনেক সাধারণ চীনের অনেক সাধারণ বিদেশী বৌ অসঙ্কোচে এসে যোগ দিয়েছে এই শোভাযাত্রায়।

এতো চীন দেশের লোক এই নিউ-ইয়র্ক শহরে!—টিং-লিং অবাক হয়ে

ভাবলো,—এত ছেলে, এত মেয়ে তার বয়েসী? কী সুন্দর, কী ফুটফুটে দেখতে!

একবার শুধু চেং-শিয়াংএর কথা মনে পড়লো। বেচারা চেং-শিয়াং—ভাবলো টিং-লিং—সে জানেনা সে কি মিস করলো।

রোদ্দুরের অমন গরম,—একটুও অনুভব করলো না টিং-লিং। গান গাইছে সব ছেলেরা মেয়েরা। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শহরের জনবহুল রাজপথে-রাজপথে ফ্ল্যাগ বেচে বেড়ালো টিং-লিং। এমন উত্তেজনা, এমন আনন্দ, তার জীবনে আর কোনোদিন আসেনি।

কেটে গেল আরো কয়েকটা বছর। জার্মানী যুদ্ধে নামলো। তারপর নামলো আমেরিকাও। টিং-লিংদের দেশে ফেরা হোলো না কিছুতেই। মাঝখানে একবার কি একটা সরকারী কাজে ওয়াশিংটনে এসেছিলো টিংলিংএর বাবা। সে-সময় শুধু কয়েকদিনের দেখা।

তারপর আরো দু-তিন বছর।—চারদিকে বিপুল যুদ্ধ, খবরের কাগজে নিত্য নতুন হেডলাইন,—আর নিউ-ইয়র্কের ফ্যাশান-দুরস্ত সমাজের দুরন্ত জীবনযাত্রা। তারই মধ্যে বড়ো হয়ে উঠলো টিং-লিং,—দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে চীন দেশের সবুজ শ্যামল গাঁয়ের ঝাপসা স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

কেটে গেল আরো কিছু সময়। ইউরোপে যুদ্ধ থেমে গেল, বিধ্বস্ত জার্মানীতে প্রবেশ করলো ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী আর রুশ সেনাবাহিনী।

সেদিন সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক আলোয় আলোকময়। রাস্তায় ভিড়। হোটেলে রেস্তরাঁয় নাইট-ক্লাবে উন্মত্ত নাচের আসর। চারদিকে থাকিতে, সিল্কে, শিফনে মেশামেশি।

তারই মধ্যে এক আমেরিকান ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে টিং-লিং মাঝে মাঝে ভাবছিলো, কবে আমাদের দেশের যুদ্ধও থামবে।

তাও একদিন থামলো।

এটম-বোমা পড়লো হিরোশিমায়, নাগাসাকিতে। জাপান আত্মসমর্পন করলো।

মাসখানেক পরে টিংলিংএর বাবার চিঠি এলো চুংকিং থেকে :—আমি নানকিং যাচ্ছি। তোমরা সবাই সেখানে চলে এসো।

চীনের অন্তবিপ্লব শেষ হবার পর যখন নতুন সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হোলো টিং-লিএর তখন উনিশ বছর বয়েস, ফেং চেং-শিয়াংএর চব্বিশ। তদ্দিনে ওদের মা বাবা দুজনেই মারা গেছেন। চেং-শিয়াং একটা বড়ো চাকরি করতো কুওমিঁনটাং সরকারে।

নানকিং-এর নাম বদলে হলো পিকিং। চিয়াং সরকারের বিশ্বস্ত যারা সবাই চলে গেল ফরমোসায়। সেই সঙ্গে গেল চেং-শিয়াং আর টিং-লিং। টিং-লিং থেকে যেতে চেয়েছিলো। চেং-শিয়াং রাজী হয়নি।

কিন্তু ফরমোসায় এসে চেং-শিয়াং বেশীদিন চাকরি করেনি। সেখান থেকে সায়গন হয়ে ব্যাংককে এসে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা সুরু করলো। সেখানেও থাকলো না বেশীদিন। ব্যাংকক থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন, তারপর এখন কলকাতায়।

"এ ভাবে আর ভালো লাগে না," টিং-লিং বললো দিলীপকে, "আমার কাজ শুধু দাদার সংসার গুছিয়ে রাখা আর দাদার সঙ্গে যাদের ব্যবসার সম্পর্ক তাদের কারো কারো সঙ্গে একটা সামাজিকতার যোগাযোগ বজায় রাখা।"

"কাউকে বিয়ে করে নিজের একটা সংসার পাতলেই পারতে," দিলীপ বললো।

"চেং শিয়াং সেটা চায় না।"

"চিয়েন-চাংএর সঙ্গে তোমার যে মাখামাখি, সেটা যদি জানতে পারে?"

"চিয়েন-চাংএর ক্ষতি হবে তাতে। আমায় অবশ্যি কিছু বলবে না।"

* বারো *

মঙ্গলবার সকাল থেকেই দিলীপ কি রকম একটু অসোয়াস্তি বোধ করছিলো। কি একটা যেন কাজের ভার আছে তার উপর। অথচ মনে পড়ছে না কিছুতেই।

বিকেলবেলা হঠাৎ মনে পড়লো।

টিং-লিং তাকে বলেছিলো চিয়েন-চাংকে যে-করেই হোক মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে সঙ্গে রাখতে। চেং-শিয়াংএর সঙ্গে কোথায় যেন যাবার কথা আছে তার—সেটা যেন সম্ভব হতে দেওয়া না হয় কিছুতেই।

দিলীপ তক্ষুণি চলে এলো ওয়াংদের বাড়ি।

ঘরে ঢুকতেই জেনীর সঙ্গে দেখা। মুখ তার শুকনো।

"চিয়েন-চাং কোথায়," দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"কি ব্যাপার বলো তো," জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"কেন?"

"ঘণ্টাখানেক আগে একবার আহ্-কিম এসে খোঁজ করলো চিয়েন-চাং কোথায়। কিছুক্ষণ আগে এসে খোঁজ করলো চেং-শিয়াং। এখন তুমি। সবাই হঠাৎ তার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছো কেন?"

"আমি এমনি খোঁজ করছিলাম," দিলীপ সহজ হবার চেষ্টা করে বললো। "ওর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। তাই ভাবলাম, আজ সন্ধ্যেবেলা ওর সঙ্গে একটু আড্ডা দেবো। সে কোথায়?"

জেনী একটু চুপ করে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বলো তো?"

"কিসের ব্যাপার?"

"চিয়েন-চাং সেদিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরে এসে টিং-লিংএর খুব নিন্দে করলো। বললো, মেয়েটি নাকি ভালো নয়। ওর অনেক ব্যাপার সে জানতে

পেয়েছে। ওর সঙ্গে নাকি ভাব অনেকেরই, তবে কারো সঙ্গে খুব বেশীদিন নয়। ওর কথা শুনে মনে হলো, টিং-লিংএর কোনো ব্যবহারে সে মনে আঘাত পেয়েছে। ও টিং-লিংকে তো খুব ভালোবাসতো!"

দিলীপ একটু অবাক হোলো। তারপর হাসলো খুব। হেসে বললো, "আচ্ছা পাগল! কি ব্যাপার জানো? সেদিন চেং-শিয়াং আমাকে ওদের বাড়ি যেতে বলেছিলো মনে আছে তো? গিয়ে দেখি, চেং-শিয়াং নেই, আমায় বসতে বলে গেছে, বাড়িতে শুধু টিংলিং একা। টিং-লিংএর সঙ্গে বসে যখন গল্প করছি, এমন সময় চিয়েন-চাং এসে উপস্থিত। সে-ও বোধ হয় আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করতে চেয়েছিলো কিছুক্ষণ। কিন্তু টিং-লিং তাকে বসতে বললো না। তাকে চলে আসতে হোলো। তাই বোধ হয় রাগ করেছে তার উপর।"

"তুমি ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গল্প করেছো, না?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।"

"এ-রকম একটা কিছু আমি আঁচ করছিলাম। কারণ, চিয়েন-চাং আমার কাছে খানিকক্ষণ তোমার নিন্দেও করেছিলো। সে বলছিলো, তুমিও নাকি লোক ভালো নও আর এটা-ওটা-সেটা।"

দিলীপ হাসলো।

ম্লান হাসি হাসলো জেনীও। বললো, "তোমায় তো আমি চিনি দিলীপ। এ-সব যে ফেং চেং-শিয়াংএর ফন্দি, সে আমি খানিকটা বুঝতে পারছি।"

দিলীপ জেনীর হাত ধরলো, বললো, "জেনী।"

"কি?"

"তুমি আমায় বিশ্বাস করো?"

"বিশ্বাস না করলে কি এত কথা বলতাম?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

টিং লিং সেদিন আমায় কি বলেছিলো, জানতে চাও?"

"না।"

"তবু শোনো। জানলে তুমিও খুশি হবে, চিয়েন-চাংও খুশি হবে। তবে এখন কাউকে কিছু বোলো না। টিং-লিং বলছিলো সে চিয়েন-চাংকেই বিয়ে করবে, কিন্তু এখন সে কথা কাউকে জানতে দিতে চায় না। কারণ ফেং চেং-শিয়াং শুনলে ভীষণ রাগ করবে, এমন কি, সে চিয়েন-চাংএর ক্ষতিও করবার চেষ্টা করতে পারে।"

জেনী একটু অবাক হোলো। বললো, "এত কথা তো জানতাম না! চেং-শিয়াংএর সঙ্গে দাদার যে মাখামাখি, তাতে দাদার ক্ষতি হতে পারে সে আমরাও বুঝতে পারছিলাম, আহ্-কিমও সেদিন বলছিলো। তবে টিং-লিং যে দাদাকে এত ভালোবাসে সে কথা তো জানতে পারিনি কোনোদিন ?"

"আজ চিয়েন-চাংএর কোথায় যেন যাওয়ার কথা আছে ফেং চেং-শিয়াংএর সঙ্গে। টিং-লিং আমায় পাঠিয়েছে, আমি যেন তার আগেই চিয়েন-চাংকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসি, যাতে চেং-শিয়াং এসে চিয়েন-চাংকে না পায়।"

জেনী একটু অবাক হয়ে তাকালো দিলীপের দিকে। বললো, "ও, সে জন্যেই চেং-শিয়াং এসে দাদার খোঁজ করছিলো ?"

"চিয়েন-চাং কোথায় ?"

জেনী একটু চুপ করে থেকে বললো, "দাদা একটু কলকাতার বাইরে গেছে। বলেছে এখন কাউকে কিছু না বলতে।"

"কলকাতার বাইরে গেছে ?" দিলীপ অবাক হোলো, "কবে গেছে ?"

"কাল সকাল বেলা।"

"কোথায় গেছে ?"

"তা তো বলে যায় নি। শুধু একটি স্যুটকেস আর হোল্ড-অল নিয়ে গেছে।"

"কবে ফিরবে ?"

"তাও বলে যায় নি। মনে হোলো কয়েকদিন দেরী হবে। তা নইলে গরম স্যুট সবগুলো নিয়ে যেতো না।"

দিলীপ চুপ করে বসে রইলো। ভেবে পেলো না কি করবে—এখানে বসে

জেনীর সঙ্গে গল্প করবে, না জেনীকে নিয়ে বেরোবে, কিংবা একবার দেখা করে আসবে টিং-লিংএর সঙ্গে।

জেনী চা করে দিলো। বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো আস্তে আস্তে। বাইরে একটি গাড়ি এসে থামলো। একটু পরে ঘরে এসে ঢুকলো ফেং চেং-শিয়াং।

দিলীপ আর জেনীকে একসঙ্গে একলা ঘরে দেখে তার মুখে যে রকম ভাব ফুটে উঠবে বলে এরা আশা করছিলো, সে রকম কিছু দেখা গেল না।

তাকে দেখে মনে হোলো সে যেন খুব ক্লান্ত, খুব উৎকণ্ঠিত। সে জিজ্ঞেস করলো, "চিয়েন-চাং কোথায় ?"

"বেরিয়েছে," জেনী বললো।

"কখন ফিরবে ?"

"কিছু বলে যায় নি তো ?"

"কোথায় গেছে জানো ?"

"না, জানি না।"

চেং-শিয়াং ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবলো।

"এক কাপ চা নেবে," জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"না। আমার বসবার সময় নেই," চেং-শিয়াং উত্তর দিলো, "চিয়েন-চাং যদি ছ'টা মধ্যে ফেরে তো বোলো আমি তার জন্যে অপেক্ষা করবো, সে যেন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। কোথায় দেখা করতে হবে সে জানে।"

"আর যদি ছ'টার মধ্যে না ফেরে ?"

"তা' হলে—তা'হলে—," ভুরু কুঁচকে চেং-শিয়াং একটু ভাবলো, ভেবে বললো, "তা'হলে আজ আর আমার সঙ্গে দেখা করবার দরকার নেই। আমিই এসে ওর সঙ্গে দেখা করবো কাল কিংবা পরশু।"

চেং-শিয়াং চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ দুজনেই। তারপর দিলীপ হঠাৎ বললো, "জেনী, ভাবছি আর বেশীদিন অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।"

জেনী বুঝতে পারলো না। চোখ তুলে তাকালো দিলীপের দিকে।

দিলীপ বলে গেল, "সামনে হপ্তায় যদি দিন ঠিক করতে চাই তোমার বাবা কি আপত্তি করবেন?"

"কিসের দিন?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"বিয়ের দিন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করে আসতে হবে তো—।"

জেনী তার চেয়ার থেকে উঠে এসে দিলীপের চেয়ারের হাতলের উপর বসলো। বসে দিলীপের কাঁধে হাত রেখে বললো, "দিলীপ, তুমি সত্যিই এত সিরিয়াস?"

"সিরিয়াস না তো কি ছেলেখেলা?"

"দিলীপ, ভালো করে ভেবে দেখ—আমায় বিয়ে না করে হয়তো তোমাদের নিজের জাতের মেয়ে বিয়ে করলে অনেক সুখী হবে তুমি।"

"না, জেনী, তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না, আর কাউকে বিয়ে করবোও না। অবশ্যি তুমি যদি না চাও—"

"না, না, দিলীপ, ও কথা বোলো না। তুমি তো জানো, আমিও তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।"

"তা হলে সামনের হপ্তায় গিয়ে বিয়েটা সেরে আসি।"

জেনী আস্তে আস্তে বললো, "বেশ, তুমি যদি চাও তো তাই হবে।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, "দিলীপ, আমার ভয় করছে—।"

"কেন? দিলীপ হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"না, হাসি নয়। চেং-শিয়াংকে তুমি চেনো না।"

"তার সঙ্গে কি সম্পর্ক?"

"সে আমায় বিয়ে করতে চায়, জানো তো?"

"কি হয়েছে তাতে?"

"সে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করে?"

দিলীপ হাসতে সুরু করলো। বললো, "আমার কি ক্ষতি করবে সে?"

জেনী আর কিছু বললো না।

দিলীপ ঘড়ি দেখলো। তারপর উঠে পড়লো।

"কোথায় যাচ্ছো ?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"একবার টিং-লিংএর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"কেন ?"

"তাকে একবার জানিয়ে দেওয়া দরকার যে চিয়েন-চাং কলকাতায় নেই। সুতরাং সে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারে।"

টিং-লিং বাইরের ঘরে বসেছিলো চুপচাপ। দিলীপকে দেখে কোনো কথা বললো না। হাত দিয়ে শুধু চেয়ার দেখিয়ে দিলো। দিলীপ চেয়ার টেনে বসতে জামার ভিতর থেকে একটি চিঠি বার করে দিলীপের হাতে দিলো।

"কার চিঠি ?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"পড়ে দেখ।"

চিঠি ইংরেজিতে লেখা। দিলীপ দেখলো, চিঠির নিচে চিয়েং-চাংএর সই।

ডিয়ার টিং-লিং—সে লিখেছে—তুমি যখন এ চিঠি পাবে, আমি ততক্ষণে বম্বে পৌছে গেছি। আমি সেদিন রাত্রে তোমায় একথাই জানাতে গিয়েছিলাম যে আমার পাসপোর্ট আর ভিসা হয়ে গেছে। একটা চাকরির ব্যবস্থাও হয়ে গেছে নিউ ইয়র্কে। টাকাকড়ি যা যোগাড় করবার দরকার ছিলো, তা-ও হয়ে গেছে। আমি জানতে গিয়েছিলাম তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে—না কি আমি আগে চলে যাবো, তুমি পরে আসবে। তোমার বাড়ি গিয়ে তোমার কাছ থেকে যা ব্যবহার পেলাম তাতে মনে হোলো জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন আর নেই। সেদিন একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হোলো, সে ব্যাংকক থেকে এসেছে, তোমাদের চেনে, তার কাছ থেকে তোমার কথা অনেক শুনলাম। তাই ভাবলাম তোমার কাছ থেকে কিছু আশা না করাই ভালো। তুমি তোমার মতো সুখে থাকো। আমিও আমার নতুন জীবন সুরু

করি বিদেশে গিয়ে। বম্বে থেকে প্লেন ধরে আমেরিকায় যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।—চিয়েন চাং।

দিলীপ চোখ তুলে দেখলো টিং-লিংএর চোখ জলে ভাসছে।

যেই ডাকে চিঠি এসেছিলো টিং-লিংএর কাছে সেই ডাকে বুড়ো ওয়াঙের কাছেও চিয়েন-চাংএর চিঠি এসেছিলো।

বুড়ো ওয়াং প্রথমে মনে মনে একবার চিঠিটা পড়ে নিলো। জেনী, মিনি আর স্থং-চাং একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। চিঠি পড়ে ওয়াং দু-তিন মিনিট চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলো। তার পর ছেলে-মেয়েদের কাছে ডেকে খুব নিচু গলায় চিয়েন-চাংএর চিঠি পড়ে শোনালো।

মিনি চুপ করে রইলো নির্বিকার ভাবে। জেনীর চোখ জলে ভরে উঠলো। একটু খুশি-খুশি দেখালো স্থং-চাংকে।

"জীবনের এই ধারা," ওয়াং আস্তে আস্তে বললো, "ছেলে-মেয়েরা ছড়িয়ে পড়বে দেশ-বিদেশে, নতুন করে নতুন পরিবারের গোড়া পত্তন করবে। ওয়াংদের খুঁজে পাবে হাঙ্কাও, ফুকিয়েন, হংকংএ। ওয়াংদের পাবে ব্যাংকক, সাইগন, সিঙ্গাপুর, কুয়ালা-লামপুরে, খুঁজে পাবে জাকার্তায়, রেঙ্গুনে। এ ভাবে ছড়াতে ছড়াতে আমরা এসেছি কলকাতায়। এবার একজন চললো আমেরিকায়। সে সুখী হোক, দেশী বা বিদেশী যাকে খুশি বিয়ে করে ওয়াংদের বংশ বিস্তার করুক। ওয়াং-পূর্বপুরুষদের আত্মার কল্যাণ হোক।"

একটু চুপ করে রইলো ওয়াং। তারপর বললো, "যে যেখানে খুশী থাক, আমি একটুও দুঃখিত হবো না। আমি শুধু চাই যে আমার ছেলেমেয়েদের অন্তত একজন ফুকিয়েন ফিরে যাক।"

আবার চক্ষু নিমীলিত করলো বুড়ো ওয়াং। জেনী, মিনি, স্থং-চাং আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসে স্থং-চাং বললো, "চিয়েং-চাং আমেরিকা যাচ্ছে, ভালোই

হোলো। আমিও থাকবো না। রোজী বলছে তার ইণ্ডিয়া ভালো লাগে না, সে তার হোম ইংল্যাণ্ডে চলে যাবে। আমিও চলে যাবো তার সঙ্গে।"

মিনি গম্ভীর ভাবে বললো, "রোজী তো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ওর হোম ইণ্ডিয়া। সে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কি করবে?"

"না, ওর হোম ইংল্যাণ্ডে, ওর পূর্বপুরুষ সেখান থেকে এদেশে এসেছে, ওদেশে ওর অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে।"

মিনি বললো, "আমি কিন্তু ফুকিয়েনে চলে যাবো। আহ্-কিমও যাবে। আমাদের মধ্যে তাই কথা হয়ে আছে।"

"সবাই যার যেখানে খুশি যাবে," জেনী চোখের জল মুছে বললো, "কিন্তু চিয়েন-চাং যদি তোমাদের মতো এত খুশি মনে যেতে পারতো, আমার দুঃখ করার কিছু থাকতো না। সে কিন্তু অনেক দুঃখ নিয়ে এদেশ ছেড়ে গেল।

মিনি আর স্থং-চাং চুপ করে রইলো।

জেনী আস্তে আস্তে বলে গেল, "যে যেখানে খুশি যাও, আমি কিন্তু কলকাতা ছেড়ে এক পা-ও নড়ছি না। এদেশে শেষ পর্যন্ত আমি আছি আর বুড়ো ওয়াং আছে।"

* তেরো *

দিলীপ একদিন জেনীকে বলেছিলো, "তোমার বোন মিনি যদি আহ্‌-কিমকে বিয়ে করে চীনে ফিরে যায়, ওদের সঙ্গে তোমার বাবাকেও পাঠিয়ে দিতে পারো।"

"কেন?"

"সুং-চাংও এখানে থাকবে না, তুমি আর আমি মিলে যে সংসার পাতবো সেটা চায়না টাউনে নিশ্চয়ই নয়—বুড়ো ওয়াংএর কি এখানে একা-একা ভালো লাগবে?"

শুনে জেনী একটু ম্লান হেসেছিলো, বলেছিলো, "বাবা কলকাতা ছেড়ে নড়বে না।"

"কেন!"

"সে অনেক কথা। ফেং হুং-মিং এর নাম শুনেছো?"

"ফেং হুং-মিং? হ্যাঁ আহ্‌-তং একদিন বলেছিলো কিছু কিছু। এককালে তো সে ছিলো চায়না টাউনের রাজা—।"

"হ্যাঁ। সে-ই প্রথম বাবাকে কলকাতায় নিয়ে আসে। সে আঠারোশো ছিয়ানব্বুই সালের কথা।"

বুড়ো ওয়াং জন্মেছিলো ফুকিয়েনে, তাদের পৈত্রিক খামার-বাড়িতে। সে সময় তাদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল, কিন্তু সে একটু বড়ো হতে না হতেই বাপ মারা গেল, খুড়োরা জমাজমি যা ছিলো হাত করে বাড়ি থেকে বার করে দিলো ওয়াংকে।

ফেং-হুং-মিং যখন ওয়াংকে প্রথম দেখলো তখন তার বয়েস কুড়ি কি একুশ। হ্যাংকাওর কুখ্যাত পাড়ায় গুণ্ডামি করে বেড়ায়।

ফেং হুং-মিং-এর মাথার উপর তখনো চীন সরকার পুরস্কার ঘোষণা করে

নি। দক্ষিণ-চীন-সমুদ্রের বন্দরে বন্দরে সে তখনো স্বচ্ছন্দ ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার জাঙ্ক্ আছে কয়েকটি, সমুদ্রে ডাকাতি করে বেড়ায়। খবরটা সরকারী ভাবে কারো জানা নেই, এমনি জানে সবাই। তাই ভয় করে, সমীহ করে ফেং হুং-মিংকে। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, কলকাতার চায়না টাউনগুলোতে তার অপ্রতিহত প্রতাপ, বিশেষ করে কলকাতায়।

হ্যাংকাও-এর এক জুয়ার আড্ডায় ওয়াং ফেং হুং-মিং-এর এক অনুচরকে ধরে ঠ্যাঙালো। অন্য লোকদের হাতে হয়তো তক্ষুণি ছুরি খেতো ওয়াং, কিন্তু সেদিন ফেং হুং-মিং স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলো বলে সে বেঁচে গেল। সেই বাঁচিয়ে দিলো তাকে, কারণ একটু অবাক হয়েছিলো সে। ফেং হুং-মিং-এর অনুচরকে ধরে ঠ্যাঙায় হ্যাংকাওএ এমন সাহস কার? তাকে ডেকে দু-চার কথা জিজ্ঞেস করতেই জানলো সে ফুকিয়েনের ওয়াং।

ফেং হুং-মিং চিনতো অন্য এক ওয়াংকে।

জিজ্ঞেস করলো, "অমুক ওয়াং তোমার কে হয়?"

"আমার বাবা।"

"তোমার বাবা?" অবাক হোলো ফেং-হুং-মিং। "তার মানে সুং-লি তোমার মা?"

"হ্যাঁ।"

"আরে, এতক্ষণ বলো নি কেন? তুমি জানো সুং-লির বোন তাই-লি আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী?"

"হ্যাঁ— ?"

"তবে চুপ করে আছো কেন? তুমি আমার নিকট-আত্মীয়।"

"আমার আরো নিকট আত্মীয় আমার কাকারা," ওয়াং উত্তর দিলো, "ওদের কাছ থেকে যা ব্যবহার পেয়েছি, তার পর থেকে আমি আত্মীয় দেখলে ভয় পাই।"

ফেং হুং-মিং তাকিয়ে দেখলো ওয়াং-এর দিকে। তারপর হোঃ হোঃ করে হেসে ফেললো।

বললো, "দেখ বৎস, হাতের সব আঙুল সমান নয়, উইলো গাছের সব পাতা সমান নয়, তেমনি সব মানুষ সমান নয়। আমি যে তোমার সত্যিকারের হিতৈষী আত্মীয় সেটা বুঝবার সুযোগ দিতে রাজী আছি তোমায়। তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে ?······

···ওয়াং ফেং-হুং-মিংএর সঙ্গে কলকাতায় চলে এলো। সেটা আঠারো শো ছিয়ানব্বুই সাল, তার বয়েস তখন কুড়ি।

সেই অল্প বয়েসেই সে ফেং-হুং-মিংএর ডান হাত হয়ে উঠলো।

আফিং কোকেনের চোরা ব্যবসা, ডাকাতি গুণ্ডামি রাহাজানি, এমন কোনো কুকাজ নেই যা ওয়াং করতো না।

এই পর্যন্ত বলে জেনী থামলো। তাকালো দিলীপের মুখের দিকে। তারপর বললো, "দিলীপ, এই আমার বাবার আসল পরিচয়।"

দিলীপ জেনীর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব সহজ হাসি হাসলো।

"এসব অনেকদিন আগেকার কথা," জেনী বলে গেল, "অনেকেরই মনে নেই, আমরাও আর কাউকে বলি না। কিন্তু আমার মনে হোলো তোমায় বলা দরকার। তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও, সুতরাং আমরা কি, সে-কথা তোমার ভালো ভাবেই জেনে নেওয়া দরকার। একথা শুনে তুমি যদি তোমার মত পাল্টে ফেল, আমি একটুও দুঃখিত হবো না।"

দিলীপ হাসলো। বললো, "জেনী, পঞ্চাশ বছর আগে তোমার বাবা কি ছিলেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি জানি বুড়ো ওয়াংকে, সে খুব ভালো লোক। আমি জানি দুষ্টু মেয়ে জেনীকে, সে-ও খুব ভালো।"

জেনীর ছোটো ছোটো চোখ দুটো জলে ভরে এলো, মাথা নিচু করলো সে।

"তারপর ?" জিজ্ঞেস করলো দিলীপ।

"আমাদের সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে চাও বুঝি ?"

"না, না, সে ভাবে আমি কিছু জানতে চাই না," দিলীপ বললো, "আমার

গল্প শুনতে ভালো লাগে। বিশেষ করে এ-ধরণের রোমাঞ্চকর গল্প। তোমার বাবা কলকাতায় এসে ফেং-হুং-মিং'এর ডান হাত হয়ে উঠলেন। তারপর?"

ফেং-হুং-মিং-কে যদি বলা হয় চায়না টাউনের রাজা, বিবি আমেলিয়ার মেয়ে রেবেকা বিবিকে বলা যেতো চায়না টাউনের রানী। রূপের জৌলুস তার বিবি আমেলিয়ার মতোই। তার খ্যাতি কলকাতার নানাজাতের অভিজাত মধুকরদের মধ্যে বিস্তৃত। বিবি আমেলিয়া লেনে রেবেকা বিবির বৈঠকখানায় পায়ের ধূলো দিতো না, এমন রাজা মহারাজা নবাব জমিদার পাওয়া যেতো না পুরোনো দিনের কলকাতায়।

সে-সময় আশেপাশে অনেক বাড়ি ছিলো তার নিজেরই, তাতে থাকতো শুধু নানা রকম মেয়ে, যাদের খুঁজে পেতে নিয়ে আসতো, অনেক সময় ধরে নিয়ে আসতো ফেং-হুং-মিংএর দল, নিয়ে আসতো বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্দর থেকে। আর এসবকে কেন্দ্র করেই রেবেকা বিবি আর ফেং-হুং-মিংএর নানা রকম অসমাজিক, অনৈতিক, বেআইনী ব্যবসা। কিন্তু কেউ তাদের কিছু বলতে সাহস করতো না। ইংরেজের আইন, ইংরেজের পুলিস ঢুকতো না এ অঞ্চলে। এরাই ছিলো এ অঞ্চলের আইন। আর রেবেকা বিবির পৃষ্ঠপোষক ছিলো অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ। পরে বক্সার যুদ্ধের সময় ফেং-হুং-মিং ইংরেজদের সাহায্য করেছিলো বলে তাকেও ঘাঁটাতো না ইংরেজ সরকার।

এদের মধ্যে এসে ওয়াং বেশ ভালোই ছিলো। অভাব নেই, দুর্ভাবনা নেই। এ অঞ্চলের এক জুতো-ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করে সে সংসারও পেতেছিলো।

উনিশ শো চব্বিশে তার ছেলে চিয়েন-চাংএর জন্ম হোলো।

তার পরের বছরে ওয়াংএর জীবনের একটি নতুন পরিচ্ছেদ সুরু হোলো।

ওয়াং ফেং-হুং-মিংএর সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলো আঠারো শো ছিয়ানব্বুই

সালে। তার বছর দু'য়েক পরে ফেং-হুং-মিংএর ঔরসে রেবেকা-বিবির একটি মেয়ে হোলো।

মেয়েটিকে চোখের সামনেই বড়ো হতে দেখেছে ওয়াং। মেয়েটির বারো বছর বয়েস হতে না হতে রেবেকা-বিবি তাকে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে দিলো নিজের এক আত্মীয়ের কাছে।

ওয়াং শুনলো যে রেবেকা-বিবি মেয়েকে এ রকম পরিবেশের মধ্যে রাখতে চায় না। তাই তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সে পড়াশুনা করবে, গান-বাজনা শিখবে—বিশেষ করে গানে তার ভীষণ ঝোঁক।

রেবেকা-বিবি প্রায়ই লক্ষ্ণৌ গিয়ে মেয়ের কাছে কিছুদিন কাটিয়ে আসতো। আর মাঝে মাঝে যেতো ফেং-হুং-মিং।

তারপর মেয়েটিকে ওয়াং অনেক দিন দেখেনি। কি তার নাম তাও জানতো না।

ফেং-হুং-মিং উনিশ শো বিশ সালে একবার কুয়ালা-লামপুরে কি একটা কাজের উপলক্ষে গিয়েছিলো, সেখান থেকে আর ফিরলো না। একদিন সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গিয়েছিলো এক কুখ্যাত অঞ্চলের রাস্তার ধারে। কারা তাকে গুলি করে মেরে ফেলে রেখেছিলো।

তারপর রেবেকা-বিবিও আর কলকাতায় থাকে নি। সে চলে গেল লক্ষ্ণৌ, মেয়ের কাছে। এখানকার যা কিছু দেখাশোনা করবার সবই করতো ওয়াং।

বছর পাঁচেক পরে, চিয়েন-চাংএর যখন আট ন'মাস বয়েস, রেবেকা-বিবি কলকাতায় ফিরে এলো। তখন তার বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেয়েকেও। সেই বারো বছরের মেয়ের তখন ছাব্বিশ সাতাশ বয়েস। আগুনের মতো রূপ। অদ্ভুত গানের গলা। নামও নিয়েছে নতুন ধাঁজের—জুলেখা বাঈ।

রেবেকা-বিবি ওয়াংকে ডাকিয়ে এনে বললো, "এবার তোমায় একে দেখাশোনা করতে হবে।"

সেই উনিশ শো পঁচিশ ছাব্বিশের কলকাতা শহরের সবচেয়ে নাম করা মুজরাওয়ালী ছিলো জুলেখা বাঈ। শহরের বিশিষ্টতম মাইফেলেই তাকে দেখা যেতো আর তার কাছেও আসতো শুধু ধনবান রসিকজন। সন্ধ্যের পর বিবি আমেলিয়া লেনের সরু গলিতে গাড়ির পর গাড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতো তার বাড়ির নিচে। সাধারণ লোকে তাকে দেখতে পেতো না বড়ো একটা। শুধু নানা রকম গল্প শুনতো জুলেখা বাঈ-এর সম্পর্কে। তার গান শুনে কোথাকার মহারাজা হীরের হার রেখেছিলো তার পায়ের কাছে, কোন দেশের নবাবজাদা লাখ টাকা ঢেলেও তার মন পায়নি, রামপুরের কোন ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ তাকে সশ্রদ্ধ তসলিম জানিয়েছিলো। তার খ্যাতি শুনে বাংলার গভর্ণর লাটপ্রাসাদে মাইফেল বসিয়েছিলো, যে সম্মান একমাত্র জুলেখা বাঈ-এর ছাড়া আর কোনো মুজরাওয়ালীর কোনো দিন জোটেনি। সেখানেও সে তার মেজাজ দেখিয়ে এসেছে। দু-ঘণ্টা গাইবার কথা ছিলো তার, দু-ঘণ্টা গেয়েছে, তারপর লাটসাহেবের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও এক মিনিটও বসেনি। লাটসায়েব বলেছিলো আরো টাকা দেবো। সে হেসে বলেছিলো সায়েবের বহুত মেহেরবানি, কিন্তু লাট-বড়লাটের এক মাসের মাইনে একদিনে রোজগার করবার ক্ষমতা তার আছে।

এমনি ছিলো তার দেমাক। তার ব্যক্তিত্বের সামনে মাথা নত করতে হয়েছে গভর্ণর রাজা মহারাজা নবাব লাখপতি সবাইকে। অন্যান্য মুজরা-ওয়ালীদের থেকে সে ছিলো একেবারে আলাদা জাতের। সে গান গাইতো শুধু। কিন্তু কোনো দিনই নাচতো না। শুধু দাঁড়িয়ে ভাও দিয়ে গান গাইতো—এই পর্যন্ত।

সাধারণ লোকের জন্যে ছিলো শুধু তার গানের রেকর্ড। এত চাহিদা ছিলো তার গানের রেকর্ডের, যে বাজারে পড়তে পেতো না। জুলেখা বাঈ-এর জুড়িগাড়ি যাচ্ছে শুনলে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যেতো। কিন্তু একমাত্র মাইফেলে ছাড়া সর্বত্র পর্দা মেনে চলতো জুলেখা বাঈ।

শুধু সন্ধ্যের পর যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে নামতো কলকাতায়, তখন খোলা

ফিটনে চেপে হাওয়া খেতে বেরোতো রেড রোড ধরে। ময়দানের আশে-পাশে তখন নিথর নির্জন, লোকে একলা চলাফেরা করতে সাহস পেতো না। জুলেখা বাঈ যে ময়দানে হাওয়া খেতে যেতো একথাও বড়ো একটা অজানা ছিলো না। কিন্তু কেউ কোনো দিন সাহস করে সেদিকে যেতো না—কারণ তার সঙ্গে থাকতো চায়না টাউনের ওয়াং।

আর তখনকার দিনে কে নাম শোনেনি ওয়াঙের? ওয়াঙের নামে চায়না টাউন থরথর করে কাঁপতো।

শোনা যেতো, জুলেখা বাঈএর যা রোজগার, সে শুধু গান গেয়ে নয়। তার বাড়ির পেছন দিকে ছিলো এক বিরাট জুয়ার আড্ডা আর সেখানে নাকি লাখ লাখ টাকা ঢেলে আসতো শহরের বড় বড় ধনীরা। সেই জুয়ার আড্ডা দেখাশোনা করতো ওয়াং।

এ নিয়ে কেউ কোনো দিন মাথা ঘামায় নি, কিন্তু উনিশ-শো সাতাশের নভেম্বর মাসে হাটখোলার বিখ্যাত ধনী প্রতাপ সাহার লাশ যখন বুকে আমূল ছুরি-বেঁধা অবস্থায় পাওয়া গেল বিবি আমেলিয়া লেনে, তখন এ নিয়ে কানাঘুষো খুব প্রবল হয়ে উঠলো। কমিশনার সায়েব নিজে এসে তদন্ত করে গেলেন সে পাড়ায়। শোনা গেল ওয়াং লালবাজারে গিয়ে কাটিয়েও এসেছে দু-দিন, কিন্তু তারপর ধামাচাপা পড়ে গেল ব্যাপারটা।

আরেক বার হৈ-চৈ হয়েছিলো যখন উত্তরপ্রদেশের এক বিখ্যাত লালাজীর সুন্দরী অপহৃতা মেয়েকে উদ্ধার করা হোলো বিবি আমেলিয়া লেনের এক বাড়ি থেকে। জানা গেল সে বাড়ির মালিক জুলেখা বাঈ, কিন্তু সে বাড়ি বিভিন্ন অংশে ভাড়া দেওয়া, কোনো এক ভাড়াটের ঘরেই পাওয়া গেছে সেই মেয়েটিকে। জুলেখা বাঈকে কেউ কিছু বলার সুযোগ পেলো না।

জুলেখা বাঈ-এর জীবনে তখনো কোনো পুরুষ আসেনি। অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়ে রসিকজন যারা আসতো তারা শুধু টাকা ঢেলে গেছে তার পায়ে, তার ভালোবাসা পায় নি। তার একমাত্র বিশ্বাসভাজন ছিলো ওয়াং।

হয়তো তাকে নিয়েই নানারকম কথা উঠতে পারতো জুলেখার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, যারা উৎসুক তাদের মধ্যে। কিন্তু সে কথা ওঠেনি, কারণ ওয়াঙের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে হয়েছে একটি, আর সবাই জানে যে ওয়াং যদি কলকাতায় কাউকে ভয় পায় তো সে শুধু তার বৌ।

অথচ ভয় পাওয়ার মতো এমন কিছু নয় সে। রোগা ছোটোখাটো মেয়ে, ঘর-সংসার দেখে, রান্নাবান্না করে, ছেলে সামলায়। তাকে প্রায় সকালবেলা দেখা যেতো বেতের ঝুড়ি হাতে বাজারে যাচ্ছে। দেখলে মনে হয় ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। অথচ তারই সামনে পড়লে দুর্ধর্ষ ওয়াং কি রকম যেন ক্যাবলা হয়ে যেতো।

এতক্ষণ বাড়ি ফেরোনি কেন? ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—ধমকাতো তার বৌ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি—বলে ওয়াং বাড়িমুখো ছুটলো।

কোথায় বেরোচ্ছো? ছেলে কাঁদছে, ওকে একটু দেখ, আমি চান করে আসি—হুকুম করতো তার বৌ।

আচ্ছা, আচ্ছা, দেখছি—বলে ওয়াং বাইরে বেরোনো স্থগিত রেখে ছেলেকে কাধে তুলে নিয়ে নাচাতো।

আর সেই ওয়াং পথে বেরোলে পথচারীরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিতো। পথের পাশে কোনো দোকানের সামনে থেমে গেলে দোকানদার তাড়াতাড়ি সিগারেটের টিন হাতে করে বেরিয়ে আসতো।

সেই ওয়াং যতো অন্তরঙ্গই হোক জুলেখার সঙ্গে, তার সম্বন্ধে যে কেউ কিছু বলবে, সে সাহস কারো ছিলো না। আর সবার কি রকম একটা ধারণা ছিলো যে ওয়াং জুলেখার সঙ্গে যতো অন্তরঙ্গই হোক, কোনো রকম নিবিড়তর যে কিছু করতে যাবে সে সাহস ওয়াঙের নেই। কারণ কোনো কিছু ঘটলেই কানাঘুষোয় কিছু না কিছু ছড়িয়ে পড়বে, হয়তো জানতে পারবে ওয়াঙের বৌ, আর একমাত্র তাকেই ওয়াং ভয় পায়।

সুতরাং এ দিক থেকে একটু নিশ্চিন্তই ছিলো জুলেখার অনুগ্রহপ্রত্যাশী

যায়। কারণ এসব ব্যাপার নিয়ে ওয়াং মাথা ঘামাবে না। তবে বেশী বিরক্ত করে জুলেখাকে চটিয়ে দিলেই বিপদ, কারণ তাহলে আর ওয়াঙের হাত থেকে নিস্তার নেই।

জুলেখা বাঈকে নিয়ে ওয়াং হয়তো মাথাও ঘামায় নি কোনোদিন। তার নির্বিকার মুখে ভাবলেশহীন ছোটো ছোটো চোখ দুটো দেখে কোনো দিন মনেও হোতো না যে জুলেখার অনিন্দ্য সৌন্দর্য তার মনে কোনো রেখাপাত করে। যার জন্যে জুলেখার এত নাম, জুলেখার সেই গানের গলার সম্বন্ধেও সে ছিলো একেবারে নিস্পৃহ। কারণ ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতে তার কোনো অনুরাগ থাকবার কোনো অবকাশ ছিলো না। জুলেখার সম্বন্ধে তার যতোটুকু পেশাগত দায়িত্ব,—অবাঞ্ছিত লোকের মনোনিবেশ থেকে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা, তার জুয়ার আড্ডা সামলানো আর সন্ধ্যেবেলা সে যখন ময়দানে হাওয়া খেতে যেতো তখন তার সাহচর্য দেওয়া,—এর বেশী কোনো আগ্রহ দেখা যেতো না তার মধ্যে। আর তার সম্বন্ধেও জুলেখার মনোভাব ছিলো দেহরক্ষীর প্রতি বাদশাজাদীদের যেরকম থাকে সেই রকম।

এমনি ভাবেই কেটে যাচ্ছিলো এই কটা বছর—হয়তো কেটে যেতো সারাজীবন, যদি না এর মধ্যে এসে পড়তো বকুলপুরের দর্পনারায়ণ চৌধুরী।

বাংলাদেশের নামকরা জমিদার বকুলপুরের চৌধুরীরা। সে বংশের ছেলে দর্পনারায়ণ। ওদের বাবুয়ানার খ্যাতি দেশ-বিস্তৃত। ওদের বাড়ির প্রত্যেকটা ঘোড়ার জন্যেই নাকি দিন এক বালতি রসগোল্লা বরাদ্দ ছিলো এককালে। সে বাড়ির ছেলে বিলেতফেরত শখের ব্যারিস্টার দর্পনারায়ণের দিন এক বালতি রসগোল্লা ঘোড়াকে খাওয়ানোর মেজাজ না থাকলেও যৌবনের উপভোগ্য সব কিছুই টাকা দিয়ে কেনবার নেশা ছিল অত্যন্ত তীব্র। কোনো এক মহারাজার কন্যার শ্লীলতাহানি করেছিলো বলে মামলায় তার দশ হাজার টাকা ফাইন হয়। দর্পনারায়ণ কুড়ি হাজার টাকা ছুঁড়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার সে চেষ্টা করেছিলো আদালতের মধ্যেই—এমন গল্প কলকাতার রকবাজদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সেই দর্পনারায়ণ চৌধুরী যখন এমনি একদিন গান শুনতে এলো জুলেখা বাঈয়ের বাড়িতে, তখন, ওয়াং অত লক্ষ্য করেনি। প্রথমটা ভেবেছিলো একে কোনো রকমে কোনো ব্যাপারে ফাঁসিয়ে কিছু মোটা টাকা হস্তগত করা যায় কি না। কিন্তু পরে যখন শুনলো যে ওদের আর আগের অবস্থা নেই তখন আর বেশী মাথা ঘামায়নি তার সম্বন্ধে। তাকে জুলেখা বাঈ-এর বাড়িতে আরো দু-বার দেখেও এড়িয়েই গেছে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা জুলেখার সঙ্গে বেরোনোর জন্যে সে রুটিন মাফিক এসে শুনলো—জুলেখা তার জন্যে আর অপেক্ষা করেনি। আগেই বেরিয়ে গেছে। সঙ্গে গেছে শুধু এক পরিচারিকা। শুনে একটু অবাক হোলো ওয়াং। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ রকম কোনো দিন হয়নি।

বাইরে বেরিয়ে এসে পথের পাশের এক দোকানে ঢুকে এক পট চা নিয়ে বসলো। তখন কি রকম যেন একটা অসোয়াস্তি তার মনে। সে বুঝে উঠতে পারলো না কেন। একটি লোক এসে খবর দিলো তার বৌ তাকে ডাকছে। তাকে ধমকে তাড়ালো ওয়াং। রাত বারোটার আগে বাড়িই ফিরলো না। সেই প্রথম সে তার বৌয়ের অবাধ্য হোলো।

ওয়াং যখন বাড়ি ফিরলো, ততক্ষণে ব্ল্যাকবান লেনে এক নিরীহ দোকানদারের দাঁত ভেঙেছে তার ঘুষিতে, ছাতাওয়ালা গলিতে সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে একপ্রস্থ, নর্দমায় গড়াগড়ি দিয়েছে তিরেটা-বাজারের জনি মর্গ্যান।

বাড়ি ফিরতে বৌ শুধু একবার তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। কোনো কথাই বললো না।

দ্বিতীয় দিনও সেই একই ব্যাপার।

জুলেখা বাঈ বেরিয়ে গেছে ওয়াং গিয়ে পৌঁছানোর আগেই।

তৃতীয় দিন ওয়াং একটু সকাল করেই জুলেখা বাঈ-এর বাড়ি হাজির হোলো। জুলেখা তাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেল ভেতরে। বললো, এখন থেকে তার আর আসবার দরকার নেই। জুলেখা একাই বেরোবে সন্ধ্যার পর।

গাড়ির কোচম্যান আর এক পরিচারিকা থাকলেই যথেষ্ট। ওয়াঙের মূল্যবান সময় জুয়ার সঙ্গে নষ্ট করে লাভ নেই। সে সময়টা জুয়ার আড্ডার তদারক করলে অনেক বেশী কাজ দেবে।

বেরোনোর পথে ওয়াং জুলেখা বাঈ-এর পরিচারিকাকে ধরে জিজ্ঞেস করলো—কি ব্যাপার?

কিছুই না—সে উত্তর দিলো—বিবিজী এখন যথেষ্ট বড়ো হয়ে গেছে। তার সঙ্গে কেউ না থাকলেও চলে।

তা তো চলে। কিন্তু এ কথা বলতে বলতে সে যে মুখ টিপে হাসলো সেটাই ওয়াঙের ভালো লাগলো না।

সেদিন সন্ধ্যার পর ওয়াং নিজেই একটি ঠিকে গাড়ি ভাড়া করে রেড রোডে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একপাশের অন্ধকারে।

অনেকক্ষণ মশার কামড় খেলো চুপচাপ গাড়ির ভিতর বসে থেকে।

তারপর এক সময় শুনলো, ঘোড়ার গলার টুংটাং ঘন্টা। আওয়াজটা খুব চেনা। জুলেখা বাঈ-এর গাড়ি আসছে ফাঁকা পথ ধরে।

কিছুক্ষণ পর গাড়িটা তাকে পেরিয়ে যেতে দেখলো জুলেখা গাড়িতে একা নয়, আরো একজন আছে তার সঙ্গে।

হঠাৎ মনে একটা সাংঘাতিক ধাক্কা খেলো সে। কি করবে ভেবে পেলো না কয়েক মুহূর্ত।

একবার ভাবলো গাড়ি ছুটিয়ে যাই জুলেখার পেছন পেছন।

তারপর ভাবলো, নাঃ, ও যার সঙ্গে যাবে যাক—আমার কি। ওতো এরকম যাবেই। ওর তো এই পেশা।

ওখানে আর সময় নষ্ট না করে ওয়াং ফিরে গেল চায়না টাউনে। একটি বার-এ ঢুকে মদ খেলো কয়েক গ্লাস, অকারণ দুটো চড় মারলো বেয়ারাকে। বাড়ি ফিরতে দেখে, তার বৌ চুপচাপ বসে ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ওয়াং বললো সে খাবে না। বাইরে খেয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো ওয়াঙের বৌ। তারপর বললো, "খেতে ইচ্ছে না হয় খেয়ো না,

কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, জুলেখা বাঈ বারবনিতার মেয়ে, নিজেও তাই।"

ওয়াং হঠাৎ চটে গেল। হঠাৎ ফুলে গেল তার পেশীগুলো।

ওয়াঙের বৌ হাসলো।

জিজ্ঞেস করলো, "কি হোলো? আমায়ও মারধোর করবার ইচ্ছে হচ্ছে না কি?"

ওয়াং চুপ করে রইলো। ভাবলো, সত্যিই তো। আমার কেন এরকম হবে। জুলেখার কাছে কতোজন আসে, সে টাকা নেয় ওদের কাছ থেকে। আজ না হয় সন্ধ্যায় বেরিয়েছে একজনের সঙ্গে, সে হয়তো অন্যান্য সবার চাইতে অনেক বেশী টাকা ঢেলে দিচ্ছে তার পায়ে।

তবু—ওয়াং ভাবলো—তবু এই সন্ধ্যার সময়টা কেন? যে সময়টা কোটি টাকা দিলেও জুলেখা অন্য কোথাও যেতো না, যে সময়টা গত তিন চার বছর ধরে শুধু একটি রুটিন মেনে চলেছে, যে সময়টা শুধু ওয়াং আর তার একলা পথ চলতে চলতে গল্প করার, সে সময়টা কেন?

খুঁজে বার করি লোকটাকে—ওয়াং ভাবলো—তারপর লোকটাকে সরিয়ে দিতে কতক্ষণ।

অন্তিম সময়ে সে লোকটার মুখশ্রী কি রকম হবে তারই একটি মনোরম কাল্পনিক রূপ ভাবতে ভাবতে ওয়াং ঘুমিয়ে পড়লো।

তার পরদিন সকালবেলা ডাক এলো জুলেখা বাঈ-এর বাড়ি থেকে!

জুলেখা জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি হয়েছে ওয়াং?"

"কিছু না," ওয়াং উত্তর দিলো।

"কাল সন্ধ্যেবেলা ময়দানে কি করছিলে?"

প্রশ্ন শুনে ওয়াং অবাক হোলো, কিন্তু উত্তর দিলো সহজ ভাবেই, "হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম। এই ক-বছরে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে বোধ হয়।"

জুলেখা কিছু বললো না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওয়াঙের দিকে।

ওয়াং অস্বোয়াস্তি বোধ করলো। একটু ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করলো, "কেন ময়দানটা কি তোমার কেনা জায়গা? আর কারো ওখানে যেতে নেই?"

জুলেখা একটু হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, "আমার সঙ্গে কে ছিলো জানতে চাও?"

"আমার কি দরকার?"

"আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে, সে কথা জানতেই গিয়েছিলে," জুলেখা বললো, "ও ঘরে গিয়ে দেখ কে বসে আছে।"

ওয়াং একবার ভাবলো আমার কি আসে যায়, সোজা বাড়ি চলে যাই। আবার কি ভেবে পাশের ঘরের বন্ধ দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরের ভিতর এক পা ঢুকে ওয়াং দেখলো ফরাশের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছে দর্পনারায়ণ চৌধুরী। চুরুট ফুঁকছে চুপচাপ বসে।

ওয়াং আর ঢুকলো না। ফিরে এলো।

জুলেখা একটু তাকিয়ে দেখলো। বললো, "দেখ ওয়াং, ওর যদি কোনো ক্ষতি হয়, তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে। বুঝেছো?"

ওয়াং চলে যাচ্ছিলো। জুলেখা ডাকলো পেছন থেকে। "শুনে যাও ওয়াং।"

ওয়াং ফিরে দাঁড়ালো।

জুলেখা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি হয়েছে ওয়াং! তুমি তো এরকম ছিলে না?"

ওয়াং কোনো উত্তর দিলো না।

জুলেখা আরো নিচু গলায় আরো আস্তে বললো, "ওয়াং, আমি বুঝতে পেরেছি সবই। কিন্তু যা হবার নয়, তা নিয়ে মিছিমিছি কষ্ট পেও না। ও আশা ছেড়ে দাও।"

ওয়াং কোনো কথা না বলে বেরিয়ে চলে গেল।

সেদিন থেকে ওয়াং জুলেখার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করলো। শুধু

সন্ধ্যেবেলা যেতো জুয়ার আড্ডায়। চুপচাপ বসে থাকতো। হৈ-চৈ হট্টগোল যখন অসহ্য মনে হোতো সেখান থেকে বেরিয়ে চলে যেতো।

আবার এক একদিন খুব রাগ করে ঝগড়া সুরু করে দিতো একজন না একজন কারো সঙ্গে। কিন্তু তার হাত চলা বন্ধ হয়ে গেল। সেটা সবাই লক্ষ্য অবাক হয়ে। ওয়াং বেশী কথার লোক নয়। আগে সে দু-চার কথার পরই কথা বন্ধ করে সোজা মারামারি করতো। কিন্তু এখন সে যতো সম্ভব মুখ-খিস্তি করতো, গালাগাল শুনতোও, শুনে বেরিয়ে যেতো শেষ পর্যন্ত।

ও পাড়ায় সবাই বলাবলি সুরু করলো, কি হোলো ওয়াঙের ?

আর প্রচুর মদ খেতে সুরু করলো সে। বেশী রাত না হলে, বেরোতোই না মদের বার থেকে।

ওয়াঙের বৌ শুধু চুপচাপ লক্ষ্য করতো। কিছু বলতো না।

একদিন শুধু বলেছিলো, "মদের দোকানে অতো রাত না করে বোতল কিনে বাড়ি নিয়ে এলেই পারো।"

এমনি করে কেটে গেল আরো কয়েক মাস।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা জুলেখার কোচোয়ানকে পথের ধারে একটি চায়ের দোকানে দেখে সে অবাক! এ সময়টা তার এখানে থাকবার নয়, জুলেখা বাঈকে নিয়ে ময়দানে যাওয়ার কথা। ডেকে জিজ্ঞেস করলো তাকে।

কোচোয়ান উত্তর দিলো, "বিবিজী বলে দিয়েছে আজ আর বেরোবে না।"

"কেন ?"

"সে জানি না।"

তার পরদিনও তাকে দেখলো চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করতে জানলো সেদিনও বেরোবে না জুলেখা বাঈ।

পর পর চারদিন যখন দেখলো জুলেখা বাঈ সন্ধ্যেবেলা বেরোচ্ছে না, তখন একটু ভাবনা হোলো ওয়াঙের। জুলেখার অসুখ-বিসুখ করেনি তো ? খোঁজ নিয়ে জানলো জুলেখা ইদানীং কারো সঙ্গে দেখা করছে না।

আর জানলো দর্পনারায়ণ চৌধুরীকেও আর দেখা যাচ্ছে না এ পাড়ায়।

তা হলে এই ব্যাপার—ভাবলো ওয়াং। মনে মনে হাসলো সে। স্থির করলো, তিন-চারদিন যাক, তারপর একদিন গিয়ে দেখা করবে জুলেখার সঙ্গে। কিন্তু তার আগেই যেতে হোলো। ডেকে পাঠিয়েছিলো জুলেখা।

ওয়াঙ আসতে জুলেখা তাকে আইসক্রিম খাওয়ালো, ফল খাওয়ালো, সিগারেট খাওয়ালো। তারপর বললো, "জানো ওয়াং, চৌধুরী বাবুকে তাড়িয়ে দিয়েছি।"

"বেশ করেছো।"

"জানো, সে আমায় বলে কি না এসব ছেড়ে দাও, জুয়ার আড্ডা, আফিং কোকেনের চালান, মেয়েদের ব্যবসা—"

"সে কি করে জানলো," ধারালো গলায় ওয়াং জিজ্ঞেস করলো।

"টের পেয়ে গেছে।"

"দাঁড়াও, তাকে আমি—"

"না, না, ওয়াং, ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে যেও না। সে এদিকে আর আসবে না।"

ওয়াং আর কিছু বললো না। চুপ করে রইলো জুলেখাও।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দুজনে।

একটু পরে জুলেখা ওয়াঙের কাছে সরে এলো। খুব আস্তে আস্তে বললো, "ওয়াং!"

ওয়াং জুলেখার দিকে তাকালো।

"ওয়াং, আমি এখন বুঝতে পারছি, তুমি ছাড়া আর কোনো বন্ধু আমার নেই।"

ওয়াঙের বুকের স্পন্দন হঠাৎ খুব দ্রুত হয়ে উঠলো। একটা অদ্ভুত অনুভূতি তার রক্তের উত্তাপে মিশে ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে।

জুলেখা, কলকাতার সেরা সুন্দরী, সেরা মুজরাওয়ালী জুলেখা—ওয়াং ভাবলো—রেবেকা বিবির মেয়ে, বিবি আমেলিয়ার নাতনী!

অনেকক্ষণ পর জুলেখা জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কাল আসছো ?"

"হ্যাঁ," উত্তর দিলো ওয়াং।

"একটু সকাল করেই এসো," বললে জুলেখা, "আমরা আবার ময়দানে বেড়াতে যাবো আগের মতো।"

তার পরদিন ওয়াং একটু সাজগোজ করলো ভালো করে। শিস দিতে দিতে চান করলো অনেকক্ষণ ধরে, মাথায় মাখলো সুগন্ধ ক্রীম, রুমালে ঢাললো জাপানী সেন্ট। একটি সিল্কের প্যান্ট আর সিল্কের শার্ট পরে, পকেটে দামী সিগারেটের টিন নিয়ে বেরোলো বাড়ি থেকে।

ওয়াঙের বৌ চুপচাপ তাকিয়ে দেখলো। কোনো কথা বললো না। কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

এ-কথা সে-কথা অনেক কথা ভাবতে ভাবতে ওয়াং এলো জুলেখার বাড়ি। এসে শুনলো জুলেখা নেই। জুলেখা চলে গেছে। কোথায় গেছে? কেউ জানে না।

শুধু জানে বিকেলে এসেছিলো চৌধুরী বাবু—সেই দর্পনারায়ণ চৌধুরী। জুলেখা প্রথমটা কথাই বলবে না তার সঙ্গে, তারপর মান ভাঙতে দু-জনে অনেকক্ষণ কি কথা হোলো কে জানে।

তারপর দেখা গেল শুধু একটি বড়ো সুটকেস নিয়ে জুলেখা চলে গেল চৌধুরীবাবুর সঙ্গে। কোথায় যাচ্ছে কিছুই বললো না কাউকে।

ওয়াং চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনলো। তারপর বাড়ি ফিরে এলো আস্তে আস্তে।

ওয়াঙের-বৌ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো জানলায়। তাকে ফিরে আসতে দেখে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রাত্রের খাবার তৈরী। এতক্ষণ ওয়াংও একটি কথাও বলেনি। এবার চুপচাপ খেতে বসলো। খেতে বসে দেখে নানারকম খাবার, তার সব চাইতে প্রিয় খাবার সেগুলো, সবই যত্ন করে তৈরী করেছে তার বৌ।

সে ছেলেকে কোলে নিয়ে এক পাশে বসে ছিলো চুপচাপ। ওয়াং চোখ তুলে দেখলো তার দিকে। দেখে তার চোখে জল।

ওয়াং তাকে কাছে ডাকলো।

তারপর এক সঙ্গে খেতে সুরু করলো দুজনে—একই প্লেট থেকে।

তারপর কেটে গেল অনেক বছর। জুলেখা বাঈ-এর কোনো খবর আর পাওয়া গেল না। লোকেও ভুলে গেল তাকে। ওয়াংও কোনোদিন তার খোঁজ করেনি।

সে ছেড়ে দিলো তার আগের জীবনযাত্রা। একটি ছোটো রেস্তরাঁ খুললো চায়না টাউনে।

ওয়াঙের বৌ তার শেষ কটা বছর সুখে কাটিয়ে যখন চোখ বুঁজলো, তখন চিয়েন-চাং, সুং-চাং আর জেনী বড়ো হয়ে গেছে, মিনিরও বয়েস আট কি নয়।

* চোদ্দো *

জুলেখা বাঈ আর ওয়াডের কাহিনী দিলীপ শুনলো জেনীর মুখ থেকে। শুনে অনেকক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

জেনী আস্তে আস্তে বললো, "দিলীপ, এই হোলো আমাদের পরিবারের ইতিহাস। এর পর তুমি যদি আমায় বিয়ে করতে না চাও তো আমি একটুও দুঃখিত হবো না।"

দিলীপ মুখ ফিরিয়ে জেনীর দিকে তাকালো। বললো, "জেনী, এরকম একটা ইতিহাস আমাদের পরিবারের থাকলে আমি খুব গর্ব বোধ করতাম। নিঃসম্বল অবস্থায় তোমার বাবা এদেশে এসেছিলেন, খেটে রোজগার করে বৌ-ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসার করেছেন। এর চেয়ে বড় পরিচয় কোনো সাধারণ লোকের আর কি থাকতে পারে? অল্প বয়েসে কখন কি ভুলচুক করেছেন, তা নিয়ে আমি ভাবি না। জীবনটাকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবার জন্যে এরকম ভুল-চুকও দরকার হয়। তুমি সাধারণ মেয়ে, আমি সাধারণ ঘরের সাধারণ ছেলে, আমরা দু-জনে দু-জনকে ভালোবাসি—বিয়ে করে সুখী হবার জন্যে এই যথেষ্ট।"

"তা হলে এতক্ষণ কি ভাবছিলে?" জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"ভাবছিলাম অন্য কথা। আমারও একটা ছোট্টো ইতিহাস আছে, সেটা কেউ জানে না। আজ সে-কথা তোমাকেও জানানো দরকার।"

"আমি জেনে কি করবো?"

"আমার ইতিহাস জানলে পরে হয়তো তুমিই বরং আমায় বিয়ে করতে চাইবে না।"

জেনী চটে গেল। জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমায় কি ভাবো বলো তো?"

"আমি সত্যি বলছি জেনী!"

"দেখ দিলীপ," জেনী বললো, "কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার জানবার আগ্রহ আমার একটুও নেই। তবে আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ভাঙবার জন্যেই তোমার কথা আমার শোনা দরকার। বলো, কি বলছিলে।"

দিলীপ একটু হাসলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আমার মা নেই, জানো তো?"

"হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে একদিন।"

"আমার মা বাঙালী নয়," দিলীপ বললো।

"হ্যাঁ, তা-ও শুনেছি।"

"বাবা যখন বিলেতে যান," দিলীপ বলে গেল, "তখন এক ইংরেজ-মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন।"

"তুমি বোধ হয় তোমার মাকে দেখনি, না? উনি বোধ হয় তোমার জন্মের পরই মারা যান?" জেনী আস্তে আস্তে বললো।

"না, আমি দেখেছি আমার মাকে। আমায় খুব ভালোবাসতেন। আর উনি মারা যান নি, বেঁচেই আছেন।"

"বেঁচে আছেন!"

"আমার যখন সাত বছর বয়েস মা তখন চা-বাগানের এক সায়েবের সঙ্গে পালিয়ে চলে যান। তারপর থেকে মায়ের কোনো খবর আর জানি না।"

দিলীপ চুপ করে রইলো।

জেনীও চুপ করে রইলো। আস্তে আস্তে জলে ভরে এলো তার চোখ দুটো।

দিলীপের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো সে।

বললো, "দিলীপ, আর কোনো কারণে যদি নাও বা হয়, শুধু এ কারণেই আমি তোমায় ছাড়তে পারবো না। তোমার যে আমায় দরকার। আমায় না হলে যে তোমার চলবে না।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো দুজনে। দুজনেরই যেন মনে হোলো

সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত আকাশ, মানুষের ইতিহাসের সমস্ত ভবিষ্যৎ সবই যেন শুধু তাদের দুজনকেই ঘিরে রয়েছে।

বুড়ো ওয়াংকে যখন দুজনে গিয়ে বললো, সে চোখ বুজে চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আমি খুব খুশি হয়েছি। এ তো হবেই। অন্য দেশ থেকে লোক এসে আরেক দেশে বসবাস করে, প্রথম কিছুদিন নিজেদের মধ্যেই বিয়ে-থা করে, তারপর আস্তে আস্তে মিশে যায় দেশের অন্য সবার মধ্যে। আমাদের দেশেও এই হয়েছে, তোমাদের দেশেও হয়েছে। সব জায়গায় এই হয়ে এসেছে, চিরকাল ধরে হতেও থাকবে। তোমরা সুখী হও, তাহলে আমার দেশেরও কল্যাণ, তোমার দেশেরও কল্যাণ।"

জেনী মুখ নিচু করে বসে রইলো।

"আপনি অনুমতি দিলে আমি সামনের সোমবারেই বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে ফেলতে চাই," দিলীপ বললো।

ওয়াং কি যেন ভাবলো অনেকক্ষণ। তারপর বললো, "না, এত তাড়াতাড়ি নয়। সামনের মাসে আহ্-কিম আর মিনির বিয়ে। তারপর তোমাদের।"

"আহ্-কিম আর মিনির বিয়ে?" জেনীর মুখ ঝলমল করে উঠলো।

"হ্যাঁ," হাসিতে ভরে উঠলো বুড়ো ওয়াঙের মুখ, বললো, "ওরা কাল আমার কাছে এসে মত নিয়ে গেছে। আহ্-কিম খুব ভালো ছেলে।"

"মিনি তো আমায় বলে নি," জেনী বললো।

"ও আমাকেই বলতে বলেছিলো তোমায়। আজ সারা সকাল তো তোমায় পাইনি।"

জেনী বললো, "চিয়েন-চাংকে চিঠি লিখতে হবে।"

"আমি লিখে দিয়েছি," বুড়ো ওয়াং বললো, "ওর বোধ হয় আর মিনির সঙ্গে দেখা হোলো না। বিয়ের পর ওরা হ্যাংকাও চলে যাচ্ছে।"

"তাই নাকি?" প্রথমটা ঝলমল করে উঠলো জেনীর মুখ, তারপর বিষন্ন হয়ে গেল।

"এতে মন খারাপ করবার কি আছে?" বুড়ো ওয়াং সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "বাড়ির মেয়েরা বিয়ে করে স্বামীর ঘরে যাবে, বোনেদের মধ্যে আর দেখা হবে না আগের মতো, তবু ওয়াংদের রক্ত দুটো ধারায় দুদিকে বয়ে যাবে। এই তো চিরন্তন নিয়ম।"

"চিয়েন-চাং যদি থাকতো!" জেনীর চোখ জলে ভরে উঠলো।

"ভায়েরাও চিরকাল বোনেদের সঙ্গে থাকে না জেনী," বললো বুড়ো ওয়াং, "অনেক সময় খবরও নেয় না। তবু বোনেরা ভায়েদের মনে রাখে, তাদের খোঁজ-খবর নেয়। আর একটা কথা জানো?—মনে হচ্ছে সুং-চাংও বোধ হয় বিয়ে করবে শীগ্‌গিরই। সে মুখ ফুটে বলে নি আমায়, তবে তার মুখের চেহারা দেখে আমার ওরকমই মনে হচ্ছে। হয়তো সে ভয় পাচ্ছে আমায় জিজ্ঞেস করতে, আমি রাজী হবো কি হবো না। তাই মনে হচ্ছে মেয়েটি নিশ্চয়ই অন্য জাতের। ওকে বলে দিও, ওর যদি মনে হয় ও সুখী হবে, আমি একটুও রাগ করবো না।"

জেনী আর দিলীপ চুপ করে রইলো।

"আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে," বুড়ো ওয়াং বললো, "তোমাদের মা তোমাদের বড়ো করে চোখ বুজেছে, এবার তোমরা নিজেদের পছন্দ মতো ঘর-সংসার পেতে সুখী হয়েছো দেখলে আমিও শান্তিতে চোখ বুজে তোমাদের মায়ের কাছে চলে যেতে পারবো। বড়ো ভালো মেয়ে ছিলো তোমাদের মা। অতো ভালো মেয়ে আমি আর দেখিনি।"

মাসখানেক পরে এপ্রিল-শেষের এক স্নিগ্ধ দিনে মিনি ওয়াং আর আহ্-কিমের বিয়ে হয়ে গেল।

খুব সাদাসিধে নিরাড়ম্বর বিয়ে। আহ্-কিমের দাদা আহ্-ভং আর তার বৌ, বুড়ো ওয়াঙের এক ভায়রাভায়ের পরিবার, জেনী ওয়াং, সুং-চাং, মিনি

আর জেনীর কিছু বিদেশী বন্ধু, দিলীপ, যোগীন্দর সিং, সুলেমান এদের নিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন হৈ-চৈ হাসি ঠাট্টা-গল্পের মধ্যে হয়ে গেল মিনি আর আহ্-কিমের বিয়ে।

বিয়ের পরই ওদের হংকং রওনা হওয়ার কথা, কিন্তু যাত্রা স্থগিত রাখতে হোলো। কারণ সুং-চাং ঘোষণা করলো যে, সে ইতিমধ্যে একদিন কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে এসেছে রোজী নামে সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে। এবার সে বাড়িতে একটা ছোটোখাটো পার্টি দিতে চায়।

বুড়ো ওয়াং শুনে হাসলো, বললো, "লুকিয়ে বিয়ে করার কি দরকার ছিলো? আমায় আগে বললেই পারতে।"

বাড়িতে ফিরিঙ্গী ধাঁচের ছোট্টো পার্টি। বুড়ো ওয়াং উপরে বসে রইলো নিচে জড়ো হোলো জন পঁচিশ-তিরিশ অল্পবয়েসী চীনে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, পাঞ্জাবী। তাদের মধ্যে দিলীপও। আর সেই পার্টিতে এলো টিং-লিং আর ফেং চেং-শিয়াং।

টিং-লিং দিলীপকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেল। বললো, "শুনলাম জেনীর সঙ্গে তোমার বিয়ের নাকি সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে? কন্‌গ্র্যাচুলেশান্‌স্‌। ও খুব ভালো মেয়ে। তুমি নিশ্চয়ই খুব সুখী হবে।"

"তোমাদের কি খবর," দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, "চেং-শিয়াংকে খুব রোগা দেখাচ্ছে।"

"ও অনেক ঝঞ্ঝাটে আছে," টিং-লিং বললো, "এখানে ওর নানারকম অসুবিধে হচ্ছে। ও সিঙ্গাপুরে চলে যাচ্ছে শীগ্‌গিরই। তারপর হয়তো তাই-পেহ্‌ চলে যাবে সেখান থেকে।"

"তা হলে নিশ্চয়ই তুমিও চলে যাচ্ছো?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"না, আমি যাচ্ছি না। যেখানেই যাই না কেন, ফরমোসায় আর নয়।"

"তা হলে তুমি কি এখানে একা থাকবে?"

"না, এখানে থাকবো না," টিং-লিং বললো, "স্টীভ রবিনসনকে মনে আছে?

ওই যে একজন আমেরিকানের সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো চিয়েন-চাং ? সে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছে।"

"তাই নাকি ?" দিলীপ অবাক হোলো, "তুমি যে বলছিলে তোমার খুব ইচ্ছে করছে চীনে ফিরে যেতে ?"

"অনেক ভেবে দেখলাম," টিং-লিং বললো, "চীনে ফিরে কোথায়ই বা যাবো, কি-ই বা করবো। ওখানে আমার কেউ নেই। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আমি অন্য এক রকম পরিবেশে মানুষ, চীনে গিয়ে হয়তো খাপ খাইয়ে নিতে পারবো না নিজেকে। জানো দিলীপ, আমার মতো লোক যারা, দেশে গিয়ে ওরা সুখী হতে পারে না, আমাদের মতো লোকের দেশকে দূর থেকে ভালোবাসাই ভালো। তাই ঠিক করলাম, স্টীভ্ লোকটি ভালো, ওকে বিয়ে করে আমেরিকা চলে যাই, ওদেশে বড়ো হয়েছি, ওদেশেই ভালো থাকবো। তারপর যদি দুনিয়া একদিন বদলে যায়, এদেশে ওদেশে কোনো শত্রুতা না থাকে, তখন হয়তো স্টীভকে নিয়ে মাঝে মাঝে চীনে বেড়াতে যাবো, ফুল দিয়ে আসবো আমার মা-বাবার কবরের উপর।"

একটু চুপ করে রইলো টিং-লিং। তারপর হাসি-হাসি মুখে বললো, "সেদিন শুধু আমি আর স্টীভ একা নয়, হয়তো তুমি আর জেনী, সুং-চাং আর রোজী—আর আমাদের ছেলে-মেয়েরাও যাবে। হয়তো সবাই গিয়ে অতিথি হবো মিনি আর আহ্-কিমের বাড়িতে।"

আবার একটু চুপ করে রইলো টিং-লিং, তারপর বিষণ্ণ মুখে বললো, "সবাই যাবে—শুধু যাবে না চেং-শিয়াং আর যাবে না চিয়েন-চাং। ওরা বড় হতভাগা।"

জানুয়ারি কেটে গেল, ফেব্রুয়ারি কাবার হয়ে গেল। মিনি আর আহ্-কিম চীন চলে গেল। চীনেপাড়ায় থাকতে চাইলো না সুং-চাংএর বৌ রোজী। পার্ক সার্কাসে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে সেখানে উঠে গেল সুং-চাং।

"আমরা আর কদ্দিন এভাবে কাটাবো," জেনী জিজ্ঞেস করলো দিলীপকে।

"বলো কি করা যায়," দিলীপ উত্তর দিলো।

"বাবার জন্যে ভাবনা হচ্ছে। বাবা এ বাড়ি ছেড়ে নড়বে না। মা এ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, বাবাও তাই এখানেই কাটিয়ে দিতে চান তাঁর শেষ ক'টা দিন। তোমাকে আমি এখানে এসে থাকতে দেবো না। আর বাবাকেও এখানে একলা ফেলে রেখে তোমার বাড়ি গিয়ে থাকতে পারবো না।"

"তা হলে ?"

জেনী অনেকক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, "বাবাকে জিজ্ঞেস করবো কি করা যায় ?"

"জিজ্ঞেস করে দেখ।"

"না, জিজ্ঞেস করবো না," বললো জেনী, "হয়তো মনে করবেন আমরা তাঁকে বাধা মনে করছি। যা করবো, আমাদেরই ভেবে ঠিক করতে হবে।"

"কি করবে বলো ? আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না," দিলীপ বললো।

"একটা কথা বলবো দিলীপ, কিছু মনে করবে না ?"

"মনে করবো কেন ? বলো।"

"দিলীপ" জেনী আস্তে আস্তে বললো, "আমি ছাড়া বাবার আর কেউ নেই। এতদিন যখন কাটলোই, তখন আরো কিছুদিন যাক না।"

"বেশ, তাই হবে। আমি অপেক্ষা করবো," দিলীপ বললো।

* পোনেরো *

ওয়াং-পরিবারের এই দীর্ঘ ইতিহাস আর জেনী ওয়াঙের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার কাহিনী দিলীপ আমায় শুনিয়েছিলো জেনীদের সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর সেই এক আষাঢ়ের দুপুর বেলা—কলকাতায় যখন সবে বর্ষা নেমেছে, আমি বাড়ি বসে, আর রাস্তায় এক-হাঁটু জল।

সেই বৃষ্টিতে দিলীপ এসে উপস্থিত হয়েছিলো ট্যাক্সি চেপে, ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে হয়েছিলো আমাকেই,—তারপর এসে ঘোষণা করেছিলো, সারাটা সকাল সুবিমল ভটচাযের বাড়ি বসে ওর বৌ মল্লিকা আর মল্লিকার মামাতো বোন রেবা চৌধুরীর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, ওদের ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে, রেবার সঙ্গে পরের দিন সিনেমায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে, তারপর সোজা আমার এখানে চলে এসেছে চা-সিগারেট খেয়ে গল্প করার জন্যে।

চা এসেছিলো। দিলীপের জন্যে তিন প্যাকেট সিগারেটও এসেছিলো।

বাইরে ঝির-ঝির বৃষ্টি—কিন্তু বাদলা হাওয়ার সে রকম দাপট আর নেই তখন। এ-বাড়ি ও-বাড়ির জানলায় জানলায় কি রকম যেন একটু করুণ তার সাড়া।

রিকশ ঠুং-ঠুং করে চলে গিয়েছিলো রাস্তা দিয়ে। স্তিমিত হয়ে এসেছিলো পাশের বাড়ির রেডিও। পাশের বাড়ির মেয়েদের সাড়াও আর পাওয়া যাচ্ছিলো না। আড্ডা সেরে হয়তো হেঁসেলে গিয়ে ঢুকেছিলো চায়ের ব্যবস্থা করতে।

দিলীপ একটি সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, "আচ্ছা রঞ্জন, রেবার সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম বলে কিছু মনে করিস নি তো?"

উত্তরে আমি একটু হেসেছিলাম। দিলীপ চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছিলো আমার দিকে।

তারপর আবার যখন ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি সুরু হয়েছিলো আরেক পশলা, আর গুরু-গুরু মেঘ ডেকে উঠেছিলো আবার, দিলীপ বলেছিলো আস্তে আস্তে, "আজ জেনীর গল্প করার মতোই দিন। শোন তা'হলে—।"

সে গল্প শুনলাম অনেকক্ষণ ধরে। শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। মিঠে রোদ্দুরে ঝিলমিল করছে রাস্তার দু-পাশে জমে-যাওয়া জল। আকাশটা বেশ ঠাণ্ডা নীল।

শুনলাম দিলীপ বলে যাচ্ছে,—"জেনী তখন আমায় আস্তে আস্তে বললো, 'দিলীপ, আমি ছাড়া বাবার আর কেউ নেই। এতদিন যখন কাটলো, তখন আরো কিছুদিন যাক না।' শুনে আমি বললাম, বেশ জেনী, তাই হবে। আমি অপেক্ষা করবো।"

গল্প শেষ করে দিলীপ আরেকটি সিগারেট ধরালো।

আমি চুপচাপ ভাবছিলাম ওয়াংদের কথা। আমার সঙ্গে ওদের আলাপ হয়েছিলো কয়েকমাস আগে ফাল্গুনের এক ধূসর সন্ধ্যায়। কয়েকবার দিলীপের সঙ্গে ওদের ওখানে গিয়েছিলাম। অন্তরঙ্গতাও হয়েছিলো তাদের সঙ্গে।

কিন্তু এপ্রিলের প্রথম দিকে আমায় একবার কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিলো। মিনির বিয়ের সময় এখানে ছিলাম না। ফিরে এসে শুনেছিলাম তার বিয়ে হয়ে গেছে, আর বিয়ের কিছু আগে চিয়েন-চাং আমেরিকা চলে গেছে।

তারপর নানারকম কাজেকর্মে ব্যস্ত ছিলাম খুব। দিলীপের সঙ্গেও দেখা হয়নি। তাই আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি ওয়াংদের বাড়ি।

মে মাস কেটে গেল, জুনও প্রায় শেষ হয়ে এলো। তখন কলকাতায় নামলো বিলম্বিত বর্ষা।

আজ সেই বর্ষার এক দুপুরে দিলীপ এসে আমায় জেনীদের গল্প শোনালো।

দিলীপ আনমনে তাকিয়ে ছিলো বাইরের পথের দিকে। কি যেন ভাবছিলো সে। অনেকক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে বললো, "আচ্ছা রঞ্জন, তোকে একটা কথা বলবো কিছু মনে করবি না?"

"কি, বলো।"

"ভাবছি রেবার সঙ্গে সিনেমায় আমি যাবো না, তুই যা। টিকিটটা তোকে দিয়ে যাবো। রেবা তো তার সীটে বসে অপেক্ষা করবে। যখন দেখবে তার পাশে এসে যে বসেছে সে আমি নই, সে তুই, বেশ মজা হবে তখন।"

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "দিলীপ দা, মনে পড়ে একদিন রেবার সঙ্গে আমি সিনেমায় যাচ্ছিলাম। তুমি জোর করে আমার টিকিট আরেকজনের কাছে বেচে দিলে। হলের ভিতর রেবা দেখলো তার পাশে যে এসে বসেছে সে আমি নই, সে অন্য লোক। এবার যদি তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখবার দিনও সে দেখে তার পাশে এসে বসেছে তুমি নও, আমি—সে এর পর থেকে ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখাই ছেড়ে দেবে।"

দিলীপ হাসলো। তারপর বললো, "তোর কাছে আরেকটা দরকারে এসেছি। আমায় পঁচিশটা টাকা ধার দে।"

"কেন?" আমি শঙ্কিত হলাম।

"আজ আমি আরেকজনকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছি। যাওয়াটা দরকার, অথচ আমার কাছে টাকা নেই।"

"আজ আবার কার সঙ্গে যাচ্ছো?"

"আমার এক বন্ধুপত্নীর সঙ্গে।"

"তার কাছ থেকে টাকা ধার নাও।"

"না রে," দিলীপ বললো, "সে হয় না। দে ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে, টাকাটা দে। সোমবারদিন ফিরিয়ে দেবো।"

টাকাটা দিতে হোলো। যাওয়ার সময় সিগারেটের বাকী প্যাকেটটিও তুলে নিয়ে গেল সে। তখন পাঁচটা বাজে।

বাড়ি বসে ভালো লাগছিলো না। দিলীপের কাছে জেনীর গল্প শুনে বার বার রেবার কথা মনে পড়ছিলো। বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

কখন দেখি চলে এসেছি সুবিমল ভট্চাযের বাড়ি। আমায় দেখে ওর বৌ মল্লিকা খুব খুশি। শিঙাড়া ভেজে খাওয়ালো।

রেবার খোঁজ করলাম। শুনলাম রেবা নেই, হস্টেলে ফিরে গেছে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, "আজ দিলীপ এসেছিলো বুঝি?"

মল্লিকার মুখে দিলীপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলাম। এমন আশ্চর্য সুন্দর ছেলে সে নাকি আর দেখেনি! এমন চমৎকার গল্প করে!

"কাল বুঝি ও রেবাকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"রেবাকে নিয়ে সিনেমায়!" মল্লিকা চোখ কপালে তুললো। তারপর হাসতে সুরু করলো, "তাই বলেছে বুঝি? খুব দুষ্টু তো আপনার বন্ধু? আপনার বুক যে তখন থেকেই জ্বলতে সুরু করেছে সে আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি।—না, সিনেমায় যাওয়ার কথা একদম মিথ্যে। আর রেবার সঙ্গে ওর ভালো করে আলাপই হয়নি। রেবা তো ওর সঙ্গে মিনিট দশ কি পোনেরো মোটে গল্প করেছিলো। তারপর গিয়ে শুয়ে পড়েছিলো আমার ঘরে। ওর খুব মন খারাপ।"

"মন খারাপ? কেন?"

একটু গম্ভীর হয়ে গেল মল্লিকা। বললো, "আপনি জানেন না বুঝি?"

"না তো! কি ব্যাপার?"

"ওর মুখ থেকেই শুনবেন," মল্লিকা বললো। ভাঙলো না কিছুতেই।

মল্লিকাদের ওখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, ছ-টা প্রায় বাজে। কিছু করবার নেই। কি করা যায়, আর কোথায় যাওয়া যায়, অনেকক্ষণ ভাবলাম। তারপর একটি ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম লাইট হাউসে।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট করছি, হঠাৎ দেখি, রেবাকে নিয়ে হলে ঢুকছে দিলীপ।

রেবা আমায় দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু আমি আর দাঁড়ালাম না। টিকিটও কিনলাম না। সোজা বেরিয়ে এসে বাড়ি ফিরে গেলাম।

তার পরদিন সকাল বেলা সবে মাত্র চা খেয়ে কাগজ পড়ছি, এমন সময়

চাকরটা এসে বললো, "নিচে এক ভদ্রমহিলা ট্যাক্সিতে বসে আছেন। আপনাকে জামাটা গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়তে বলছেন। আপনাকে কোথায় নাকি যেতে হবে ওঁর সঙ্গে।"

নিচে নেমে দেখি মল্লিকা। মল্লিকা আমায় নিয়ে গেল তাদের বাড়ি। বললো, "ভীষণ দরকার।" কি দরকার বলতে চাইলো না কিছুতেই।

সুবিমল আমায় দেখে বললে, "আমি একটু বেরোচ্ছি। তুই বোস। আজ এখানে খেয়ে যাবি। আমি ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই।"

মল্লিকা আমায় বসিয়ে গেল তাদের শোবার ঘরে। বললো, "আপনি বসুন। আমি চা করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

একটি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। পেছন থেকে ছুটি ফর্শা হাত এসে চুড়ি ঠুনঠুন করে চায়ের কাপ সামনে নামিয়ে রাখলো। মুখ তুলে দেখি রেবা চৌধুরী।

"তুমি ?"

"হ্যাঁ, আমিই তোমায় ডাকিয়ে এনেছি," রেবা উত্তর দিলো। তারপর বসলো সামনে মাটির উপর।

আমি চুপ করে রইলাম।

রেবা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "কাল আমায় লাইট হাউসে দিলীপ দা'র সঙ্গে দেখে তুমি রাগ করে চলে গেলে কেন ?"

"রাগ করবো কেন ? এমনি চলে গেলাম।"

রেবা হাসলো। বললো, "আচ্ছা মানলাম রাগ করো নি। কিন্তু দিলীপ-দা তোমার বন্ধু। তুমি ওকে আজো চিনলে না ? ওর মতো ভালো লোক আমি দেখি নি। কাল এখান থেকে বেরিয়ে হস্টেলে ফেরার পথে ফেরাজিনিতে গিয়েছিলাম পেস্‌ট্রি কিনতে। দেখি দিলীপ-দা বসে আছে। বললো, 'আপনি যে আসবেন আমি জানতাম।' আমি শুনে প্রথমটা অবাক। তারপর মনে পড়লো যে, হ্যাঁ, মল্লিকা দি'কে একবার বলেছিলাম বটে যে হস্টেলে যাওয়ার সময় একবার ফেরাজিনি হয়ে যাবো।

দিলীপ-দা বললো,—'চা খেতে ঢুকেছিলাম। চা প্যাটিস খেয়ে এখন দেখছি পয়সায় কম পড়েছে। আমায় পাঁচটা টাকা ধার দেবেন?'—টাকা বার করে দিচ্ছিলাম, তখন সে বললে, 'পয়সা খরচা যখন করছেনই, নিজেও এক কাপ চা খেয়ে যান। তা নইলে আমার কোনো সান্ত্বনা থাকবে না। আপনার কাছ থেকে টাকা ধার করে চা খাচ্ছি অথচ আপনাকে খাওয়াচ্ছি না, এ কথা ভাবতেও মনে লাগছে।' কি আর করি, বসলাম দিলীপ দা'র সঙ্গে চা খেতে। কিছুক্ষণ গল্প করার পর দিলীপ-দা বললে তোমার কথা। বললে, 'রঞ্জনটা এমন ইরেস্‌পন্‌সিবস্‌। কাল বলেছিলো লাইট হাউসে দুটো টিকিট করে রাখতে। করলাম ওর কথামতো। আজ বললে, ওর সময় নেই, অন্য কি কাজ আছে, যেতে পারবে না। এখন বলুন তো কি মুস্কিল, কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে টিকিট বেচবার চেষ্টা করা আমার পোষায় না, ওসব রঞ্জন পারে। এখন আপনি যদি সিনেমা দেখতে রাজী হন তো ভালো, তা নইলে টিকিটটা মিছেমিছি নষ্ট হবে।'—কি আর করা যায়। এমন ভাবে বললে যে না গিয়ে পারলাম না। তাছাড়া, মনটাও খুব খারাপ ছিলো।"

শুনে আমি চুপ করে রইলাম। কোনো কথা বললাম না।

"জানো রঞ্জন, আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে," রেবা আস্তে আস্তে বললো।

আমি চমকে উঠলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কে ঠিক করলো, তুমি নিজে?"

"না।"

"তোমার মা ঠিক করেছেন তা'হলে? সে হবে না—তোমার মাকে গিয়ে বলো—"

আমায় কথার মাঝখানে থামিয়ে রেবা বললে, "আমার তো মা নেই। মারা গেছেন অনেকদিন।"

তখন মনে পড়লো। হ্যাঁ, রেবা বলেছিলো বটে। সে পশ্চিমে বড়ো হয়েছে। ওর মা সেখানেই মারা গেছেন ও যখন খুব ছোটো। ওর বাবাও পশ্চিমে থাকেন। তাই রেবা হস্টেলে থেকেই পড়াশুনো করে।

"বিয়ের ঠিক করেছেন আমার বাবা," রেবা আস্তে আস্তে বললো, "উনি আজ কলকাতায় আসছেন। সামনের মাসে বিয়ে।"

"আমি গিয়ে বলবো তোমার বাবাকে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি আমার বাবাকে চেনো না। উনি নিজে যা ঠিক করবেন তাই, আর কারো কথা শুনবেন না।"

টেবিলের উপর একটি টেলিগ্রাম পড়ে ছিলো। হঠাৎ তলায় নামের উপর চোখ পড়লো। নাম লেখা আছে দর্পনারায়ণ চৌধুরী।

"দর্পনারায়ণ চৌধুরী!" আমি হঠাৎ বলে উঠলাম।

"হ্যা। আমার বাবা। তুমি চেনো নাকি?" রেবা জিজ্ঞেস করলো।

"দর্পনারায়ণ চৌধুরী তোমার বাবা?" আমি অবাক, "তার মানে, তুমি জুলেখা বাঈয়ের মেয়ে?" ফশ করে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

রেবা বিষণ্ণ চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো।

* ষোলো *

তারপর মাসখানেক রেবার সঙ্গে দেখা হয়নি।

দেখা হয়নি দিলীপের সঙ্গেও।

সুবিমল আর ওর বৌ মল্লিকা দু-একবার দেখা করতে এসেছিলো। ওদের সঙ্গেও কোনো আলোচনা হয়নি রেবার সম্বন্ধে। শুধু এটুকু শুনেছিলাম যে রেবার বাবা এসে একটি পুরো বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। রেবার বিয়ে হওয়া অবধি কলকাতায় থাকবেন।

রেবা হস্টেল ছেড়ে দিয়ে এখন ওর বাবার সঙ্গে আছে।

সবাই এখন রেবার বিয়ের কেনাকাটা নিয়ে খুব ব্যস্ত।

জুতো কিনতে গিয়েছিলাম আহ্-তংএর দোকানে।

আমায় দেখে আহ্-তং খুব খুশি। চা না খাইয়ে ছাড়বে না। ওর বৌ চা করে এনে দিলো।

তাকিয়ে দেখলাম ওর বৌকে। দেখেই বোঝা যায় আর কয়েকদিনের মধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি হবে।

আহ্-তং হাসলো।

বললো, "এবার যেটি হবে সেটি আমার সপ্তম সন্তান। পরপর তিনটি ছেলে হয়েছে। এবার আর ছেলে নয়। এবার একটি মেয়ে চাই। খুব ভালো মেয়ে। আমার বৌয়ের মতো মেয়ে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার বৌ-কে দিয়ে এখন কাজকর্ম করাচ্ছো কেন? এই কটা দিন বিশ্রাম নিতে বলো।"

আহ্-তং খুব জোরে হেসে উঠলো। বললো, "দু'দিন পরে ছেলে হবে বলে এখন থেকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, এমন কথা তো কোনোদিন

শুনিনি। আমাদের দেশে মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করতে করতে অনেক সময় সন্তানের জন্ম দেয়। আর প্রসবের পরেই আবার কাজে লেগে যায়।"

"দুদিন বিশ্রাম নিলে ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কিছু নেই। তবে দরকার হয় না। এর আগের বার যেদিন ওর ব্যথা উঠলো তখন সে রান্না করছে। বাড়িতে দুজন অতিথি খাবে। সেই ব্যথা নিয়ে সে রান্না শেষ করলো। শেষ করে ওদের বসিয়ে দিয়ে আমায় বললো। আমি তখন কি করি? বাড়িতে অতিথি। একটা রিক্সা ডেকে দিলাম। সে রিক্সা চেপে একাই লাটুপাড়ার মেয়ে-হাসপাতালে চলে গেল। তিন দিন পর একদিন কাজে বেরিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে দেখি আমার বৌ রান্না করছে। আমায় দেখে হেসে বললো, "তোমার ছেলে উপরে ঘুমোচ্ছে।"

শুনে আমি হাসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "ছেলের ওজন কতো হয়েছিলো।"

আহ্-তং সগর্বে উত্তর দিলো, "সাড়ে বারো পাউণ্ড। কী গলার জোর! বেণ্টিক স্ট্রীটে কাঁদলে ট্যাংরায় বসে ওর কান্না শুনতে পাওয়া যেতো।"

"কি রকম দেখতে তোমার ছেলে? তোমার বৌয়ের মতো?"

"না। আমার বৌ বুঝি ভালো দেখতে?" আহ্-তং হাসতে হাসতে বললো, "আমার ছেলে দেখতে ঠিক আমারই মতো সুন্দর হয়েছে।"

"বেশ ভালো কথা। আশা করি, তোমার মেয়েও তোমার মতো সুন্দর হবে।"

"না, না, আমার সুন্দর মেয়ে দরকার নেই", আহ্-তং তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো, "আমার চাই খুব ভালো মেয়ে, আমার বৌয়ের মতো ভালো আমার ভাই আহ্-কিমের বৌ মিনির মতো ভালো, মিনির বোন জেনীর মতো ভালো, জেনী-মিনির মা বুড়ি ওয়াংএর মতো ভালো। মেয়ে বড়ো হবে, ভালো রান্না করতে শিখবে, স্বামীর কাজে-কর্মে সাহায্য করবে, ছেলেপুলে মানুষ করবে,

তার পর বুড়ো হয়ে ছেলে-মেয়ের বিয়ে-থা দিয়ে শান্তিতে চোখ বুঁজবে—ব্যস, এর বেশী কিছু চাইনে।"

একটু চুপ করে থেকে বললো, "আচ্ছা, তুমি তো দিলীপের বন্ধু,—তুমি কি জানো? সবাই বলছে জেনীর সঙ্গে দিলীপের বিয়ে হবে।"

"হ্যাঁ—।"

"আমার মনে হয় না", আহ্-তং আস্তে আস্তে বললো।

"কেন? জেনী বিয়ে করবে না দিলীপকে?"

"জেনী করবে। চীনে মেয়ে, যাকে ভালোবাসে, তার জন্যে সব কিছু ছাড়তে পারে। কিন্তু দিলীপ বোধ হয় ওকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে না।"

"কেন?"

"দেখ রঞ্জন বাবু, আমি সেই ছেলেবেলা থেকে কলকাতায় আছি। কতো রকম ছেলে দেখলাম। দিলীপের মতো ছেলে কোনোদিন ঘর-সংসার করবার জন্যে ভালোবাসে না। শুধু ভালোবাসার জন্যে ভালোবাসে।"

এমন সময় দিলীপের প্রবেশ।

"ওহে আহ্-তং। দাই-সাওকে বলো, চা খাওয়াতে। তোমার ছেলে কোথায়? ডাকো তাকে। চকোলেট এনেছি। ওরে গাধা রঞ্জন! তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। দাঁড়া, আগে আমার চীনে-বৌদির হাতে একটু চা খেয়ে নিই।"

"চীনে দাই-সাও'এর চা তো অনেক খেলে", আহ্-তং হেসে বললো, "এবার থেকে চীনে বৌয়ের হাতে চা খেতে স্থরু করো।"

"চীনে বৌ?" দিলীপ একগাল হাসলো, "দেখ আহ্-তং, জেনীর মা চীনে, বাবা চীনে। কিন্তু আমাকে বিয়ে করবার পর জেনী চীনেও থাকবে না, বাঙালীও হতে পারবে না। কি হবে, ভগবান জানেন। নাও, নাও, তাড়াতাড়ি চা করতে বলো। আমাদের যেতে হবে।—রঞ্জন, জুতো কিনলি বুঝি? কতো টাকা দিয়েছিস? পোনেরো? তুই একটা গাধা। তোকে পাঁচ টাকা ঠকিয়েছে। দেখি আহ্-তং, টাকা পাঁচটা বার করো তো।

দাও।" টাকাটা পকেটে পুরলো দিলীপ। বলে গেল, "তোমার যা ন্যায্য পাওনা তুমি পেয়েছো। রঞ্জনের যা ন্যায্য দেনা, সে দিয়েছে। সুতরাং এটা আমার প্রফিট। আমার চেনা একটি মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন আছে। এটা দিয়ে তার বিয়ের উপহার কিনবো।"

আবার চা এলো। চা খেয়ে দিলীপ আমায় বললো, "চল রঞ্জন, এবার বেরিয়ে পড়ি। অনেক দিন হুইস্কি খাইনি।—টাকা আছে তোর সঙ্গে?"

"না।"

"নেই? কেন যে টাকা না নিয়ে বেরোস বুঝি না। চল, কোথাও বসে তাহলে শুধু কোকা-কোলা খাই।"

কোকো-কোলাও হোলো না। আমরা চলে এলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে। চীনেবাদাম কিনে ঘাসের উপর বসলাম। দিলীপ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে চীনেবাদাম খেলো।

তারপর বললো, "তুই একটা গাধা।"

"কেন?"

"চুপ করে বসে আছিস কেন?"

"কি করবো?"

"পরশু রেবার বিয়ে।"

"জানি।"

"ওর বাবাকে গিয়ে বল।"

"বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন আর হবে না।"

দিলীপ একটু ভাবলো।

তারপর বললো, "পালিয়ে যা রেবাকে নিয়ে, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।"

আমি হেসে ফেললাম।

"তোমার মাথা খারাপ দিলীপ-দা।"

"রেবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"না।"

"গিয়ে দেখা কর।"

"কী লাভ?"

"ওরে গাধা," দিলীপ চিৎকার করলো, "তুই যাকে ভালোবাসিস তার সঙ্গে আরেকজনের বিয়ে হয়ে যাবে, আর তুই প্যাচার মতো মুখ করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে বসে চীনেবাদাম খাবি, এ আমি কি করে সহ্য করি বল? যদি গেলাসের পর গেলাস মদ খেতিস বার-এ বসে, তবু তোকে শ্রদ্ধা করতাম, তোর সঙ্গে বসে আমিও খেতাম, তোকে মহত্তর জীবনের জীবনদর্শন বুঝিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু চীনেবাদাম? স্কচ-হুইস্কি নয়, রাম নয়, জিন নয়, বিয়ার নয়, এমন কি দেশী মদও নয়, শুধু চীনেবাদাম! তোর মুখদর্শন করতেও আমার ইচ্ছে করছে না।"

আমি একটু হেসে চুপ করে রইলাম। দিলীপও চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর বললো, "আচ্ছা, তুই না হয় চুপ করে আছিস। কিন্তু রেবা কি করে এরকম চুপচাপ ব্যাপারটা মেনে নিলো বলতো?"

"সে জানে যে আর কিছু করবার উপায় নেই।"

দিলীপ আবার চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "তুই এক কাজ কর। তোরও তো পৌরুষ বলে একটা কিছু আছে। একটি মেয়ে তোকে কাঁচকলা দেখিয়ে আরেকজনকে বিয়ে করছে, এটা তুই সহ্য করবি কেন? তুইও একটা বিয়ে কর।"

"সে পরে দেখা যাবে," আমি উত্তর দিলাম।

"পরে নয়। এক্ষুণি।"

"এক্ষুণি?"

"হ্যাঁ। পরশু রেবার বিয়ে। তার আগে তুই বিয়ে করে ফেল।"

আমি হেসে ফেললাম।

"তুই হাসছিস? আমি সিরিয়াসলি বলছি। তবে হ্যাঁ, মেয়ে পাবি

কোথায় ?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। ছাখ, আমার এক বন্ধু আছে, অমূল্য রায়। তার বোনের বিয়ে হচ্ছে না। কিন্তু বেশ ভালো মেয়ে। আমি যদি বলি—"

"তুমি বড্ড বাজে বকছো দিলীপ-দা," আমি আস্তে আস্তে বললাম।

দিলীপ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। তারপর আরো আস্তে আস্তে বললো, "বেশ, তোর যা খুশি কর। এই চীনেবাদামগুলো তুই একলা বসে-বসেই খা। আমি চললাম।"

তারপর দিন সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে আবার দিলীপের আবির্ভাব হোলো।

"ওরে রঞ্জন!"

"কি ?"

"শুনেছিস ?"

"কি ?"

"রেবার বাবার নাম দর্পনারায়ণ চৌধুরী," বলে দিলীপ রেবার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র আমার নাকের নিচে আন্দোলিত করলো।

"হ্যাঁ, জানি।" আমি উত্তর দিলাম।

"তার মানে রেবা জুলেখাবাঈয়ের মেয়ে!"

"হ্যাঁ, তাও জানি।"

"তোকে কে বললে ?"

"রেবা নিজেই বলেছে।"

"আশ্চর্য ব্যাপার!" দিলীপ এতক্ষণে একটি চেয়ার টেনে বসলো।

বসে লক্ষ্য করলো যে বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র একখানি আমার টেবিলের উপরও পড়ে রয়েছে।

"তোকেও নেমন্তন্ন করেছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"ভালোই হোলো। তোতে আমাতে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। একসঙ্গে বসে হৈ-হৈ করে নেমন্তন্ন খাবো।"

"আমি কাল দার্জিলিং যাচ্ছি," আমি আস্তে আস্তে বললাম।

দিলীপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

তারপর বললো, "তুই রেবার বিয়েতে যাবি না?"

"বললাম তো কাল দার্জিলিং যাচ্ছি।"

"ছাখ বুদ্ধু; যে-মেয়েকে ভালোবাসিস তার সঙ্গে বিয়ে হোলো না বলে নিজের পকেটের পয়সা খরচা করে দার্জিলিং যাবি? বিয়ে যখন হোলো না অন্তত বিয়ের নেমন্তন্নটা খেয়ে নে। আর কিছু না হোক, অন্তত সেটুকুই লাভ।"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

দিলীপ চা খেলো, সিগারেট খেলো, নিজের মনে খানিকক্ষণ আবোল-তাবোল বকে গেল।

তারপর উঠে দাঁড়ালো চেয়ার থেকে।

বললো, "নাঃ, তোর সঙ্গে জমছে না। তুই ক্যাবলার মতো বসে আছিস, কথা বলছিস না। আমি একা একা কাঁহাতক বকে যাবো। যাই, জেনীর সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে আসি। তোর কাছে টাকা আছে? আমায় দশটা টাকা ধার দিবি?—নাঃ থাক। তুই যাকে ভালোবাসিস তার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তোর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তোকে আর বেশী কষ্ট দেওয়ার মানে হয় না। চলি রে। চিয়েরিও।"

দার্জিলিং যাওয়া হোলো না।

ভাবলাম, দিলীপ ঠাট্টা করে বললেও ঠিকই বলেছে। রেবার বিয়ে হয়ে যাবে বলে আমি যাবো দার্জিলিং? কেন?

সেজে-গুজে ফিটফাট হয়ে রুমালে সেণ্ট মেখে একটি প্রেজেণ্ট কিনে নিয়ে নির্বিকার ভাবে নেমন্তন্ন খেতে গেলাম।

গিয়ে দেখি শানাই বাজছে। অনেক লোকজন, অনেক হুল্লোড়, হৈ-চৈ। শাঁখ বাজছে ঘন ঘন, উলু দিচ্ছে মেয়েরা। স্থবিমল অভ্যাগতদের দেখাশুনো করতে ব্যস্ত, মল্লিকাও খুব হাসি-হাসি মুখে ছুটোছুটি করছে। আমায় দেখে স্থবিমল যেন একটু বেশী খাতির করে ভেতরে নিয়ে বসালো। দিলীপও এসে পড়লো মিনিট দুয়েকের মধ্যেই।

বললো, "তুই আসবি আমি জানতাম। অমূল্যর বোনকে বিয়ে করবি নাকি বল ?"

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "জিজ্ঞেস করবার আর সময় পেলে না ?"

দিলীপ একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "না রে, তুই আর বিয়ে করিস না। তা হলেই রেবার শিক্ষা হবে।"

"কি করে ?"

"তুই আর বিয়ে করিসনি জানলে সে কি আর কোনোদিন স্থখে ঘর করতে পারবে তার স্বামীর সঙ্গে ?"

আমি হাসতে লাগলাম।

কিন্তু শানাই যখন আরো জোরে বেজে উঠলো, বর এসে গেল, উলু দিয়ে উঠলো মেয়েরা, আর বসতে পারলাম না। দিলীপের চোখ এড়িয়ে, অন্য সবার চোখ এড়িয়ে, বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। অনেকক্ষণ ভাবলাম, কোথায় যাওয়া যায়। একটি পার্কে গিয়ে বসলাম। তার কাছে আরেকটি বিয়ে-বাড়ি। সেখানেও শানাই বাজছে। বসতে পারলাম না সেখানেও।

উঠে চলে গেলাম চৌরঙ্গি পাড়ার একটি সিনেমা হলে। সেখানে একটি ক্রাইম-পিক্চার দেখাচ্ছে। খুব মারামারি, খুব উত্তেজনা। ন-টার শো-তে তাই দেখলাম বসে বসে। বাড়ি ফিরলাম বারোটা নাগাদ।

চাকর বললো, "দিলীপ বাবু এসেছিলেন। দু-বার আপনার খোঁজ করে গেছেন।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ, স্থবিমল বাবু আর ওঁর স্ত্রীও এসেছিলেন।"

শুনে আমি অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কেন রে ?"

"জানি না। আপনি এলেই আপনাকে বিয়ে-বাড়িতে যেতে বললেন।"

আমার হাসি পেলো। না জানিয়ে যে পালিয়ে আসবো তারও উপায় নেই, তাও লক্ষ্য করবে ? আমি আর কিছু না বলে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তার পরদিনও চুপচাপ বাড়ি বসে রইলাম।

দিন দুই পরে দিলীপ আবার এলো। মনে হলো সে যেন বড়ো গম্ভীর, বড়ো ক্লান্ত, বড়ো উদাস, বড়ো বিষণ্ণ। চুপচাপ এসে বসলো।

আস্তে আস্তে বললো, "তুই একটা গাধা।"

"কেন ?"

"বিয়ে-বাড়ি থেকে পালিয়ে এলি কেন ? আর এলিই যদি সোজা বাড়ি ফিরলি না কেন ? আমি, সুবিমল, মল্লিকা দু-বার এসে তোকে খুঁজে গেছি।"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

"সেদিন বিয়ে-বাড়িতে খুব গোলমাল গেছে, জানিস ?" দিলীপ বললো।

"না তো— !"

"শেষ মুহূর্তে হঠাৎ জানাজানি হয়ে যায় যে রেবা জুলেখা-বাঈয়ের মেয়ে। শুনে ছেলের বাপ কোনো কথা শুনলো না, বিয়ের আসন থেকে ছেলে তুলে নিয়ে গেল।"

"তারপর ?" আমি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলাম।

"তারপর আর কি ? আমরা তোর খোঁজ করলাম, তোর বাড়ি এলাম, আরও দু-এক জায়গা খুঁজে দেখলাম।—ইডিয়াট কোথাকার, কোথাও তোর পাত্তা নেই।"

"তারপর ?"

"তারপব আর কি ?" দিলীপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো, "বিয়ের লগ্ন বয়ে যায়। সবাই আমায় ধরে পড়লো। শেষ পর্যন্ত আমিই বিয়ে করলাম রেবাকে।"

"তুমি!"

দিলীপ চুপ করে বসে রইলো।

আমিও চুপ করে বসে রইলাম।

চা খেলাম না, সিগারেট খেলাম না, কেউ কোনো কথাই বললাম না। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা এলো, সন্ধ্যা গভীর হয়ে রাত হোলো।

অনেকক্ষণ পর দিলীপ উঠে দাঁড়ালো। কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগুলো। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, "ছাখ রঞ্জন, তোর সঙ্গে আমি আর জীবনে কথা বলবো না। তোর ভালো করতে গিয়ে আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলাম, জেনীকে হারালাম, ওর কাছে মুখ দেখাবার পথ রাখলাম না।"

"কেন দিলীপ-দা?"

"ওরে উল্লুক, এও বুঝতে পারিস নি? রেবা যে জুলেখা-বাঈয়ের মেয়ে একথা বরযাত্রীদের মধ্যে যে আমিই রটিয়ে দিয়েছিলাম— !"

* সতেরো *

বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ।

অপরাহ্নের ঝাপসা বাতাবরণ কেটে গিয়ে আবার রৌদ্রসজল হয়ে উঠেছে চারদিক।

উনিশ শো আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশের স্মরণের মিছিল পার হয়ে ফিরে এলাম উনিশ-শো ছাপ্পান্নোর আষাঢ় মাসের নিরালা অপরাহ্ণে।

সামনে তাকিয়ে দেখি পুরোনো দিনের ছোটো ছোটো অলি-গলি কিছুই নেই! বড়ো রাস্তা বেরোচ্ছে সেণ্ট্রাল এভিনিউ থেকে চিৎপুর পর্যন্ত। সেই অসমাপ্ত রাজপথের একপাশে, যেখানে উত্তর থেকে একটি সরু গলি এসে পড়েছে, একটি ছোট্টো চীনে রেস্তরাঁয় মুখোমুখি বসে আছি আমি আর জেনী ওয়াং।

আস্তে আস্তে মনে পড়লো—নানকিংএ খেতে ডেকেছিলো পাঞ্জাবী বন্ধু যোগীন্দর সিং। খাওয়া-দাওয়ার পরে সে চলে গেল অফিস-পাড়ার দিকে। আমার গন্তব্যস্থল সেণ্ট্রাল এভিনিউ। তাই শর্টকাট করছিলাম এদিক দিয়ে।

আকাশে তখন নিবিড়-কালো মেঘ। হঠাৎ দেখেছিলাম ওধার থেকে আসছে খুব চেনা-চেনা মনে হওয়া কে একজন।

চিনেছিলাম কাছাকাছি আসতেই। সে জেনী ওয়াং।

দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে বৃষ্টি নামলো। আমরা দুজনে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম পাশের ছোট্টো রেস্তরাঁয়।

দিনের বেলা। বেশ ফাঁকা। নিরিবিলি।

যেখানে আমি আর জেনী মুখোমুখি বসে, সেখান থেকে ওধারের ফাঁকা জায়গাটি দেখা যায়।

সেখানে যখন ঝাপসা হয়ে বৃষ্টি নামলো, তখন আমার মনখানি ভেসে গেল অনেক স্মরণের ওপারে। মনে হোলো যেন সেখানে আর ফাঁকা নয়,

ঝাপসা নয়। সেখানে তখন আঁকাবাঁকা গলি। সেখাতে তখন অনেক লোকের আসা-যাওয়া। উনিশ-শো ছাপান্নোর আষাঢ় মাসের সজল দিন মুছে গিয়ে যখন আমার মন ঘিরে নামলো উনিশ-শো আটচল্লিশের ফাল্গুনের এক ধূসর সন্ধ্যা, তখন সেই হারানো বিবি আমেলিয়া লেন ধরে দিলীপের সঙ্গে আমি প্রথম চলেছি ওয়াংদের বাড়ি।

সেই অনেক-কথা-মনে-পড়া মুহূর্তগুলো পার হয়ে যখন আবার ফিরে এলাম উনিশ-শো ছাপান্নোর আষাঢ় মাসের নিরালা অপরাহ্ণে, শুনলাম জেনী আমায় বলছে, "তুমি বড়ো আনমনা হয়ে গেছ রঞ্জন। কি ভাবছো?"

হেসে উত্তর দিলাম, "বিশেষ কিছু নয়। শুধু ভাবছিলাম ওখানে আমাদের সন্ধ্যাগুলো কিরকম হৈ-চৈ করে কেটে গেছে এক সময়।"

"সবারই একটি বয়েস আসে," জেনী আস্তে আস্তে বললো, "যখন সবারই দিনগুলো হৈ-চৈ করে কাটে। তারপর যে যার কাজে জড়িয়ে পড়ে, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কারো সঙ্গে কারো দেখা হয় না বড়ো একটা। দেখা হলেও কি-খবর কেমন-আছো গোছের দু-চারটা মামুলি কথা বলে বিদায় নিতে হয়। এই মস্তো বড়ো শহরের কাজের ব্যস্ততায় কে কার খবর রাখে!"

"তুমি এখন কি করছো, জেনী," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি? আমি চাকরি করি হুং-স্থং-তাও মেমোরিয়্যাল হাইস্কুলে।"

"মাস্টারি করছো তাহলে?"

"না, মাস্টারি নয়। আমি স্কুলের অফিসে চাকরি করি।"

অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম দিলীপের কথা জিজ্ঞেস করবো কি না। স্থির করলাম, এত বছর যখন কেটে গেছে, তখন জিজ্ঞেস করলে ক্ষতি নেই।

"আচ্ছা জেনী, দিলীপের সঙ্গে দেখা হয়?"

জেনী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। খুব সহজ, খুব মিষ্টি সেই হাসি। জিজ্ঞেস করলো, "রেবার সঙ্গে তোমার দেখা হয় রঞ্জন?"

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, "না, দিলীপের বিয়ের পর রেবার সঙ্গে আমার দেখা আর হয়নি।"

"দিলীপের বিয়ের পর," জেনী উত্তর দিলো, "দিলীপের সঙ্গেও আমার দেখা আর হয়নি, রঞ্জন।"

আমি চুপ করে রইলাম।

"আচ্ছা, তুমি ওদের বাড়ি যাওনা কেন রঞ্জন? দিলীপ তো তোমার খুব বন্ধু।"

"দিলীপ প্রায়ই আমার ওখানে আসে। আমায় যেতে বলেনি কোনোদিন। তাই যাইনি," আমি উত্তর দিলাম।

"তুমি নিজের থেকে গেলেই পারতে—।"

"কি লাভ," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"দেখ রঞ্জন, তোমরা বড্ড বেশী ভাবপ্রবণ। তুমি যে ওখানে যাও না তার মানে এই যে, এখনো পুরোনো ব্যাপারটা তুমি মনে করে রেখে দিয়েছো। তুমি এখনো বিয়ে করোনি নিশ্চয়ই— ?"

আমি হাসলাম একটুখানি।

"সে কথা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি," জেনী বলে গেল, "জীবনটাকে সহজভাবে নেওয়ার চেষ্টা করো রঞ্জন। দিলীপ তোমার বন্ধু, রেবা তোমার বন্ধুর বৌ—এখন ওদের সঙ্গে ঠিক সেভাবে মিশবে।"

"তুমি দিলীপের সঙ্গে আর মেশো না কেন, জেনী?"

"ওকে পাবো কোথায়? সে তো বিয়ের পর আমার কাছে আর এলো না। ও কি ভেবেছে ও এলে আমি ওকে কিছু বলতাম? আমি বরং একথাই বলতাম যে তুমি যা করেছো, ঠিকই করেছো। আমি হলেও ঠিক তাই করতাম।—কিন্তু সে তো সহজ হয়ে আমার কাছে এলো না, অকারণ মনে মনে সে নিজের কাছে অপরাধী হয়ে রইলো।"

"তুমি বিয়ে করবে না জেনী?"

"আমি? হ্যাঁ—, নিশ্চয়ই করবো।"

"কবে করবে?"

"করবো বলে যেদিন স্থির করবো, সেদিনই করে ফেলবো।"

শুনে আমি একটু হেসে চুপ করে রইলাম।

জেনী বুঝলো আমি কি ভাবছি। বললো, "জানো রঞ্জন, আমাদের স্কুলে যে জিওগ্রাফির মাস্টার, তার নাম লু চি-চিয়াং। খুব ভালোমানুষ, খুব সাদাসিধে। স্কুলে পড়ায় আর বাদবাকী সময়টা পড়াশুনো করে। উত্তর-চীনের ভূগোলের উপর ওর কয়েকটি প্রবন্ধ পিকিংএর দু-চারটি পত্রিকায় বেরিয়েছে। ইদানিং সে পড়াশুনো একটু কম করে। তার কারণ হলাম আমি।"

"তাকেই বিয়ে করবে ঠিক করেছো নাকি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সে এখনো আমায় মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পায়নি, তাই আমিও কিছু বলিনি। এমনি সে আমাদের বাড়ি আসে প্রত্যেকদিন। ও আমায় যেদিন বলবে, আমিও সেদিনই রাজী হয়ে যাবো।"

বাইরের দিকে তাকালাম।

রোদ উঠেছে। মেঘের আবরণ মুছে গেছে। উজ্জ্বল নীলিমায় প্রশান্ত হয়ে আছে কলকাতার আকাশ।

রেস্তরাঁ থেকে দুজনেই বেরিয়ে এলাম।

জেনী আমার ঠিকানা নিলো। আমিও লিখে নিলাম তার ঠিকানা।

সে বললো, "দিলীপকে বোলো আমার কথা। অনেকদিন দেখা হয়নি। একদিন ওকে নিয়ে এসো আমাদের বাড়ি।—আর আমার কথা শোনো। তুমিও যাও দিলীপদের বাড়ি। গিয়ে যখন দেখবে রেবা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে ঘর করছে, তখন তোমারও মনের ভার কেটে যাবে। তারপর অন্য কাউকে খুঁজে নিয়ে তার সঙ্গে সংসার পাততে তোমার একটুও কষ্ট হবে না। তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু আমরা বুঝি—তুমি যে এরকম আছো, তাতে রেবার মনে-মনে নিশ্চয়ই একটা গোপন দুঃখ আছে। যদি তোমার জীবনও সহজ হয়ে ওঠে, তাহলে সব চেয়ে বেশী খুশী হবে রেবা। অন্তত তার জন্যে হলেও তোমার এটা করা উচিত। যে কোনো অবস্থার মধ্যেই সুখী হবার জন্যে চেষ্টা করা উচিত সবারই। আমাদের তো এই একটাই জীবন। কেন

এই জীবনটা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করবো না? যদি তুমি, আমি, দিলীপ, রেবা সবাই যে যার মতন সুখী হতে পারি, তাহলে আগের দিনগুলোর মাধুর্যই আমাদের চিরকাল মনে থাকবে, আগের দিনগুলোর ব্যথার মুহূর্তগুলো আর বেদনাময় মনে হবে না কখনো।"

আমি নির্বিকার ভাবে শুনে গেলাম চুপ করে।

জেনী বলে গেল, "এসো একদিন, না এলে খুবই দুঃখিত হবো। দিলীপকে বোলো আমার কথা। ওকেও নিয়ে এসো সঙ্গে করে।"

জেনী চলে গেল।

দিন তিন-চার পরে দিলীপের সঙ্গে দেখা হোলো ডেলহাউসি স্কোয়ারে।

বললাম, "জানো দিলীপদা, সেদিন জেনীর সঙ্গে দেখা হোলো।"

"জেনী? কোন জেনী। জেনী ওয়াং? আমাদের সেই জেনী? আমায় বলিসনি কেন এতক্ষণ? কি রকম আছে সে? অনেকদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে।"—কি যেন একটু ভাবলো দিলীপ। তারপর বললো, "সত্যি, অনেকদিন হয়ে গেছে, না রে? জেনী এদ্দিনে বড়ো হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। কতটুকু দেখেছিলাম তাকে। তখন ফ্রক পরতো।"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম দিলীপের দিকে। কতটুকু দেখেছিলো কাকে? জেনীকে? কোন জেনীর কথা বলছে দিলীপ দা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই জেনী ওয়াং।

যেই জেনী ওয়াং বুড়ো ওয়াংএর মেয়ে,—চিয়েন-চাং সুং-চাংএর বোন জেনী, আহ্-কিমের বৌ মিনির দিদি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই জেনী। আমিও তার কথা বলছি রে গাধা," দিলীপ হেসে বললো।

"তাকে তুমি কতটুকু দেখেছো মানে? তখনই তো তার বয়েস ছিলো কুড়ি একুশ।"

"কুড়ি একুশ আবার বয়েস নাকি রে? আমাদের কাছে একেবারে

বাচ্চা। তখন যাদের কুড়ি একুশ, তাদের বয়েসী অনেক মেয়েকে আমি ছেলেবেলায়—আমায় ছেলেবেলায় নয়, তাদের ছেলেবেলায়—কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি,," বললো দিলীপ।

"আচ্ছা দিলীপ-দা তুমি না তার সঙ্গে প্রেম করতে ?"

"প্রেম ? ওরে বুরবাক, প্রেম কি কেউ বয়েসের হিসেব কষে করে ? বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা যায়, মাঝ-বয়েসীর সঙ্গে করা যায়। আবার বুড়ির সঙ্গেও করা যায়। প্রেম এক সুমহান স্বর্গীয় অনুভূতি। তুই তার কি বুঝবি রে গাধা ? জীবনে তুই কটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিস ? বল, কিরকম আছে জেনী ?

"জেনীর বিয়ে হবে কিছুদিনের মধ্যেই।"

"তাই নাকি ? বেশ বেশ। যাদের এই টুকু-টুকু বাচ্চা দেখেছি সেদিনও, সবাই টুক-টুক করে বিয়ে করে ফেলছে যে ! ব্যাপার কি ?—কাকে বিয়ে করছে জেনী ?

"লু চিউ-চিয়াংকে।"

"সে আবার কে ?"

"হুং স্থং-তাও মেমোরিয়্যাল স্কুলের জিওগ্রাফির মাস্টার।"

"খুব ভালো কথা। জেনী আমাদের নেমন্তন্ন করবে তো ?"

"করবে নিশ্চয়ই।—তোমায় একদিন নিয়ে যেতে বলেছে," আমি বললাম।

"কাকে নিয়ে যেতে বলেছে ?"

"আমাকে।"

"বেশ তো। চল, একদিন তোকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"না, দিলীপ-দা—

"না কেন ? লজ্জা কিসের ? চল একদিন।"

"আমি সে কথা বলিনি। তুমি উল্টো বুঝলে। জেনী আমায় বলেছে একদিন তোমায় নিয়ে যেতে," আমি বললাম।

"একই কথা। আমি তোকে নিয়ে যাবো, না তুই আমায় নিয়ে যাবি, এর মধ্যে তফাতটা কি আমি তো বুঝতে পারছি না। আসলে তো দুজনে একসঙ্গে যাবো। একই ট্রামে কিংবা একই বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাবো। তুই যদি ট্যাক্সির পয়সাটা দিতে রাজী থাকিস তো একই ট্যাক্সিতে যাবো। তবে গিয়ে সময় নষ্ট। মাল-ফাল খাওয়াবে জেনী? ওসব তালে মেয়েরা নেই। ওর দাদা চিয়েন-চাং হুইস্কি, রাম, জিন এসব খাওয়াতো। জেনী আর কি খাওয়াবে? বড় জোর এক পেয়ালা চা আর একটু চিংড়ির ঠ্যাং ভাজা। এর জন্যে এত কষ্ট করে অতোটা পথ যাওয়ার কোনো মানে হয় না।"

"যাই হোক, অতো করে বলেছে। চলো একদিন," আমি বললাম।

"বেশ তো, কবে যাবি বল—।"

একটি দিন ঠিক করলাম।

সেদিন কিন্তু দিলীপ গেল না। খুব নাকি ব্যস্ত। অনেক কাজ। আমায় আরেকটি দিন ঠিক করতে বললো।

করলাম।

সেদিনও দিলীপ গেল না। কাকে যেন সে সেদিন বাড়িতে খেতে ডেকেছে।

আরেক দিন বললাম।

সেদিনও যাওয়া হোলো না। দিলীপকে নাকি সেদিন ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হবে।

এমনি করে কেটে গেল তিন-চার মাস।

তখন বোধ হয় পূজোর ছুটি।

বাড়িতে চুপচাপ বসে একটি মাসিক পত্রিকা পড়ছি। এমন সময় চাকর এসে বললো, "কে যেন ডাকছে।"

বেরিয়ে দেখি, অচেনা কে একজন। শাদা প্যান্ট আর সিল্কের হাওয়াই-

আন শার্ট পরা, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। মুখ দেখে বোঝা যায় ভদ্রলোক চাইনীজ।

পরিষ্কার ইংরেজিতে বললো, "আমাদের আগে আলাপ হয়নি। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আপনিও আমায় চেনেন। আমি লু চিউ-চিয়াং,—হুং সুং-তাও মেমোরিয়্যাল হাইস্কুলের টীচার।"

"আপনি মিস্টার লু?" আমি তার সঙ্গে করমর্দন করে বললাম। "আপনাকে দেখে খুব খুশী হলাম। ভেতরে আসুন।"

চিউ-চিয়াং পাঁচ মিনিটের বেশী বসলো না। সে শুধু খবর দিতে এসেছিলো যে জেনী আমায় একবার ডেকেছে।

জেনীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তার পরদিন। লু চিউ-চিয়াংও ছিলো।

"দিলীপকে আমার কথা বলেছিলে," জেনী জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ।"

"ওকে একদিন নিয়ে এলে না কেন?"

"ও একদিন আসবে বলেছে," আমি উত্তর দিলাম।

খানিকক্ষণ একথা সেকথার পর জেনী বললো, "তোমায় ডেকেছি একটু দরকারে। দিলীপ, যোগীন্দর সিং, হেনরি, এদের সবার ঠিকানা তো তোমার কাছে আছে। আমার দরকার।"

"বেশ, দিয়ে যাবো একদিন।"

"একদিন নয়, আমার কালই চাই—।"

"কেন, এত তাড়া কিসের?"

জেনী হাসলো। বললো, "বলো তো তাড়া কিসের?" বলে লু চিউ-চিয়াংএর দিকে তাকিয়ে হাসলো। চিউ-চিয়াংএর ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল।

আমি হেসে ফেললাম। জিজ্ঞেস করলাম, "দিন ঠিক হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। সোমবার দিন বিকেলবেলা পার্টি। আমার এখানে তো জায়গা হবে না। তাই হুং সুং-তাও মেমোরিয়্যাল স্কুলের হলেই ব্যবস্থা করতে হোলো।"

আমি চিউ-চিয়াংএর করমর্দন করে অভিনন্দন জানালাম।

তারপর জেনী জিজ্ঞেস করলো, "দিলীপের সঙ্গে কোথায় দেখা হোলো?"

"ডেলহাউসি স্কোয়ারে।"

"ওদের বাড়ি যাও নি?"

"না, যাই নি।"

"রেবার সঙ্গে দেখা হয়নি কোনোদিন?"

"না।"

"সে আমি আঁচ করেছিলাম," জেনী বললো, "চলো, এখন যাই।"

"এখন?" আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

"হ্যাঁ। কেন নয়? রেবার সঙ্গে আমার আলাপ নেই। ওর সঙ্গে আলাপ করবো, দিলীপকেও নেমন্তন্ন করে আসবো। আমি নিজে না গেলে তো সে আসবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যাও। আমি যাবো না," আমি বললাম।

"না। তুমিও যাবে," বলে জেনী লোক পাঠালো ট্যাক্সি ডাকতে।

দিলীপের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। জেনী আমায় জোর করে টেনে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

পেছন পেছন এলো লু চিউ-চিয়াং।

দরজা খুলে দিলো রেবা নিজেই।

কি বলবো ভাবছিলাম, কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই রেবা বলে উঠলো, "আরে? তুমি? এদ্দিন পর আমাদের মনে পড়লো? এসো এসো এসো। ভেতরে এসো।"

"এঁকে চেনো? মিস ওয়াং।—আর মিস্টার লু।"

"হ্যাঁ। নাম শুনেছি। খুব খুশী হলাম আলাপ হওয়ায়। ভেতরে আসুন।"

তিন বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে পুতুল খেলছিলো। তাকে দেখিয়ে রেবা বললো, "এ আমার মেয়ে মঞ্জু।—এদিকে এসো মঞ্জু। ডাকলে যেতে হয়। তোমার মামা যে! মামার কাছে যেতে হয় লক্ষ্মীটি!"

ভাগ্নী কিছুতেই মামার কাছে এলো না। মায়ের কোল ঘেঁষে চোখ ড্যাবড্যাব করে দেখতে লাগলো।

বাড়িতে রেবা একাই। দিলীপ কোথায় যেন বেরিয়েছে। তবে ফিরে আসবার সময় হয়েছে। তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। ছটায় রেবাকে নিয়ে তার সিনেমায় যাওয়ার কথা, টিকিট করে রাখা আছে।

"এখনো বিয়ে করো নি কেন রঞ্জন? করে ফেল, করে ফেল, করে ফেল। আমার এক পিসতুতো বোন আছে। বলবো তোমার জন্যে?"

জেনী ওয়াং তখন মুখ টিপে একটু একটু হাসছে।

আমার মনে হোলো গলার কাছে কি যেন আটকে আছে। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখি সহজ নিরাড়ম্বর গৃহসজ্জার মধ্যে একটা শান্ত স্নিগ্ধ লক্ষ্মীশ্রী। মঞ্জু পুতুল নিয়ে চুপচাপ বসে আছে রেবার কোলে। পাশে টেবিলের উপর দিলীপ, রেবার আর মঞ্জুর একখানি ছবি।

হঠাৎ যেন মনের উপর থেকে দীর্ঘকাল-ধরে-চাপিয়ে-রাখা একটি গুরুভার বোঝা নেমে গেল।

রেবা চা নিয়ে এলো।

গল্পগুজবে কেটে গেল আধঘণ্টা।

ছটা প্রায় বাজে।

"দিলীপ এখনো আসছে না কেন?"

"আমিও তো তাই ভাবছি," রেবা উত্তর দিলো, "এর মধ্যে এসে পড়া উচিত ছিলো। আমাদের তো সিনেমায় যাওয়ার কথা।"

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর জেনী বললো, "আমায় তো এবার উঠতে হবে। অন্য কাজ আছে আমাদের।"

রেবাকে বিয়ের কার্ড দিয়ে জেনী বললো, "নিশ্চয়ই আসবে। দিলীপকে বোলো যে আমরা বসে ছিলাম।"

রেবা আমাদের ট্যাক্সি অবধি এগিয়ে দিলো।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। আমি তাকিয়ে দেখলাম মুখ ফিরিয়ে। রেবার দুষ্টু মেয়েটি ছুটে রাস্তায় নামতে চাইছে। রেবা তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

খানিকটা পথ এসে জেনী চিউ-চিয়াংকে নামিয়ে দিলো। বললো, "তুমি এখান থেকে আরেকটি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও চিউ-চিয়াং। আমি একটু অন্যদিকে যাচ্ছি। যাওয়ার পথে রঞ্জনকে নামিয়ে দিয়ে যাবো।"

চিউ-চিয়াং জেনীর খুব বাধ্য। চুপচাপ নেমে চলে গেল।

ট্যাক্সি এসে থামলো পার্ক-স্ট্রীটের এক আইসক্রীম বারের সামনে। জেনী আমায় নিয়ে সেখানে গিয়ে বসলো। দুটো আইসক্রীমের অর্ডার দিয়ে বললো, "তোমায় একটা কথা বলবার জন্যে এখানে নিয়ে এলাম। জানো, দিলীপ এসেছিলো ঠিক সময়েই।"

"কে বললে ?"

"হ্যাঁ। আমি দেখেছি। ওর বাড়ির সামনে আমরা যখন ট্যাক্সি থেকে নামছি, তখন দেখি সে অন্যদিক থেকে হেঁটে হেঁটে আসছে। সেও আমাদের দেখতে পেয়েছিলো, কিন্তু বোধ হয় ভেবেছিলো যে আমি ওকে দেখতে পাইনি। আমাদের দেখতেই সে তাড়াতাড়ি একপাশে আড়ালে সরে গেল। তাই আমি আর ওকে ডাকলাম না, তোমাদেরও বললাম না। শুধু রেবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি বলেই ভেতরে গেলাম।"

"আশ্চর্য ব্যাপার !"

"কিচ্ছু আশ্চর্য নয়," জেনী বললো, "এটা ওর মনের দুর্বলতা। ওর কাছ থেকে আমি আশা করিনি। ওকে বলে দিও ও যেন এরকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেয়। এতে ওরই ক্ষতি হবে।"

* আঠারো *

জেনীর সঙ্গে লু চিউ-চিয়াংএর বিয়ে হয়ে গেল।

দিলীপ চায়ের পার্টিতে যায় নি। তবে রেবা গিয়েছিলো। জেনী খুব সহজ ভাবেই রেবাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, "দিলীপ আসেনি কেন?"

রেবা জানালো যে দিলীপের মাথা ধরেছে।

জেনী আমাকে পরে বলেছিলো, "দিলীপের যে মাথা ধরবে সে আমি আগেই জানতাম। বেচারা দিলীপ!"

দিন সাতেক পর একদিন দিলীপ আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। এসে বললো, "জেনীর বিয়ের নিমন্ত্রণে কিরকম লোক হয়েছিলো রে? আমার এমন মাথা ধরলো যে যাওয়া হোলো না কিছুতেই।"

"জেনী আমায় বলেছে যে সে আগেই জানতো তোমার মাথা ধরবে," আমি উত্তর দিলাম।

"মানে?"

"আচ্ছা দিলীপ-দা, সেদিন জেনী আর চিউ-চিয়াংকে নিয়ে যখন তোমার বাড়ি গেলাম, ট্যাক্সি থেকে আমাদের নামতে দেখে তুমি আড়ালে সরে দাঁড়ালে কেন?"

"তোরা আমায় দেখতে পেয়েছিলি?"

"আমরা কেউ দেখিনি। শুধু জেনী দেখতে পেয়েছিলো।"

এই প্রথম দেখলাম দিলীপের মতো স্মার্ট ছেলের মুখ পাংশু হয়ে গেল।

তারপর সে আস্তে আস্তে বললো, "ওর সঙ্গে যে আমি দেখা করতে চাই নি, তা নয়। কিন্তু রেবার সামনে আমি কিছুতেই জেনীর মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ।—আমি আর দিলীপ, দুজনেই।

তারপর হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠলো। বললো, "চল।"

"কোথায় ?"

"জেনীদের বাড়ি—"

"এখন ? সে কি ? বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ গিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে ?"

"চল না," দিলীপ বললো আমার কথা কানে না তুলে।

চায়না টাউনের ছোটো গলিটার ভিতর ট্যাক্সি ঢোকে না। মোড় থেকেই সেটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গলির ভিতর এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ দিলীপ বললে, "আরে ? ওরা বেরোচ্ছে দেখছি।"

তাকিয়ে দেখি উল্টো দিক থেকে লু চিউ-চিয়াং আর জেনী হেঁটে আসছে।

আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে।

ওরাও পথ ধরে এদিকেই হেঁটে আসছিলো।

কাছাকাছি আসতে জেনী তাকালো আমার দিকে।

আমিও জেনীর দিকে তাকালাম।

দিলীপ তাকালো জেনীর দিকে।

কিন্তু জেনী দিলীপের দিকে তাকালো না।

"জেনী," দিলীপ ডাকলো।

জেনী কোনো উত্তর দিলো না।

"জেনী ! আমি দিলীপ," দিলীপ বললো।

জেনী আর লু চিউ-চিয়াং দিলীপের পাশ কাটিয়ে পথ ধরে এগিয়ে চলে গেল।

আমি আস্তে আস্তে সরে দাঁড়ালাম পথের একপাশে।

দিলীপ পথের মাঝখানে পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো—

তাকিয়েই রইলো যতক্ষণ না নিজেদের মনে গল্প করতে করতে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল জেনী আর ওর স্বামী লু চিউ-চিয়াং।

তখন পথের এদিকে ওদিকে ফুটফুটে চীনে খোকাখুকুদের হট্টগোল। নতুন-তৈরি পথের ওপাশে দোকানগুলোর সামনে সাজানো রঙিন মোমবাতি, রঙিন ফানুস, কাগজের ফুল, বাজি-পটকা আর ফেস্টুন, ঝাপসা কাচের শো-কেসের ভিতর থেকে উঁকি মারছে—চীনেমাটির পুতুল। আর আশেপাশের বাড়ির রান্নাঘর থেকে চর্বির গন্ধ, অনুস্বরান্ত কলরব, পথ বেয়ে কাঠের খড়মের চরণধ্বনি।

দক্ষিণে মিলিয়ে গেল জেনী ওয়াং। দিলীপের পাশ কাটিয়ে ঘড়ঘড় করতে করতে খোয়া-ছড়ানো পথের উপর দিয়ে চলে গেল একটি স্টীম রোলার। আর উত্তরের আঁকাবাঁকা অলিগলির কোনে-কানাচে ঝিমিয়ে পড়ে রইলো বহু শতাব্দী পার হয়ে নির্জীব হয়ে আসা চায়না টাউন।

সমাপ্ত